# SAHITYA ANGAN

An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal.

Chief Editor : Dr. Jaygopal Mandal
C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,
Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

ISSN:2394 4889 Vol : V, Issue : IX 28th February 2019

Published by : Dr. Jaygopal Mandal, C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara, Hirapur,
Dhanbad, Jharkhand, Phone : 09830633202/09570217070
E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, jaygopal_1969@rediffmail.com
sahityaangan@gmail.com, Website : www.sahityaangan.com

সাহারাব হোসেন সংখ্যা • সাহিত্য অঙ্গন

# সাহিত্য অঙ্গন

ISSN:2394 4889
Vol : V, Issue : IX
28th February 2019
DIIF Impact Value :1.028
Frequency : Halfyearly

সম্পাদক : জয়গোপাল মণ্ডল

# সাহিত্য অঙ্গন

## (साहित्य अंगन // Sahitya Angan)

**ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028**

**Vol. : V, Issue : IX, 28th February 2019**

**Website : www.sahityaangan.com**

মুখ্য সম্পাদক

*ড. জয়গোপাল মণ্ডল*

***(Chief Editor : Dr. Joygopal Mandal)***

ড. জয়গোপাল মণ্ডল

প্রযত্নে ঃ বি. এন. ঘোষ

শিমূল ডিহি, তেলিপাড়া, হীরাপুর,

ধানবাদ, ঝাড়খণ্ড

**SAHITYA ANGAN**

**An Exclusive Interdisciplinary & Literary Tri-lingual Peer-reviewed Journal**

ISSN : 2394 4889, DIIF Impact Factor : 1.028

Vol. : V, Issue : IX, 28th February 2019

**Chief Editor :**

***Dr. Jaygopal Mandal***

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

**© *Dr. Jaygopal Mandal***

**Type Setting :**

*Manik Kumar Sahu,*

Kolkata - 152

Phone : 9830950380

***Price : ₹ 120.00***

**Published by :**

*Dr. Jaygopal Mandal*

C/O-B. N. Ghosh, Simuldih, Telipara,

Hirapur, Dhanbad, Jharkhand

Phone : 09830633202/09570217070

E-mail : jaygopalvbu@gmail.com, sahityaangan@gmail.com

Website : www.sahityaangan.com

D/Saharab Hossan Sahitya Angn February 20119/2

**Advisory Board :**
***Prof. (Dr.) Tapas Basu, Kalyani University and Guest Faculty of C.U., Kolkata***
***Prof.(Dr.) Bikash Roy, University of Gour Banga, Malda, W.B.***
***Prof. (Dr.) Prakash Kumar Maity, Department of Bengali, Banaras Hindu University, U.P.***
***Prof. (Dr.) Suranjan Middey, Department of Bengali, R.U. Kolkata***
***Prof. (Dr.) Suman Gun, Assam University, Shilchar, Assam***
***Dr. K. Bandyopadhyay, R. S. P. College, Jharia, Jharkhand***
***Dr. Subrata Kumar Pal,* Dept. of Bengali, Ranchi University, Jharkhand**
**Dr. Ira Ghoshal, Dept. of Bengali, T. M. University, Bhagalpur, Bihar**
**Tapas Roy (Poet), Kasba, Kolkata**
**Sushil Mondal (Poet), Narendrapur, Kolkata**

***Members from the other Countries :***
***Dr. Gulam Mustafa*** (Chittagong University, Bangladesh)
***Dr. Sudeepa Dutta*** (Chittagong Govt. College, Bangladesh)
***Md. Masud Mahmud*** (Dhaka, Bangladesh)
***Professor Himadri Sekhar Chakraborty*** (USA)
***Professor Barsanjit Mazumder*** (USA)
***Md. Majid Mahmud,*** *(Writer)*, Greentouch Apt. Mahamudpur, Dhaka

***Assistant Editor :***
**Dr. Kutub Uddin Molla, Dept. of Bengali, Singur Govt. College, W.B.**
**Dr. Samaresh Bhowmik, Dept. of Bengali, Yogmaya Devi College, Kolkata**
**Dr. Mausumi Saha, Dept. of Bengali, Chakdaha College, Nadia**

***Working Editorial Board :***
**Dr. Manaranjan Sardar, Dept. of Bengali, Bangabasi Evening College, Kolkata**
**Jayanta Mistri, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Bidhannagar Govt. College, Kolkata**
**Dr. Sampa Basu, Asst. Prof., Dept. of Bengali, Mahishadal College, Midnapure**
**Dr. Soma Bhadra, Dept. of Bengali, Mahadevananda Mahavidyalaya, Barracpur**
**Dr. Debashree Ghosh, Dept. of Bengali, Hiralal Majumder Memorial College, Dakshineswar, W.B.**
**Dr. Sovana Ghosh, Dept. of Bengali, Dhrubachand Halder College, Barasat**
**Dr. Sandip Mondal, Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata**
**Dr. B. N. Singh, Dept. of Com., B.B.M.K. University, Dhanbad**
**Dr. R. Pradhan, Dept. of Chem., P. K. R. M. College, Dhanbad**
**Dr. Sanjay Kumar Singh, Dept. of Hindi, P. K. R. M. College, Dhanbad**
**Dr. N. K. Singh, Dept. of Hindi, R. S. P. College, Jharia**
**Dr. D. K. Singh. Dept. of Physics, B.B.M.K. University, Dhanbad**
**Dr. Mostaq Ahmed, H.O.D. Dept. of Bengali, Presidency University, Kolkata**
**Tapas Koley, Boalia, Ujjaini (East), Garia, Kolkata- 84**

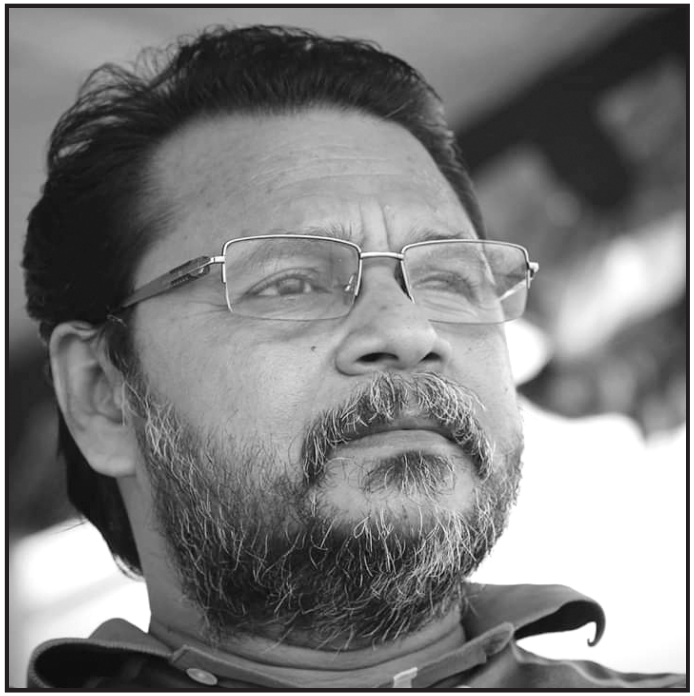

অধ্যাপক, কবি, প্রাবন্ধিক ও কথাসাহিত্যিক ড. সোহারাব হোসেন
জন্ম : ২৫ নভেম্বর ১৯৬৬, মৃত্যু : ২রা মার্চ ২০১৮

**বিষয়:**


সম্পাদকীয়—৭

এন জুলফিকার
আমার সোহারাবদা—৯

আশাদুজ্জামান বিশ্বাস
ড. সোহারাব হোসেনকে যেমন দেখেছিলাম—১২

অজিত ত্রিবেদী
আবভাশিক শরক্ষেপণ অথবা খননপর্বের জহুরি উৎসর্জন—১৪

সাহানারা খাতুন
বাংলা কবিতায় সোহারাব হোসেন —২৪

রুমা পারভীনারা
সোহারাবের কবিতায় ভাষা শিল্প —৩০

মহঃ কুতুবুদ্দিন মোল্লা
ছোটদের ভুবনে সোহারাবের গল্প—৩৮

তৌসিফ আহমেদ
সোহারাব হোসেনের শিশু সাহিত্য—৪৮

মহুয়া ভট্টাচার্য
সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন ও সাহিত্যিক আফসার আমেদের কলমে গ্রামবাংলা ও বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের ধার্মিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সার্বিক বিশ্লেষণ—৫৮

চন্দনা মজুমদার
সোহারাবের 'রাজার অসুখ' : বর্তমান সময়ের রূপকথা —৭৩

হাবিব আর রহমান
'মহারণ' : দুই বস্তুবাদী দর্শনের মিল-প্রয়াস—৯১

সাখাওয়াৎ হোসেন
মাঠ জাদু জানে ঃ জীবনের রস-সৃজন—৯৯

নবনীতা বসু
'সহবাস পরবাস' : ভোগ-স্বার্থমগ্ন প্রেমহীন জীবন—১০৫

পীযূষকান্তি অধিকারী
'দোজখের ফেরেশতা' গল্পের আকর ও আকার—১১৬

পাতাউর জামান
কেন গল্পকার সোহারাব হোসেনকে পড়া জরুরি —১২৩

মদনচন্দ্র করণ
দোজখের ফেরেস্তা ঃ গল্পবাজুড়ে গুরু—১২৯

মুনমুন ঘোষ
আমার সময় আমার গল্প : প্রসঙ্গ ভোগাবাদী মানসিকতা—১৩৫

অরিন্দম গোস্বামী
সোহারাব হোসেনের 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা' : নিজস্বতার সাক্ষর—১৪৫

তৌসিফ আহমেদ
জীবনপঞ্জি—১৫৭

গ্রন্থপঞ্জি—১৫৯


**সোহারাব হোসেনের জন্মলতিকা**

↓

**দরবার সরদার**

↓

**সুলতান সরদার**

↓

| | |
|---|---|
| রুস্তম আলি সরদার (মৃত)<br>স্ত্রী : আমিনা বিবি (মৃত) | রুস্তম আলির এক বোন<br>(নাম জানা যায়নি) |
| ↓ | |
| সোহারাব হোসেন (মৃত)<br>স্ত্রী : মুনিয়া বারী | বোন : সাবিনারা<br>স্বামী : মজিদ |
| ↓ | ↓ |
| পুত্র : সোহম হোসেন | কন্যা : সৌমী সুলতানা |

## সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে সোহারাব হোসেন (১৯৬৬-২০১৮) এক স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। তাঁর অকাল প্রয়াণে কথাসাহিত্যের পাঠকের যে প্রত্যাশা ছিল, তা অপূর্ণ রয়ে গেল। কিন্তু স্বল্প পরিসরে যে প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন সাহিত্য-রসিক জন এক নির্দিষ্ট দিশা ও দর্পণে ঋদ্ধ হবেন। অজ গাঁয়ের এই সোনার ছেলে দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে স্কুল শিক্ষা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা—সর্বত্র নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল উত্তরণের ইতিহাস রচনা করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৯ এ যখন স্নাতকোত্তরে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন, তখন আমি স্নাতকোত্তরে প্রথম বর্ষে প্রবেশ করেছি। সোহারাবদাকে সেই দেখা, তারপর স্কুলে শিক্ষকতা, অধ্যাপনা এবং মাদ্রাসা পর্ষদে সভাপতি—প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। একই সঙ্গে সাংবাদিকতা থেকে সাহিত্যর্চা, সৃজনশীল কবিতা ও গল্প-উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয়।

গ্রাম-জীবনের কথা, মাটির সংলগ্ন জীবনের টানাপোড়েন, চেনা জগতের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে নিয়ে মনের মাধুরীতে সৃষ্টি করেছেন নিজস্ব জীবনদর্শন। তাঁর গল্পের ভাষা, বয়ন, সংলাপ ও সহজ বাচনিক উপস্থাপনা বাংলা কথাসাহিত্যে অনন্য। তাঁর গ্রাম—বসিরহাটের মাটিয়ার কথা ও সংলগ্ন অঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষ, তাদের সাধারণ ইতিকথার মধ্যে আশ্চর্য কাহিনীর ম্যাজিক শিল্পরূপ তাঁকে অসাধারণ স্রষ্টার আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তিনি গল্প-উপন্যাসে যেন বাস্তবের রূপকথা রচনা করেছেন। সাধারণ গ্রামীণ বাঙালীর নিষ্পন্দ জীবনের স্বপ্ন, তার স্বপ্ন-ভাঙা—তাদের রাজনৈতিক ও সমাজীবনের আলো-আঁধারি পরিস্থিতির সঙ্গে অবিরাম লড়াই, কখনো রূপকথার অলীক কল্পনার আলোকে, কখনো ভোগবাদী প্রতীকে বাস্তবসম্মত ছবি চিত্রিত হয়েছে তাঁর শিল্পে। তিনি একদিকে জীবনের ভয়াবহতা, কখনো স্বপ্নের ডালিতে সাজিয়েছেন, রচনা করেছেন ব্যতিক্রমী এক ধারা।

এবার শিল্পী সোহারাবকে একটু ছুঁয়ে দেখি। 'কবির লড়াই' ('বায়ুতরঙ্গের বাজনা' গল্প সঙ্কলন) নামে একটি গল্প ভীষণভাবে স্মরণীয়। 'পরিচয়' পত্রিকায় ২০০০ সালে শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত এই গল্পে স্রষ্টা ও পাঠকের সম্পর্ক একটি প্রশ্নের মুখোমুখি স্থাপন করেছেন। যদিও শুরু করছেন 'রূপকথার এক দেশ ছিল' বলে, কিন্তু বর্তমান বাস্তবের রূঢ় ও কঠোর নির্মমতা রূপায়িত। কবি এবং কথাকার সোহারাব হোসেন যে কথা লিখেছেন একবিংশ শতকের সুর ও জীবনাদর্শ হিসাবে—তা একান্ত ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো। যে ঘটনা আজ ঘটছে তা তাঁর কলমে ভোগবাদী দর্শনে বিম্বিত। কবি-সমাজে দুই শ্রেণীর কবি—এক রাজসভাকবি, যিনি লেখকের কথায় 'থুড়ি রাজার চোখ দিয়ে তিনি দেখেন।' যদিও কখনো কখনো মনে হয় এ রাজা সত্যি রসজ্ঞ—এ যেন লেখকের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ। তাই ক্রমে কবি বয়সের ভারে কমজোরি হয়ে পড়েন। বয়স বাড়লে কবি তখন জীবন-অভিজ্ঞ, সোহারাবদা দেখালেন এক নির্মম সত্যকে। মনে পড়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কথা :

'কবি যদি লোভী হয়
তা হলে সে কবি নয়,
তা হলে সে পথের কাঙাল।

কখনও সবুজ পরে,
কখনও গেরুয়া ধরে,
কখনও বা টকটকে লাল।' (কবিতা সমগ্র-পঞ্চমখণ্ড/পৃষ্ঠা ১১১)

সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনও লোভী কবিকে নবীন কবির মুখোমুখি দাঁড় করান। আর প্রবীন কবি পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত হন এবং বিকারগ্রস্ত করেন সংসারকে।

শুরু হয় কবির লড়াই। আসেন আর এক কবি। শুধুমাত্র 'রাজসভাকবি'র চাকরী রাখার লোভে কবি ও কবি-পত্নী ভ্রষ্ট হন জীবনদর্শন থেকে। কবি নিজেই দেখতে চান নিজ কন্যার তন্বী শরীর। এ তো প্রকৃত সষ্টার অমোঘ অবলোকন। আজকের যুগে লেখকের এই গল্পের তাৎপর্য খুবই প্রাসঙ্গিক।

ব্যক্তি সোহারাব কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। নিজের প্রতি উদাসীন ছিলেন তিনি। অথচ সজাগ ছিলেন সমাজ সংস্কারে। ২০১৭ ডিসেম্বরে টাকী গভর্ণমেন্ট কলেজে এক জাতীয় আলোচনাচক্রে সোহারাব হোসেন ছিলেন মুখ্য অতিথি, সৌভাগ্যক্রমে আমি ছিলাম অন্যতম বক্তা। দেখেছি, ইনসুলিন নিয়ে খেয়ে যাচ্ছেন অবলীলায়। আমি বলেছিলাম, দাদা-এতটা অত্যাচার নিজের ওপর ঠিক নয়। সেদিন 'কলেজ স্ট্রীট' পত্রিকার জন্য চেয়েছিলেন একটি প্রবন্ধ। আমার দুর্ভাগ্য তার কিছুদিন পর থেকে আমাদের প্রাণের প্রিয় কথাসাহিত্যিক সোহারাব হোসেন অসুস্থ হলেন। না, আর ফিরে আসেননি। এহেন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিকের স্মরণ ও অমূল্য সৃষ্টির মূল্যায়ন সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। এই তাগিদ থেকেই 'সাহিত্য অঙ্গন' পত্রিকার ফেব্রুয়ারী ২০১৯ সংখ্যাটি উৎসর্গ করতে পেরে গর্ব অনুভব করছি। এই সংখ্যাটির কাজ সম্পন্ন করতে সহ সম্পাদক ড. কুতুবউদ্দিন মোল্লা যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, 'গল্পসরণি' সোহারাব হোসেন সংখ্যা ও 'সোহারাব হোসেন : জীবন ও সাহিত্য' গ্রন্থ দুটির ঋণ অকৃপণভাবে স্বীকার করি।

ড. জয়গোপাল মণ্ডল
২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

এন জু ল ফি কা র

## আমার সোহারাবদা

সোহারাবদা'র কথা ভাবলেই এখনও যে ছবিটা আমার চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে ওঠে তা হল— আনন্দমোহন কলেজের বাসার রুম, যেখানে বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী পরিবৃত হয়ে স্বমহিমায় বসে আছেন তিনি। টেবিলে দুটি বা তিনটি চশমা, চোখের দুরারোগ্য রোগের কারণে দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় যা তাঁকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করতে হয়। তো সেই রুমে কাউকে কোনো লেখা হয় তিনি ডিক্‌টেট করছেন, বা কারও লেখা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। কখনও বা তাদের হাত থেকে লেখাটি নিয়ে, আতস কাচের চেয়ে পুরু মোটা চশমা পরে, কাগজটি চোখের প্রায় কাছে এনে লেখাটির কোনও অংশ পড়ে নিচ্ছেন। আর তারপর পরামর্শ দিচ্ছেন কী কী করলে লেখাটি আরও ভালো, আরও মনোগ্রাহী হবে। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কলেজে যে ক'বার গেছি কখনও সোহারাবদাকে একা বসে থাকতে দেখিনি। তাঁর ঘরে সবসময় দু'চারজন ছাত্রছাত্রী আছেই। আসলে ছাত্রছাত্রীমহলে আনন্দমোহন কলেজের বাংলার এই অধ্যাপকের জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। সদাহাস্যময় এই মানুষটি আসলে শুধু তো তাদের শিক্ষক নন, তিনি তাঁদের বন্ধুও। ওই ঘরের আড্ডায় বসে এটা আমার সবসময়ই মনে হয়েছে।

সোহারাব হোসেনের সঙ্গে আমার আলাপ সম্ভবত ২০০৩-এর মাঝামাঝি। তারিখটা আজ আর মনে নেই। তবে স্পষ্ট মনে করতে পারি, বন্ধু মারুফ হোসেন (কর্ণধার— অভিযান পাবলিশার্স) তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সেটা বারাসাতের কোনও এক বইয়ের দোকানে। তার কিছুদিন আগে, জানুয়ারি ২০০৩-এ কবি জসীম উদ্‌দীনের জন্মশতবর্ষে আমার সম্পাদিত পত্রিকা দীপন-এর 'জসীম উদ্দীন সংখ্যা' প্রকাশিত হয়েছে। সেটা পেয়ে তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন, আর আমার হয়েছিল আক্ষেপ। বারবার মনে হচ্ছিল, আহা, যদি আর কিছুদিন আগে আলাপ হত, তাহলে 'জসীম উদ্দীন সংখ্যা'র জন্য তাঁর কাছে থেকে চমৎকার একটা লেখা পেতে পারতাম।

যদিও তার পরের বছরেই আমার সে আক্ষেপ মিটে গেল। সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্মশতবর্ষে দীপন-এর 'সৈয়দ মুজতবা আলী সংখ্যা'য় তিনি লিখলেন 'মুজতবা-গল্পের নন্দনবিশ্ব'। মুজতবা আলীর গল্পে নন্দনতত্ত্ব নিয়ে অসামান্য সে-লেখাটি পাঠকমহলে বেশ প্রশংসা পেয়েছিল। আর তারপর থেকেই সোহারাব হোসেন আমার 'সোহারাবদা' হয়ে গেলেন। হয়ে গেলেন দীপন-এর অন্যতম প্রধান লেখক, আর আমাদের 'ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড'। প্রতিটি সংখ্যার কাজ শুরুর আগে ও পরে চলতে থাকল তাঁর সঙ্গে আমার অনিবার্য কথোপকথন; তাঁর নিয়ত পরামর্শে দীপন-কে আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ করে তোলার চলমান প্রক্রিয়া।





ইতিমধ্যে কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। একদিন আমার বন্ধু অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে দেখা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে; আমার আরেক বন্ধু অধ্যাপক-প্রাবন্ধিক বরেন্দু মণ্ডলের রুমে। পুরুলিয়ার পঞ্চকোট মহাবিদ্যালয় থেকে তৌহিদ তখন সেখানে রিফ্রেশার কোর্স করতে এসেছে। সে কয়েকদিন আগে গিয়েছিল সোহারাবদার বাড়ি। তৌহিদ কথায় কথায় জানালো, সোহারাবদার চোখের অবস্থা এখন ভয়ানক খারাপ। একটা চোখে প্রায় দেখতেই পাচ্ছেন না। খুব শিগগির অপারেশান করাতে হবে। খবরটা শুনে খুব মুষড়ে পড়েছিলাম। সোহারাবদা তার অনেক আগে থেকেই চোখের সমস্যায় ভুগছেন। তা সত্ত্বেও চোখের ব্যথাকে বেমালুম হজম করে অনলস লিখে চলেছেন একের পর এক গ্রন্থ। কিন্তু এই সময়টায় অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে তাঁর লেখালিখি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। সোহারাবদার মতো এমন এক প্রতিভাধর লেখকের জন্য এ ভারি কষ্টের সময়। অপারেশান হয়ে গেল। কিছুদিন পরে আমি ফোন করতেই জানালেন, এখন আগের চেয়ে ভালো আছেন। কিন্তু আমরা দেখলাম, তাঁর আর একটি নতুন চশমা হয়েছে যার কাচ আতশ কাচের চেয়েও পুরু। তবু মেজাজ হারাননি সোহারাবদা। এতকিছুর পরেও তিনি সদাহাস্যময়। যেন এ এক অতি সাধারণ ঘটনা।

কেমন মানুষ ছিলেন সোহারাবদা? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কি কঠিন? মাঝারি উচ্চতার ফরসা, স্বাস্থ্যবান, সদাহাস্যময় মানুষটির সবচেয়ে বড়ো গুণ হল— তিনি যে কোনো সদ্য-পরিচিতকে সহজেই আপন করে নিতে পারতেন। প্রথম দিনেই সদ্য-আলাপিত ব্যক্তির মনে হত তিনি কোনো স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, যে স্বজন তাঁর বহুদিনের চেনা। আর তাই সদ্য-পরিচিতের বেড়া চুরমার করে তাঁদের সে-আলাপ এক অন্তরঙ্গ কথোপকথনের অভিমুখে যাত্রা করত। সে-যাত্রায় কোনও স্বার্থের ঠোকাঠুকি নেই, বরং আছে এক আনন্দময় মত-বিনিময়ের সহজিয়া উষ্ণতা। আর আমরা যারা তাঁর বহুদিনের পরিচিত, তাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহোদরের মতো। তেমন সহোদর যিনি অনায়াসে ধরিয়ে দেন ভুল, আর ভালো কিছু করে ফেলতে পারলে আমাদের চেয়ে তাঁরই আনন্দ হয় বেশি। এ আমার দীর্ঘদিনের অনুভূতি। তাঁর অন্য পরিচিতজনেরাও আশাকরি এ-ব্যাপারে আমার সঙ্গে সহমত হবেন।

চোখ যেমন সোহারাবদার লেখার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল, তেমনি তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাবও তাঁকে চাকুরি ক্ষেত্রে আরও উঁচু পদে যাওয়ার গতিপথকে রুদ্ধ করেছে। বারবার নানা কূট রাজনীতির শিকার হয়েছেন তিনি। আসলে কারও 'মোসাহেব' হতে পারেননি বলেই যোগ্যতার অধিক থাকা সত্ত্বেও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হতে পারেননি। এই প্রক্রিয়াটিকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতেন। তবে এ-নিয়ে সোহারাবদার কোনও আপশোশ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন— যোগ্যজনেরা তাঁকে ঠিকই মনে রাখবেন। সমাজে, বিশেষত বাঙালির এখন চারিত্রলক্ষণই হল— কে কাকে টেনে নীচে নামাতে পারে। ছলে বলে কৌশলে দাবিয়ে রাখার এই প্রক্রিয়া এতটাই সক্রিয় যে আমরা

যোগ্যতমকে বাহবা জানাতেও কুণ্ঠা বোধ করি। রাজনৈতিক নেতাদের জয়গান গেয়ে, তাদের 'নিজের লোক' হয়ে উঠে মধ্য ও নিম্নমেধার এই 'যোগ্যতম হয়ে ওঠা'র ঘটনাবলী আমাদের কোন্ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে চলেছে!

রক্তমাংসের সোহারাবদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আমি জানি, বাড়ি ফিরে যখন পত্রিকার কাজ নিয়ে বসি— সোহারাবদা তখন আমার মধ্যে প্রবলভাবে উপস্থিত থাকেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়েও তাঁকে শেষ-দেখা দেখতে যাওয়ার সাহস হয়নি আমার। সোহারাবদার ওই মুখ আমি দেখব কীভাবে? আমি যে চিরটা কাল তাঁর সেই অমলিন হাসিমাখা মুখটাকেই এ বুকে ধারণ করতে চাই। তাঁর হাসি, কথা বলার ধরন, কাছে টেনে নেওয়ার সহজাত অভ্যাস আমাকে যে আরও নমনীয়, আরও মাটির কাছাকাছি টেনে নিয়ে যায় প্রায়।

আমার সম্পাদিত প্রবন্ধের পত্রিকা 'দীপন' নিয়ে সোহারাবদা খুবই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। একবার তাঁদের বারাসাতের বাড়িতে রাত্রিযাপনের সময় তুমুল আড্ডার মধ্যে সোহারাবদা আমার হাতে তুলে দিলেন তাঁর অন্যতম সেরা গ্রন্থ 'মহারণ'। পাতা খুলে দেখি, সোহারাবদা লিখেছেন, 'সংস্কৃতির মহারণ লড়ছে যে/ জুলফিকার/ স্নেহাংশু সমীপে/ সোহারাব হোসেন/ একুশ/বারো/ দু' হাজার চোদ্দো।' জীবনে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী-ই বা হতে পারে!

আসলে সোহারাবদা তাঁর নিজের মতো করেই এক ভুবন তৈরি করে নিয়েছিলেন। এক নান্দনিক ভুবন— যেখানে গল্পকার-প্রাবন্ধিক-ঔপন্যাসিক সোহারাব হোসেন মুনিয়াভাবি, সোহম, তাঁর ছাত্র-ছাত্রী ও পরিচিতজনদের নিয়ে এক হার-না-মানা জীবনচর্যায় মেতে থাকতেন। তাঁর ভাবনা ও কাজে আমরা যেন এক যৌথ খামারের ছবি দেখতে পেতাম, যেখানে সোহারাবদাকে কেন্দ্র করে সমস্যাদীর্ণ এই আবহে আমাদের দৈনন্দিন যাপন আরও সহজ, সুন্দর ও অমলিন হয়ে ওঠে।

**আ শা দু জ্জা মা ন বি শ্বা স**

## ড. সোহারাব হোসেনকে যেমন দেখেছিলাম

অসামান্য প্রতিভা সোহারাব হোসেনের অকাল মৃত্যু মানতে পারি না আজো, কারণ তা মানা যায় না। আমার পেশার জায়গা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক ষ্টাফ কলেজ। যেখানে প্রতিভাবানদের যাতায়াত অবিরত। এখানেই প্রথম পরিচয়, তবে এই মুহূর্তে আর মনে নেই দিন, তারিখ। তবে মনে আছে বাংলা বিভাগের এক স্বনামধন্য অধ্যাপকের কাছে শুনেছিলাম সোহারাব হোসেনের গল্প। কোন এক প্রসঙ্গে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক নিয়ে কথা বলার সময় উনি বলেছিলেন যে ওনার দেখা ছাত্রদের মধ্যে সোহারাব হোসেন অন্যতম। খুব ভালো লেগেছিল শুনতে আর উৎসাহ বোধ তৈরি হয়েছিল মানুষটা সম্পর্কে। প্রথমেই বলেছি আমার পেশার জায়গা প্রতিভাধরদের নিয়ে এবং তাদের সেখানে আসতে হয় চাকরির পদোন্নতির জন্য, তাই সোহরাবদার দেখা পেতে আমাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয় নি। সোহারাবদা এসেছিলেন দৃপ্ত পদক্ষেপে আমাদের বিভাগে ২৮ দিনের Orientation course করতে। অংশগ্রহণ এবং paper presentation র মধ্যে দিয়ে উনি ওনার মেধার জাত চিনিয়েছিলেন। সোহরাবদার বাচনভঙ্গি ছিল অসাধারণ। পড়াশুনোর বিষয় নিয়ে নিরন্তর গবেষণা করা দেখে বুঝতে পারতাম কিভাবে উনি বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন। দেখতে দেখতে কবে থেকে যে গুণমুগ্ধ ভাই হয়ে উঠলাম বুঝতে পারলাম না। উজ্জীবন পাঠমালাতে অংশগ্রহণ করে আমাদের অ্যাকাডেমিক স্টাফ কলেজের তদানীন্তন কতৃপক্ষ ওনাকে শিক্ষকদের পড়ানোর জন্য resource person হিসাবে নিয়োগ করে ওনার প্রতিভাকে সম্মান জানিয়েছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে বিগত ২০০৭ থেকে আমৃত্যু সোহারাবদা Academic staff collegeর একজন resource person ছিলেন। বিভিন্ন course-এ অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণকে সোহারাবদার শিক্ষা সহায়ক ভূমিকা সম্পর্কে ভূয়সী প্রশংসা করতে শুনেছি। বিষয় উপস্থাপনাকে তিনি এক অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। সোহারাবদার চারিত্রিক গুণাবলী আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। তিনি একজন আপাদমস্তক ভদ্রলোক। অমায়িক, নম্র, বিনয়ী এমন মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। আলাপের পর থেকে ভাই ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধন শুনিনি ওনার মুখে। ভীষণ ভাবে আন্তরিক এক মানুষ।

যতদূর জানি বেশ অল্প বয়সে সোহারাবদা মাদ্রাসা বোর্ডের সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, উদারীকরণের মধ্য দিয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা এক অন্য মাত্রা পেয়েছিল বলেই আমার ধারণা। একাধিক syllabus committeeর প্রধান হিসাবে বিভিন্ন বোর্ডের দায়িত্ব তিনি দক্ষতার সাথে পালন করেছিলেন। এককথায় সমসাময়িক

সময়ের তিনি একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। কোনো সংস্কার তাঁকে বাধতে পারেনি। উদার মানসিকতায় সব সংস্কারকে তিনি হেলায় উপেক্ষা করেছেন।

তাঁর বিরামহীন লেখনী এককথায় অনবদ্য। অসামান্য কথাসাহিত্যিক, ছোট গল্পকার, ঔপন্যাসিক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সোহরাবদার লেখা বেশ কিছু বই পড়ার সৌভাগ্য বা সুযোগ আমার হয়েছে। পড়তে পড়তে জেনেছি তাঁর লেখার বাঁধুনি অতি চমৎকার, অসাধারণ তার শব্দচয়ন। সোহরাবদার লেখা গল্প, উপন্যাস একবার পড়তে শুরু করলে তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিরতি নিতে পারি না। অল্প কথায় নিজেকে প্রমাণ করেছিলেন এক প্রতিভাবান কথাসাহিত্যিক হিসাবে। তাঁর অকাল মৃত্যু বাংলা সাহিত্যে অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর লেখা 'সরম আলির ভুবন', 'মাঠ যাদু জানে' ইত্যাদি উপন্যাস পড়তে পড়তে জেনেছি গ্রাম্য মানুষের কথাবলার ভঙ্গি, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি কত সুন্দরভাবে লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা যায়। গ্রাম্য ব্যবহারিক ভাষার এমন আশ্চর্য প্রকাশ আমাকে বিমোহিত করেছে বারবার। এমন প্রকাশভঙ্গি সহজে চোখে পড়ে না। সোহারাবদার সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে তাঁর লেখা গল্প, উপন্যাস সবার পাঠ্য হয় হওয়া উচিত। সোহারাবদা ছিলেন সাম্যবাদে বিশ্বাসী একজন প্রকৃত সাম্যবাদী মানুষ। বহুবার তাঁর সাথে এই মতাদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছি, দেখেছি কি দুরন্ত আবেগ দিয়ে বলে চলতেন মানুষের সমান অধিকারের কথা। তিনি ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন কিনা জানতে পারি নি কখনো, কিন্তু ধর্মান্ধ যে ছিলেন না তা হলফ করে বলতে পারি।

অবশেষে বলতে চাই সোহারাবদার অকাল মৃত্যু, এই অসামান্য প্রতিভার ইহলোক ত্যাগ করে চলে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের এবং বাঙালি পাঠককুলের অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর ছেড়ে যাওয়া শূন্য স্থান পূরণ করার মতো খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে। এত বড় পৃথিবীতে কেউই হয়তো অপরিহার্য নয়, তবুও বলবো সোহারাবদা তাঁর লেখনী, শিক্ষকতা অসাধারণ বাচনভঙ্গি এবং মানবিক গুণ নিয়ে বাঙালির মনের মণিকোঠায় অনেক দিন ধরে বিচরণ করবেন।

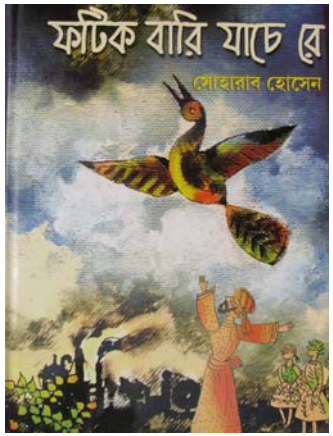


**অ জি ত ত্রি বে দী**

## আবভাশিক শরক্ষেপণ অথবা খননপর্বের জহুরি উৎসর্জন

যদি সমগ্রেই সিদ্ধির নৈপুণ্যকেই বুঝি তাহলে শিল্প শুধুই শিল্প, বিষয়কে বুঝিনা, আর যদি বিষয়কেই বুঝি তাহলে শিল্পকে বুঝি না। পৃথক অস্তিত্বে বিষয় বলে কিছু থাকতেই পারে না, কেননা কোনো ঘটনাকে বিষয় হয়ে উঠতে গেলে প্রথমেই শিল্পের শর্তগুলোর শৃঙ্খলে ধরে নিতে হয়, এবং তা নিয়ন্ত্রিত হবে ঘটনা বা কাহিনীর অন্তর্গত ধর্মে বা প্রবণতাতেই, লেখক সেখানে সংঘটন প্রক্রিয়ার কেউই নন। বাস্তবে একটি ঘটনা যখন ঘটে তখন তা মানবজীবন তথা সমাজের অন্তর্গঠনসূত্রে প্রাপ্ত, একটি মৌলিক সমর্থনপুষ্টি হয়ে বিষয় যোগ্যতা লাভ করে, এই যে বিষয়-যোগ্যতা প্রাপ্তি, এর মূলে এক অদৃশ্য পরম্পরার শৃঙ্খলা-পদ্ধতি কাজ করে, ফলে ঘটনার পরিণতি গিয়ে দাঁড়ায় শিল্পে, সুতরাং কোনো মহৎ শিল্প মানেই মহৎ বিষয়, বিষয়ই শিল্প। লেখক বা ঔপন্যাসিক বাস্তব সামাজিক বা কোনো রোমান্টিক বাঁকজটিল কোনো ন্যারেশনকে যতক্ষণ না একটি ফ্রেমে আবদ্ধ করছেন, ততক্ষণ তা কোনো বিষয়ই নয়, নয় শিল্পও। এবং যখন সেটি একটি সুঠাম আদি-অন্ত্য বিন্যাস ও যুক্তি শৃঙ্খলিত ফ্রেমে পরিণতি পেয়ে যায়, এবং জীবন ও চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণের সততা বা সীমাকে অতিক্রম করে এক অনুপস্থিত অথচ জীবনের আন্তঃধর্মের বাস্তবতায় পূর্ণতা পেয়ে যায় তখনই তা প্রকৃত ইতিবাচক বিষয় বা শিল্প। অতএব, কোনো লেখকই বোধকরি কোনো ন্যারেশন রচনা করেন না, নির্মাণ করেন একটি বিশ্বাসযোগ্য জীবন অনুমোদিত বিষয় অর্থাৎ শিল্প। আর আবিষ্কার করেন কোনো চরিত্রকে নয়, নিজেকে, মৌলিকতাকে।

সুতরাং উপন্যাসের বিষয় বা শিল্প বলতে যদি এমন একটি ধারণাকে মানদণ্ড করে নেওয়া হয় তাহলে একটি উপন্যাস লিখতে গিয়ে তার গতিপ্রকৃতি কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, লেখক কিভাবে এগোবেন? এ বিষয়ে আলেক্সি টলস্টয়ের কথাই মনে আসে, আগেভাগে কখনো ভাবতেন না বা জানতেনই না যে তাঁর উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি পরবর্তী অনুচ্ছেদে পৌঁছে কি রূপ নেবে, কিন্তু তিনি সেটা বুঝতেন উপন্যাসের অনুচ্ছেদটি লেখার পরে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে পূর্বপরিকল্পিত কোনো প্লটের ছক এঁকে নিলেও লেখার মুহূর্তে তা ভাঙতে হয়, পরিবর্তিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে লেখকের উদ্দিষ্ট চরিত্ররা, যাদের তিনি রক্তে-মাংসে জীবন্ত মূর্ত করে তুলতে চান, তাঁরাও ধরা দিতে, বা প্লটের সীমার মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করতে রাজী হয় না, ফলে লেখক এখানেও অসহায়। প্লটে হেরফের ঘটে যায়। এ বিষয়ে বড় সমর্পণ চেখভের 'দি ফিয়াঁসে' গল্পটি। এসবই লেখকের শৈল্পিক দায় বা কর্তব্যকে নিয়েই বিশেষ জরুরি বিষয়, ফলে বিষয় বা শিল্প হয়ে ওঠাই, ঘটনা ও চরিত্রকে এমন একটি মার্গে তুলে আনাই শিল্পীর নির্মাণ, মৌলিক আবিষ্কার।

একথা বলা যেকারণে সেটি এমনই একটি উপন্যাস যাকে দীর্ঘদিনের প্রচলিত শিল্পনির্মাণগত আবহ, কাঠামো তথা পদ্ধতির মধ্যে কোনোভাবেই বুঝে উঠতে পারা যায় না। 'একটা রূপকথার বিবরণ' অথবা 'কেয়ামতের দরবেশ হবার কাহিনী' শীর্ষক এই উপন্যাসটি এতদিনের পাঠ, শিল্প নির্মাণ অভিজ্ঞতাকে আমূল তছনছ করে দিয়েছে! লেখক সোহারাব হোসেন, যিনি উপন্যাস রচয়িতা হিসেবেও এ উপন্যাসে প্রথম। অন্তত আমি তাঁকে আগে জানি কবি হিসেবে, বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ছোটগল্প তাঁর পড়েছি, কিন্তু সেসব বাদ দিলে অন্তত এ উপন্যাসে খুঁজে পাই এক ভিন্ন গমকের স্বতন্ত্র উচ্চারণের, ব্যক্তিত্বের, অভিজ্ঞানের সম্পূর্ণ নতুন সোহারাবকে। সোহারাব এতদিনকার উপন্যাস শিল্পের জমাট বাঁধা রসকে ভেঙেছেন, বদ্ধ জলাশয়ে আঘাত হেনে বহুত্ব ব্যঞ্জকতার স্বরগুলি জাগিয়ে দিয়েছেন। তবে, তাঁর এই বিশেষ শিল্প নির্মাণের ভেতরে প্রবেশ করার আগে একেবারে হালফিলে, অন্তর ও আন্তর্জাতিকে একটু দৃষ্টিক্ষেপণের প্রয়োজন থেকে যায়। অর্থাৎ যে সময়ে লেখক লিখছেন, দেখছেন, ভাবছেন, যে পরিপার্শ্ব তাঁর নির্মাণ কুশলতাকে একটি মৌলিক আদলের তাৎপর্যদানে সক্রিয়, সেটিই তাঁকে ও তাঁর উপন্যাসকে বোঝার মূল চাবিকাঠি।

আজ সারা বিশ্বের মনন ও দর্শনের জগৎ এক একটি অত্যাদ্ভুত চিন্তা প্রক্রিয়ায় আলোড়িত, উদবেজিত। বিশ্বজুড়ে ইউরোপ, আমেরিকা বা পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক গূঢ় শিল্পতাতিত্ত্বক মতবাদের আন্তঃসারশূন্যতা আবিষ্কৃত হয়ে গেছে, নান্দনিক মতবাদের ও পরিকাঠামোর বহুবর্ণের দীপ্তিময়তার ছদ্ম আড়ালে দীর্ঘকাল যে কূট শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে, তা দুনিয়াজুড়ে সমাজতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক চেতনার নবউত্থানে পলেস্তারার মতো খসে পড়ছে, চিন্তাবিশ্বে তথা ভাববিশ্বে শুরু হয়ে গেছে তুমুল ভাঙন, পশ্চিমী দেশগুলো শিল্পের তত্ত্বের মোড়কে ঢেকে রাখা কলোনিয়াল সিস্টেমকে এখন রিমডেলে ঢেলে সাজাতে সূক্ষ্ম ও দক্ষ নৈপুণ্যে বিশ্বজুড়ে আমদানি করতে চাইছে পোষ্টমডার্নের তত্ত্ব। মডার্নিজমের মাকালফলের স্বাদ ততদিনে আত্মস্থ করে প্রাচ্যের চিন্তারাজ্যে বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে নিজস্ব মডার্নিজমের আবিষ্কারে। আজকের গ্যাট, আই-এম. এফ. ডব্লু. টি. ও এবং বিশ্বব্যাঙ্ক ইত্যাদির শাসন নিয়ন্ত্রণে পর্যুদস্ত তৃতীয় বিশ্বের বাস্তবে এক নায়কত্ব করে চলেছে মিডিয়ার ব্যাপক দাপট, পণ্যায়নের বিকৃত লালসায় শিল্প-সাহিত্য বিশেষ করে কথাসাহিত্যের সামনে যে মহাসংকট সৃষ্টি হয়ে গেছে তা হল প্রিন্টমিডিয়া এবং অডিওভিসুয়াল মিডিয়ার যৌগপত্যে এক ধরনের মাষ্টার ডিসকোর্স অর্থাৎ মহাসন্দর্ভ নির্মাণ প্রচেষ্টা। যেটি একটি বিশেষ সমাজের বড় অংশের পক্ষে গ্রহণের উপযুক্ত। এর উদগাতা মিডিয়া। লক্ষ্য বাণিজ্যিক সফলতা। ফলে মানুষের প্রতিদিনকার কথার সন্দর্ভ টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। লেখকরা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে মিডিয়া উৎপাদিত মহাসন্দর্ভের ফাঁদে পা দিচ্ছে আরো বাণিজ্যিক সুরাহার লোভে। ক্রমশ লেখকের বাস্তব সামাজিক দায়,



শিল্পের দায় ও বাস্তবতা বিঘ্নিত হচ্ছে, সমৃদ্ধ হচ্ছে একমাত্রিক পুঁজি। এই মুহূর্তে প্রয়োজন শিল্পের দায়বদ্ধতা ও সামাজিক বাস্তবতার কঠিন কাজগুলি সম্পাদনের জন্য মিডিয়া অনিয়ন্ত্রিত সেই মহাসন্দর্ভ যেটি হবে উদার মানবিক, ব্যাপ্ত বোধ ভিত্তিক বহুমাত্রিক এবং বহুস্বরিক। এখান থেকেই যদি উপন্যাস গল্প সৃষ্টির সূত্র, ডিসকোর্স সংগ্রহ করে, লেখকরা কাজ শুরু করেন, তাহলে পশ্চিমী ধাক্কার একেবারে বাইরে আসা সম্ভব এবং একেবারে দেশজ মাটি, বিজ্ঞান ও কৌমের শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করে আজকের কথাসাহিত্য নিজস্ব চিন্তনের বয়ানে, টেক্সট-এ, কনটেন্টে সম্পূর্ণ আলাদা সন্দর্ভে অস্তিত্ববান হয়ে উঠবে। সুতরাং পাশ্চাত্যে শিল্প-সাহিত্যে যদি এখন পোষ্টমডার্নের যুগ চলে তাহলে প্রাচ্যে আধুনিক বা মডার্নিজমের নিজস্বতার অনুসন্ধান মুহূর্ত, তাকে উত্তর-আধুনিক শব্দে অনুবাদ করলেও তার অর্থকে নেব পূর্বতনকে আবিষ্কার, শিকড়ে ফিরে আসা। আর এখানেই বহুমাত্রিকতা বা বহুস্বরিকতার সূত্রটি। সুতরাং প্রাচ্যে এখন মালটি থিওরি, মালটি থিংকিং অ্যাণ্ড অ্যানালিসিস-এর যুগ।

ঠিক এখান থেকেই আমরা শুরু করতে পারি সোহারাবের যাত্রাপথের পর্ব পর্বান্তরের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ। শুরু করতে পারি নাই, সোহারাব তাঁর উপন্যাসের নামকরণে সে নির্দেশ দিয়ে দেন প্রথমেই। এবং আমাদের পূর্ব অর্জিত সমস্ত চিন্তাশৃঙ্খলা, ধ্যানধারণাকে, ঘিলু, মেধাকে বেশ করে চটকে দেন। উপন্যাসের শুরুটা যেন উপন্যাসের শুরুই নয়, তবে কি? একরকম প্রশ্ন থেকেই পাঠক হিসেবে আমাদেরকে সোহারাব তাঁর প্রতিটি বর্ণে, অক্ষরে, শব্দে, দৃশ্যে, শেষ অব্দি গোটা উপন্যাসে হাঁটান। এত শাখাজটিল কাহিনীগ্রন্থনা, প্রতিবেদন, সংলাপ, দৃশ্যকল্পের গাঁথুনি, শব্দের ঠাস বুনুনি, পড়তে পড়তে মাঝে মধ্যে পথ হারায়, কিন্তু ক্লান্তি আসে না কোনো ভাবেই, অমোঘ টানে লেখক কেবলই টেনে নিয়ে যান একটি থেকে আরেকটিতে। মাঝে হঠাৎ করেই ঘনিয়ে তোলেন এক এক ধরনের প্যারাডক্স। লেখক তাঁর সমাজবাস্তবতাকে, চিন্তার মৌলিক দর্শনকে মূল কনটেন্টে বেঁধেছেন দশটি সাব টাইটেলে বিভক্ত করে। প্রতিটি পর্বে এক একটি সূক্ষ্মতর দর্শন, সামাজিক, মানবিক আবহ ঘনীভূত, কেন্দ্রাভিমুখী এবং প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি ইন্টারলিঙ্কড। যে কোনও লেখক তাঁর বিষয় বা শিল্পকে একটি তত্ত্বের বিন্দু বিশ্বে দাঁড় করাতে চান, সোহারাবও চেয়েছেন, কিভাবে কোথায় কি সেই তত্ত্ববিশ্বটি ভাবনার অণুবীক্ষণিক স্তরায়নের মধ্য দিয়ে শিল্প সফল হয়ে উঠেছে সেটাই এখন দেখা যাক।

সোহারাব তাঁর উপন্যাসটিকে দুটি পরস্পর বিরোধী ভাব-বিন্দু থেকে যে জায়গাটিতে নিয়ে যেতে চেয়েছেন সেটি এক গভীর তত্ত্বের জগৎ এবং আপাতভাবে ভাব দু'টির মধ্যে বিরোধাভাস লক্ষিত হলেও তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে আসলে দু'টির মিলন-বিন্দু এক এবং অভিন্ন। উপন্যাসের ফ্রেমে এই লক্ষ বিন্দুকে সামনে রেখে পাশাপাশি দু'টি আবহ গড়ে নিয়েছেন, একটি রূপকথার, অন্যটি দরবেশ হবার কাহিনীর। রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক

রসতত্ত্বের যুগল মিলনই তাঁর কাহিনী নির্মাণের কেন্দ্রীয় থিম। এই কঠিন কাজটি তিনি করতে চেয়েছেন আবহমানের পরম্পরার মধ্য দিয়ে, জাগতিক জীবন-দ্বন্দ্ব, দেহসর্বস্বতা, কাম ও রাজনৈতিক নানা বাঁক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণমূলক অভিজ্ঞানের আলোকে। তিনি উপন্যাসের আধারে যে রসটিকে স্থাপন করে মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে চেয়েছেন সেই রসটি নিঃসন্দেহে আদিরস শৃঙ্গার, বা অন্য সমস্ত রসকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত করে নিজেই মানবের সার তত্ত্ব হয়ে ওঠে। তাহলে উপন্যাসের দু'টি ধারা, এক, নির্জলা রাজনৈতিক বাস্তবতার দ্বন্দ্বজটিলতা, দুই, গভীরতর সাধন মূলক রসগত বিশ্লেষণ। ফলে বাস্তব আর পরাবাস্তব খুব পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে, তাঁর প্রতিটি শব্দ ও বক্তব্য বন্ধনের বাঁকে বাঁকে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে। এবং ভেতরে সেই বাইরের অভিঘাতটিকে পৌঁছে দেবার জন্য মাঝে মধ্যে তিনি কৌশলে সৃষ্টি করেছেন এক একটি হাস্যরসাত্মাক অথচ শাণিত দৃশ্যকল্প, এবং নূরবুড়ির 'সমূস্যে'র পর্যায়ক্রমিক বিশ্লেষণ। কাহিনীর এই আধারে চরিত্র নির্মাণগত শৃঙ্খলাটিকে বা চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্র এবং তার মধ্য দিয়ে লেখকের উদ্দিষ্ট যাত্রা বিন্দু অবধি যে বাঁকবদল, ভেতর বাইরের মোচড়, তা বিশ্লেষণের আগে সংক্ষেপে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে 'রূপকথা' শব্দটির প্রয়োগিক তাৎপর্যে। সোহারাব চাইছেন বর্তমান রাজনৈতিক বিশ্বের গতিপ্রকৃতি তথা সমাজবাস্তবিক জীবনে তার অভিঘাতটি বিশ্লেষণ করতে এবং এক দার্শনিক উপলব্ধি, যেটা কোনোভাবেই পশ্চিমী চিন্তাজাত নয়, বরং পাশ্চাত্য শিল্প ও জীবন বাস্তবতার বাইরে সম্পূর্ণ দেশজ ঐতিহ্যিক পরম্পরার শিকড় সঞ্চারী চিন্তার বহুমুখীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তিনি বাতাবরণে বেছে নিলেন রূপকথার আবহটি। কেন? আসলে এদেশের জীবনধর্মের মৌল অভিজ্ঞতায়, মননবিশ্বের শিকড় গেড়ে বসে আছে এ দেশীয় মিথ বা আর্কিটাইপ, আর সেই জন্য বারবার ফিরে আসার টান সমগ্র মানব অস্তিত্বে দুর্বার, প্রকটিত! ইউরোপীয় মার্কসবাদী তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা আজ রাজনৈতিক দুনিয়া করে চলেছে তার গভীরে নামলে দেখা যায় এদেশের কৌম সংস্কৃতির আউল বাউল তত্ত্বের সঙ্গে তার গূঢ় সম্পর্ক, রাজনীতি অর্থাৎ নীতি-শ্রেষ্ঠ, যার লক্ষ্য মানুষ, আর সেই মানুষকে নিয়েই ফকিরি তত্ত্বের সাধনা যার মেরুদণ্ড 'বিন্দু' বা মানব দেহের সারবস্তু, এই সারবস্তুই মানুষের দেহের রাজা, রাজনীতির সঙ্গে এখানেই তত্ত্বের সম্পর্ক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে যে অস্তিবাদের ধারণাটি প্রবক্তা কীয়ের্কেগাদের মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, জাঁ পল সার্ত্র নতুন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেখালেন অস্তিবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের সম্পর্কটিও গভীরে কত ঘনিষ্ঠ। ফলে, ঐতিহ্য বা অস্তির দিকে ফিরে যাওয়াই এই উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে—তাই মার্কসবাদ, ফকিরিবাদ, ওপরে যেমনভাবেই ব্যাখ্যাত হোক ভেতরে পরস্পর অবিচ্ছিন্ন, অস্তিত্বকে জড়িয়েই। কিন্তু, তাই বলে রূপকথা? হ্যাঁ, উপকথা, রূপকথা এবং লোককথা, এই পর্যায়ক্রমিক চেতনাগত স্তরায়নের মধ্যে 'রূপ' শব্দটি এদেশের প্রাকৃত চিন্তারই শব্দরূপ, যেখানে 'কথা' বা 'কাহিনী'



বহন করে আনছে বাস্তবের সমস্যা, সংঘাত, জীবনরস, কিন্তু রূপকথার মধ্যে তাকে দেখা যাচ্ছে কিছুটা বাস্তব কিছুটা অবাস্তব চেহারায়, এ এক ধরনের জারণ, পরাবাস্তবকে ধরে বাস্তবের বিশ্লেষণ, তাহলে, 'পরী' শব্দের সঙ্গে 'রূপ'-এর সম্পর্ক কী? সোহারাব এখানেই দক্ষ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। লোককথার অন্যতম প্রধান শাখা রূপকথা। যদিও এখানে বিতর্ক কম নেই। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই একশ্রেণীর লোককথার প্রচলন আছে, যাকে বলা হয় Fairy tale। 'Fairy' শব্দের অর্থ 'পরী', সুতরাং এই ইংরেজী শব্দ দিয়ে পুরোপুরি বৈশিষ্ট্যটিকে ধরা যায় না। কারণ এক্ষেত্রে পরীর কথা সবসময় থাকে না। কিন্তু আয়তনে দীর্ঘ, বিভিন্ন বিষয় এবং বিচিত্র শাখা কাহিনীতে বিষয়টিকে জটিল করে তোলে। এর পরিবেশও অবাস্তব, স্বপ্নীল চরিত্র, ঘটনাস্থান এখানে কোনভাবেই সুনির্দিষ্ট নয়। অবিশ্বাস্য ও রোমাঞ্চকর ঘটনায় পরিপূর্ণ। এর নায়ক কোনো অপরিচিত দেশের রাজপুত্র নতুন এক অপরিচিত দেশে প্রবেশ করে অসম্ভব কতকগুলো বিপর্যয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেখানকার রাজকন্যাকে বিয়ে করে। সিংহাসনে বসে, জার্মান ভাষায় এ ধরনের লোককথাকে Marchen শব্দে চিহ্নিত করা হয়। ইংরেজিতে যাকে Fairy Tale এবং ফারসীতে বলে Contepopulativel, বাংলায় তাকে 'রূপকথা' বলে। সিটা থম্পসন বা আলেকজাণ্ডার ক্রাপের মতে সব 'Fairy' tale' এর মধ্যে পরী থাকেই তার অর্থ নেই। 'Fairy Tale' বা 'House Hold tale' বলতে এমন বহু গল্প বোঝায় যে প্রায় সব কাহিনীই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ ড. আশরফ সিদ্দিকী 'Marchen'-এর পরিবর্তে বাংলায় 'রূপকথা' শব্দটি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। সোহারাব হোসেনের উপন্যাস 'একটা রূপকথার বিবরণ' অথবা 'কেয়ামতের দরবেশ হবার কাহিনী' নামকরণে রূপকথার অনুসঙ্গের পাশাপাশি আর একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থা, জীবনযাপন বা সংস্কৃতির গভীরতর সম্পর্ক আছে। লেখক সোহারাব জেনে শুনেই উপন্যাসের নামকরণে এমনকি বিষয়ে অন্বিত করে দিয়েছেন এমন একটি ইতিহাসকে। জনশ্রুতি, বাংলায় যেদিন মুসলমানেরা প্রবেশ করেছিল, সেদিন তাদের সঙ্গে সঙ্গে পরীরাও চুপি চুপি বাংলার লোক-কাহিনীতে প্রবেশ করেছিল। ড. মযহারুল ইসলামও জার্মান প্রতিশব্দ 'Marchen' কে ইংরাজী 'Fairy tale' এর সমার্থক মনে করে রূপকথার সংজ্ঞা দিয়েছেন। লোক-কাহিনীর অন্যান্য শাখা অপেক্ষা দীর্ঘ, শাখাজটিল, কতগুলি ঘটনা সেখানে থাকবেই, এবং মোটিফ পরম্পরায় শেষ হবে। রূপকথার ঘটনা ঘটে অবাস্তব পৃথিবীতে। সব পেয়েছির দেশ রূপকথার মধ্যে সাধারণ নায়ক ও কখনো নায়িকা প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে রাজ্যলাভ করে, রাজকন্যাকে বিয়ে করে সুখে জীবন কাটায়। এখানে আছে দৈবপ্রসাদ, ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস। অপুত্রক রাজা দৈবক্রমে পুত্রলাভ করেন। একাধিক রানীর মধ্যে ফল ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে একজনকে ঠকানো অন্য রাজপুত্রদের বিপদমুক্ত করা। নরবলি, রাক্ষস খোক্ষসের দ্বারা মানুষের মাংস ভক্ষণ ইত্যাদি ঘটনা থাকে। ফলে রূপকথা প্রাগৈতিহাসিক এক বর্বরযুগে রচিত আদিম

সমাজের প্রথম রসসৃষ্টি বলে মনে করা হয়। উপন্যাসের মতো অবিমিশ্র কোন সমাজ জীবনের পরিচয় রূপকথায় থাকে না। তাহলে, স্পষ্ট হয় যে সোহারাব কতটা গভীর থেকে তাঁর উপন্যাসের প্লট গড়ে তুলেছেন। রূপকথার মতো এই উপন্যাসে এসেছে মুসলমান চরিত্ররা, কেয়ামত, রহিম বক্স, নূরবুড়ি, তমিজউদ্দিন, এবং যে ডিসকোর্স তাদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে সেগুলিও একটি ধর্মীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু লেখক এখানে এই সীমা ভাঙতে চেয়েছেন এবং গোটা চরিত্রের মুখে যে ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন, তার মৌল মিলন বিন্দু কিন্তু একটি মহাসন্দর্ভ বা মাস্টার ডিসকোর্স বা দেশজ ঐতিহ্যমুখী।

এবারে আসি কাহিনীতে। রাজনীতির দাবাখেলার জগৎকে সোহারাব রূপকথার মোড়কে বেঁধেছেন। খুব সতর্কভাবেই তাই তিনি নির্বাচন করেন এক একটি পলিটিক্যাল পার্টির চরিত্র-নির্দেশক হিসেবে, লাল, নীল, হলুদ। ঘটনা যতই নির্ভেজাল বাস্তব হোক, ঘটনা যেভাবে ঘটছে, তাতে আছে অন্য বাস্তবতা, সে বাস্তবতা রূপকথার কাছাকাছি, কিন্তু শিল্পের বাস্তবতা আবার অন্যরকম, উপন্যাসে শেষ অব্দি যেটা সার্থকভাবে লেখক দেখিয়েছেন। কাহিনীর দু'টি ধারার মাঝখানে কেয়ামত ছপুরা। কেয়ামত বাস্তবের জটিল রাজনৈতিক জগতের চরিত্র। নীলপরী তামিজউদ্দিন কর্তৃক খাদেম জেলেকে ঠকানো। কেয়ামত ভোটসর্বস্ব রাজনীতিকে মেনে নিতে পারে না, সে চায় মানুষের উপকার করতে, সংশোধনী রাজনীতির গুলগাপ্পা আসে মানতে চায় না। ফলে নিজের দলের থেকে সে নিজস্ব অস্তিত্বে উঠে দাঁড়াতে চায়। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতির সমর্থকরা তাকে মেনে নিতে পারে না, পদে পদে আঘাত আসে কেয়ামতের জীবনে। 'কেয়ামতকে জ্ঞানহীন অবস্থায় তালপুকুরে ফেলে রেখে আঁধারমানিক গ্রামের আরো কিছু বিবরণ শোনা যাক। 'রহিম বক্স বলে, 'সাবধান কেয়ামত।' সে মার্কসবাদের নতুন ব্যাখ্যা চায়, তার দলের কেউ ঠিক মতো মার্কসবাদ জানে না। নীলপরী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কেয়ামতদের লালপরী দলের সংঘাত লেগেই থাকে। কেয়ামত সুস্থ চিন্তার মানবতাবাদী রাজনীতিতে বিশ্বাসী। পার্টি করতে রাজী, কিন্তু পার্টির রং না মুছে, নিজের উপলব্ধি মতো নতুন করে সংগঠন করতে চায় কেয়ামত। আজকের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সুবিধাবাদীরা যেমন রাতারাতি দল পাল্টায়, জমি, সম্পত্তি রক্ষার জন্য লাল থেকে নীল, নীল থেকে লাল হয়, নূরবুড়ীর ভাষায় যারা 'বেবুশ্যে', কেয়ামত তা পছন্দ করে না। কিন্তু তাদের অনেকেই তা দিনরাত করে চলেছে। রাজনৈতিক এই জটিলতার কেন্দ্রে আঁধারমাণিক গ্রাম, কেয়ামত যেখানকার নেতা, মানিক। লেখক জানিয়ে দেন, 'এ কাহিনীর গঠনরীতি স্বতন্ত্র। বিষয়বস্তুও ভিন্ন। কাহিনীটির বিষয়বস্তু হল, কেয়ামত-ছপুরার কাহিনীর রহস্যঘন মিথ ও কেয়ামত হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কে জনগণের ভাবনা।' উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে লেখক বেছে নিয়েছেন যে গ্রামটি সেই আঁধারমানিক হাতিপোতা অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন, সকলেই হানাফী সম্প্রদায়ের ও ফকির সম্প্রদায়ের মুসলমান। ফলে কেয়ামতের লক্ষ্য আধারমানিকের মুক্তি। নীলপরীদের সঙ্গে



তাদের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ক্রমশ জটিলতর হয়ে ওঠে। যুগীপোতা মাঠের নাম নিয়ে মাঠের দু'ধারের গ্রামের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। এখানেই নূরবুড়ীর পরাবাস্তব বিদ্রোহের শুরু। গোটা উপন্যাসে নূরবুড়ী পরাবাস্তব রসের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। তার কাহিনীর নেপথ্যে সোনার মাংসখণ্ডের অস্তিত্ব মেনে নিলে যে ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় তা এ পৃথিবীর চিরন্তন বঞ্চনা এবং ভোগবাদের ইতিহাস। 'ইতিহাস' এভাবেই পর্বে পর্বান্তরে বিধিধার্থ ব্যাঞ্জক হয়ে উঠেছে. গোটা উপন্যাসে নূরবুড়ীর ভূমিকা কাহিনীর বিস্তার, বহুকৌণিক বা বহু স্বরিক স্তরায়ণের ক্ষেত্রে মোক্ষম হয়ে ওঠে। তার 'সমস্যে' ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে লেখক সমাজের, মানুষের অতিসাম্প্রতিক জটিলতর দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শতাব্দী প্রাচীন নূরবুড়ীর কাহিনী নিঃসন্দেহে এদেশের শতাব্দীর চাপা বেদনা সংক্ষুব্ধ শোষণ জমিদারীর ইতিবৃত্ত। আর এভাবেই লড়াকু কেয়ামতের অস্তিত্বে নূরবুড়ী চাপে। মস্তিষ্কে নীলপরীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেমে তালপুকুরে আক্রমণে জ্ঞান হারায়। মাঝপথে এসে কেয়ামত জেরবার হয়। কোনো পথ খুঁজে পায় না সে। হানাফী সম্প্রদায় আর পীরসাহেবের মধ্যে তর্ক বাধে নামাজ পড়া নিয়ে, পরস্পর পরস্পরের গায়ে নোংরা ছোঁড়াছুড়ি। ধর্ম নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মুসলমানের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততা, খেয়োখেয়ি যেমন উপন্যাসের বিষয়ে একধরনের গতি আনে, তেমনি, কেয়ামত ছপুরার রহস্য ঘন মিথ নিয়ে উপন্যাসের আর এক টানটান উত্তেজনা। কেয়ামত রাজনীতির হাঁটু পাঁকে যখন বিধ্বস্ত, ছপুরাকে কেন্দ্র করে তার নামে পাড়ার মুখরোচক রটনা হয়, তখন লজ্জায় কেয়ামত ঘরবন্দী থাকে। ছপুরার দেহের, যৌবনের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরা কেয়ামত নিজেকে এক ঝটকায় মোহভঙ্গ ঘটায়, বাস্তবের মধ্যে এনে শক্ত হয়। বিরুদ্ধ পার্টির কাছে সহজে হারতে নারাজ সংগ্রামী কেয়ামতকে ছপুরা বলে, 'সংগ্রাম করতি হয়। তুমি এখোন অমর দরবেশ মজনু শা' পিরাগ শা সোভান আলি শা'র পথ ধরেছো। আজ যেরাম সংগ্রাম করে আমার রসের ঘরের দখল লেছো, সেইরাম সংগ্রাম করে জমির দখল লেছো, সেইরাম সংগ্রাম করে জমির দখল ল্যাও।' কেয়ামত আরো সাহসী হয়, ছপুরার স্বাধীন নারী চিত্তের উদ্বোধনী শক্তি পেয়ে সে রাজনীতির খেলায় আবার কোমর বাঁধে। অবশেষে রহিম বক্স সহ কেয়ামত আন্দোলনে নামে তমিজউদ্দিন মিয়ার বিরুদ্ধে উত্তরবিল দখল করতে। কেয়ামতের কথায়,'সারাটা আঁধারমানিক হাতীপোতার মানুষের অধিকার আছে ঐ বিলে।' একদিন যে ছপুরা তাকে পুরুষ প্রকৃতি জোড় তত্ত্ব শিখিয়েছে আজ সেই ছপুরাই সেই জোড় সংকেতকে প্রত্যাখ্যান করে। বলে, 'তুমি এখন সত্য সাঁই। বুঝলে দরবেশ নৌকা বাও—দরবেশ ভাসে প্রেম-সাগরে সদাই সে রমণী ভজে তবু তাতে সে কভু না মজে, রমণীর সঙ্গে না করে রমণ।' আবার এই ছপুরাই বলে, 'সোনার বিলের ভূমিতে কেয়ামতের পদযুগল আমূল প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। এবং শিকড় সমেত কেয়ামত একাকী হয়ে গেল। তাকে তো অনেকটা পথ নৌকা বেয়ে যেতে হবে।' মনে রাখতে হয়, লেখক এখানে 'নদী' ও 'নৌকাকে' কি অদ্ভুত কৌশলে

প্রতীকী তাৎপর্য দিয়ে রাজনীতির লড়াই-এ দেহজ কামকে জয় করার লড়াই ইত্যাদিকে সীমাহীনতায় পৌঁছে দিয়েছেন। আবহমান সংগ্রামী জীবন আর ইতিহাসের বিদ্রোহ এভাবে নিপুণ শিল্প কৌশলে একাকার হয়ে যায়। এই রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপকথা এভাবেই উপন্যাসের স্তরে স্তরে ভিন্ন ভিন্ন ডাইমেনশন নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে!

আবার এরই মধ্যে কেয়ামত ছপুরার মিথের আড়ালে চিরন্তন মানব মানবীর লিবিডোর দুর্মর টানাপোড়েন, ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বের আকর্ষণ বিকর্ষণকে সূক্ষ্ম সূতোর টানে উপন্যাসের শেষে ধাক্কা দেন লেখক। ছপুরাকে কেয়ামত বিভিন্ন মুহূর্তে বিভিন্ন রহস্যের মধ্যে দিয়ে নানারূপে দেখেছে। দেখেছে ছপুরাও কেয়ামতের জন্যে মানবিক দুর্বলতায় যৌনতার আবেদনে কখনো তীব্র উত্তেজিত, কখনো অবশ। শেষমেষ কেয়ামত ছপুরার রহস্যের আবরণ ভেদ করে চলে আসে খাজান সাঁই'র হোজরাতে। জানতে চায়, 'কোন্ বীজ ভিয়ান করিলে সাধু অমর হয়? দরবেশ হয়?' খাজান সাঁই তাকে 'গ্রন্থভেদি ষটচক্র' ভেদ সাধনার তত্ত্ব শিখিয়ে দেন। একই দেহ নিয়ে ছপুরা আর খাজান সাঁই দু'রকম পাঠ দেন কি করে কেয়ামত ভেবে পায় না। দু'জন দু'রকম রূপকথা শোনায়। খাজান সাঁই ত্যাগী ফকির। ছপুরা ভোগী ফকিরা। শেষমেষ ছপুরার ফকির তত্ত্বেই মার্কসবাদের মিল খুঁজে পেল কেয়ামত। এখানে লেখক কৌশলে লোকপুরাণ বা মিথকে গভীর থেকে গভীরতর করেছেন। একদিন যে অপরিণত বুদ্ধি মানুষ জগৎ সৃষ্টির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে এই মিথ-এর জন্ম দিয়েছিল, যে আদম-ইভ-এর জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়া নিয়ে গড়ে উঠেছিল লোকপুরাণ, তার পাশাপাশি ইবলিশ মিথকেও সোহারাব কাহিনীর কেন্দ্রীয় রসের অনুকূলে উদ্দিষ্ট তত্ত্বদর্শনের পরিপূরকতায় অনবদ্য ব্যবহার করে উপন্যাসের শিল্প সুষমা ঘটিয়েছেন। সৃস্টি রহস্য ব্যাখার জন্য কামকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় কেননা সৃষ্টির মূলে কাম থাকে, আর তাকে ধ্বংস করতে পারলেই শক্তির জাগরণ। বাউলতত্ত্বে ভগবান নানারূপে বিরাজ করেন। তাঁর সমস্ত জ্ঞান প্রেম ও শক্তির প্রকাশ মুহম্মদে। সেই সমস্ত শক্তিই আদমে রূপায়িত। দেহের মধ্যে যে অচিন্ পাখি তাকে ধরা, জানতে পারাই দেহ সাধনার মূল লক্ষ্য। তাই একতারার সুরে বাউলের তত্ত্বটি ব্যাখ্যাত হয়ে যায়, 'বা' মানে বাতাস, 'উল' মানে অনুসন্ধান। এর সঙ্গে নাথসাহিত্যের তন্ত্রের প্রসঙ্গটি অর্থাৎ ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার গভীরতর সম্পর্কটি সকলেরই জানা। 'দ্য হিউম্যান বডি ইজ দ্যা হায়েষ্ট টেম্পল অব্ গড'—বাউল সাধনার এই দেহতত্ত্বকে, এমনকি চর্যাপদের ভুসুকপাদ রচিত পদে "বাজনাব পাড়ী পঁউআ খাঁলে বাহিউ' ছত্রটি সাব টাইটেলে এনে কাহিনীর রসপর্যায়টিকে কংক্রিট বাঁধনের মধ্যে দিয়ে মোহানায় পৌঁছে দিয়েছেন। আমাদের বাস্তবের অসংগতি আর আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধনে, চর্যাপদে বজ্র (রূপ) নৌবহর গ্রাম্য রাজনীতির লালপরী নীলপরীদের কাটাকাটি, রক্তাক্ত সংগ্রামের ছবি যেমন বিশ্লেষণ করেন, তেমনি ভেতরে আধ্যাত্মিকতার তত্ত্বটিকে বাহিরে পৌঁছে দিয়েছেন ছপুরা—ব্যাখ্যাত দেহরূপ রসাধার নদী বা খালের মধ্যে কেয়ামত



নৌকা বাওয়ার মধ্য দিয়ে পরম বিন্দুটিতে মিলিত হয়। তাই কেয়ামতের ভোটের প্রতীক আর কিছু হল না, হল নৌকা। চর্যাপদে পদকর্তা ভুসুকু যেমন চণ্ডালীকে ঘরণী করেছিল কেয়ামত করল ছপুরাকে। ছপুরাই এ উপন্যাসের অন্যতম চালিকা শক্তি। দেহবাস থেকে ধীরে ধীরে কেয়ামতকে সে শেষ অবধি তুলে এনেছে সাধনমার্গে, দেহাতীতে। এখানেই মিল পেয়ে যাই গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বিশ্বমঙ্গল' নাটকের চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে—ছপুরা কেয়ামত-এর মানবিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক তত্ত্বের। অদ্ভুত তত্ত্ব, বাস্তব, রাজনীতি, আর দেহবাদের মিথস্ক্রিয়া, ব্যাখ্যা।

সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয় এ উপন্যাসে প্রথম থেকেই একজন কথক পাঠককে এক একটি রূপকথা শোনাচ্ছে। ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে, মাঝে মাঝে বিশেষ বিশেষ বক্তব্যের 'ফুটনোট'। 'পাঠক, কেয়ামতকে এই অস্থিরতার মধ্যে নিক্ষেপ করে, চলো আমরা নূরবুড়ির একটা "সমূস্যে" শুনে নিই' কিংবা, 'পাঠক মনে করো' ইত্যাদি জাতীয় খণ্ড কখনো পূর্ণ পংক্তি বিন্যাসে লেখক এক বিশেষ ধরনের ডায়ালগ, ভাষাছাঁদ রচনা করতে চেয়েছেন। কিন্তু বার বারই মনে হয়েছে লোক, আবার মনে হয়েছে অন্য কেউ। যে যার নিজ নিজ স্বর নিয়ে স্বচ্ছন্দ কথা বলে গেছে। আরো একটি বিষয়, বর্তমান সমাজ বাস্তবতার নানা ঘটনার বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রশাসন, লেখাপড়া, চাকরি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নেতা, তত্ত্ব, তথ্য, সাল তারিখ সহ লেখক কাহিনীর সঙ্গে গেঁথে দিয়েছেন। রাজনীতির যত কথাই বলেছেন সবগুলিই রূপকথা। ইতিহাস বলতে কেয়ামত-ছপুরার বিবরণ। যেমন, 'সে ইতিহাসের কেন্দ্র-ছবিতে দেখা গেছিল, দরগার পশ্চিমপাশের বাগানে ছপুরা নিজের উলঙ্গ স্তনের উপর কেয়ামতকে টেনে নিয়েছিল।' এককথায় টুকরো টুকরো নানা ঘটনা, দৃশ্য পরম্পরায় একটি কোলাজ গড়ে উঠেছে গোটা উপন্যাসটির মধ্যে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যেই যে লেখক সোহারাব নিজস্ব একটি তত্ত্ববিশ্বকে গঠন করতে চান সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়। পোষ্টমডার্ণে এসে মডার্নিজমের সেই একই আধার আর আধেয়কে বাহ্যিকভাবে ভিন্ন মডেলে দেখোনোর কৌশল চলছে, যার নির্দিষ্ট কোনো স্থির বিন্দু নেই, কেবলই বিন্দু বদল। শেষ পর্যন্ত কেয়ামত রূপকথার মতো রাজপুত্র অর্থাৎ দরবেশ হল। রূপকথার মতো সেই রাক্ষস-খোক্ষসদের অর্থাৎ রাজনীতির শত্রুদের নিধন করার ইংগিতও সমর্থন পেয়ে যায়। ফকিরি তত্ত্বের সঙ্গে মার্কসবাদের মিল। কেয়ামতের রাজনৈতিক আদর্শের যুগলবদ্ধ বিশেষ তাৎপর্য পেয়ে যায় এ উপন্যাসে। আসলে, এ উপন্যাসে সোহারাব সেই প্রাচীন রূপকথা বলেননি, বাস্তবকে ধরতে গিয়ে আর একটি রূপকথার সৃষ্টি করেছেন। যা শিল্পের কৃত্রিমতাকে, মিথ্যাকে স্বীকার করেও, অতিক্রম করেও এমনকি উপন্যাসের বীজ বা তত্ত্বে আর একটি ভিন্ন দিগন্ত খুলে দিতে পারে।

পরিশেষে একথা বলতেই হয়, সোহারাব এ উপন্যাসে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রাথমিক স্তরে, যদিও তিনি অনেক বেশি পরিমাণেই পরিণত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু

কাহিনীর জটিল গমককে বিশ্বাসযোগ্যতার পাশাপাশি সাধারণ পাঠকদের কথাও তাকে ভুললে চলবে না। কেননা, অত্যধিক টেকনিক সর্বস্বতা, এক্সপেরিমেন্ট এক ধরনের আড়ষ্টতার জন্ম দেয়। এবং রাজনীতি ও ফকিরি তত্ত্বের সমানুপাতিক বিশ্লেষণ, মেলবন্ধন যতই অনিবার্য শিল্পসম্মত হোক না কেন কাহিনী শেষ অব্দি লেখকের আয়ত্তের বাইরে, বরং লেখক ভিড়ে যান চরিত্রের মধ্যে, হয়ত লেখকের ছক এক্ষেত্রে কমবেশি বদলেছে কোননা কোনো অনুচ্ছেদে। আর সে কারণেই সমগ্র কাহিনী একটি পরিমিতি বোধের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত বিন্দুটিকে স্পর্শ করতে পেরেছে! বাহ্যত এ উপন্যাস সমসাময়িক রাজনীতির জগতে শরক্ষেপণ হলেও, শেষ পর্যন্ত পাকা জহুরির মতো খননকার্যের মধ্য দিয়ে উৎসে বা শিকড়ের সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে সকল চরিত্র, লেখক, এবং সে সঙ্গে আমরাও বেরিয়ে পড়ি সঙ্গী হয়ে।

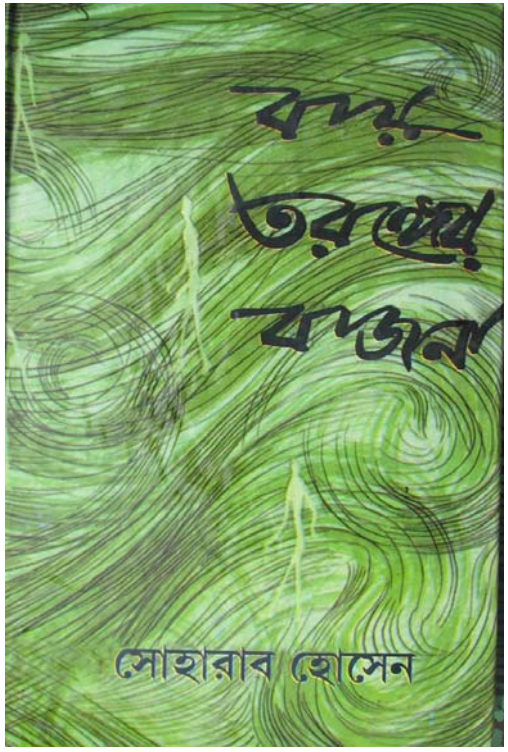


**সা হা না রা খা তু ন**

## বাংলা কবিতায় সোহারাব হোসেন

‘কবিতা একজন কবির দ্বিতীয় জীবন, দ্বিতীয় ভুবন, প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে কবি শৈল্পিক উত্তরণের মাধ্যমে তাঁর দ্বিতীয় ভুবনটি রচনা করেন।’—একথা যিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন তিনি হলেন কবি সোহরাব হোসেন। কবিতা ছিল যাঁর প্যাশন। তাঁর কাছে তাঁর সৃজন ছিল খব কষ্টের, অথচ খুব যত্নের।

১৯৬৬ সালের ২৫শে নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটে কবির জন্ম। তাঁর চেতনায় কাব্যলক্ষ্মী নেচে উঠেছিল সেই নবম শ্রেণী থেকেই। একাদশ শ্রেণী থেকে তিনি পুরোপুরি কবিতাতেই মনোযোগী হন। তিনি স্বীকার করতেন তাঁর নিজের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক মাংস পাগল বালকই তাঁর সমস্ত কবিতা লিখিয়ে নেয়।

কবি সম্পর্কে যে কথা আমরা অমর মিত্রের লেখায় পাই—‘তাঁর জন্ম এক কৃষক পরিবারে, অনেক কষ্ট করে বড় হয় সে। জীবন কেমন তা তার মতো আর কেই-বা দেখেছে? সোহারাব ছিলেন কৃতি ছাত্র, কৃতি অধ্যাপক। তাঁর লেখা শুধু পাঠককে মুগ্ধ করতো না, উৎসাহী পাঠকদের উসকে দিত বারবার। তিনি নিভৃতে নিরূপায় মানুষের কথা লিখে গেছেন। কি লিখবেন জেনেই যেন সোহারাব লেখার জগতে প্রবেশ করেন।’

বাসব দাশগুপ্তের কথায়—‘প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা সোহারাব কখনো বলেনি, কত কষ্ট করে আজ আমি এইখানে এসেছি। জীবনটাই কারো ক্ষেত্রে উপন্যাস হয়ে ওঠে। সোহারাবের জীবন এক আশ্চর্য ম্যাজিক। গ্রামীণ জীবনের খুঁনসুটির সাথে ছায়ায় বাস্তবতা কীভাবে গভীরতর কাব্যে পৌছে যায় তা তার কবিতাগুলোয় পরিলক্ষিত হয়।’

তাঁর কবিতাতে শুধু বাহিরের বর্ণনা নয় ভিতরের সাধ, আহ্লাদ, ইচ্ছা অনিচ্ছা নিয়ে গড়ে উঠতে দেখা যায়। একধারে রাগ অভিমান, প্রতিবাদ, আর্তনাদ, সম্ভোগ, উদাসীনতা সবই ধরা পড়ে।

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের কথায় ‘অসম্ভব প্রতিভা ছিল সোহারাবের, সোহারাব তো রক্তমাংসের মানুষ; বারংবার নিজেয় কাছের মনে করে জায়গা দেওয়া মানুষগুলোকেই চরম প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে শুনিনি। এতটাই সরল ছিল সোহারাব।’

তাঁর এই স্বভাব ও শান্ত মনের প্রকাশ কাব্যে প্রভাবিত হয়েছে সবসময়। একান্ত সৃষ্টিতেই মনোযোগী ছিলেন তিনি। তাঁর ভিতরের যন্ত্রণা উগরে দিয়ে অন্যায় সহানুভূতি আশা করেননি কখনোই।

গুরুদেবের স্মৃতিচারণায় ছাত্র মৃদুল হক বলেন—‘আনন্দমোহন কলেজের বসার রুমে স্যার যেখানে বসতেন প্রতিদিন অগুনতি মানুষ স্যারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা

করতো..... কারও ব্যক্তিগত, কেউ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। বসার রুমটি যেন কনসালন্টেন্সি রুম হয়ে উঠেছিল। স্যারের একটা উপদেশ আমরা আজও ভুলিনি 'কাউকে উপকার করতে না পারলেও যেন ক্ষতি করিস না।'

কবি সোহারাব ছিলেন তখনই মানবদরদী। তাঁর প্রতিটি কবিতায় তাই অতি সাধারণ সংসারের চালচিত্র ফুটে উঠতো।

'বাপী আমায় বারবার একটা কথা বলতো যে বড় মনের মানুষ হতে হবে। এই বড় মনের মানুষ সোহারাব হোসেনকে আমি আমার গোটা জীবনটায় দেখেছি অন্যের সাহায্য করতে। বাপী বলতো তাঁর সব কিছু রাজকীয়। টাকা পয়সা না থাকা রাজকীয় মনটা তো আছে! বাপীকে রেখে এলাম এক অজানা চুপ মহাসাগরে', সোহারাব পুত্র সোহম হোসেন বাবার কথা জানলেন এইভাবে।

সোহারাব সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য ও তাঁর পরিচিত আত্মীয় বন্ধু একান্ত বাড়ির মানুষের কাছে যতটুকু পাওয়া যায় তাতে বারবার মনে হয় কবি সোহারাব ও ব্যক্তি সোহারাব অতি আপন। কার্যজগতে তিনি যতটুকু বিচরণ করেছিলেন সেখানে সর্বসম্মুখে আলাদা করে কোনো ভণিতা ছিল না। আসলে কবি সোহারাব একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির।

কবিতা লেখার মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যচর্চার শুরু। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'রক্তদেহে অন্যস্বর।' পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় 'বৃষ্টির নামতা'। তাঁর বহুকবিতা হারিয়ে গেছে, গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। তাঁর দীর্ঘদিনের কিছু অপ্রকাশিত কবিতা ও উপরোক্ত গ্রন্থগুলি নিয়েই প্রকাশ পায় 'কবিতা সংগ্রহের' প্রথম খণ্ড। তাঁর প্রথম কবিতার এই গ্রন্থে 'নারীকুল-নারীফুল' তিনি লিখেছেন 'মানুষের বন্দনায় থাকে ঈশ্বর কিংবা তেজপাতা!'

'তেজপাতায় আমার নতুন ঈশ্বর,/ আমি ঈশ্বরকে ঈশ্বর মানি না, /নারীকে জপ করি, আমার ঈশ্বরের জিভে তেজপাতায় বীর্য, আহঃ কী মধুর।'

আসলে কবির বন্দনা ঈশ্বরকে ঘিরে নয়; মানুষকে ঘিরে, নারীকে ঘিরে, মাতৃত্বকে ঘিরে।

ঠিক পরের কবিতা 'নারীস্তব তেজপাতায়' কবিতাতে কবিকে সাধারণ নিয়ম কানুনের বাইরে বেরিয়ে যেতে দেখি। কবির চোখে—'ভূমিষ্ঠ সন্তান মাত্রই জারজ, কেননা কোনো মাতাই নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না ঠিক কোন সময় সে গর্ভবতী হয়েছিল। তিনি কতটা স্পষ্টবাদী তা আরো স্পষ্ট হয় কবির এই লাইনগুলো থেকে। জন্মের লগ্নে শঙ্খ কিংবা আজানের হুঁশিয়ার। নগ্ন করে তিমি হই। তিমিমিনি হই—এ সব কথা মিথ্যে কথা। তবে শুদ্ধ বমি করি....।।

কবির বেশ কিছু কবিতায় যেমন 'বক্রতলের অনন্ত ট্রাকে,' পাখির উপমার, 'পাপ পদাবলী চার' ও আঙুর ফল কিংবা প্রার্থনা'।

এগুলোর মধ্যে জীবন সম্পর্কে গভীর অবসাদ আর না পাওয়ার কথা, কোনো কিছু হারিয়ে যায়। জেনেও মৌন থাকা আর স্থির থাকার মানসিকতা দেখতে। পাই। তাইতো



তিনি বলেন—

শেয়াল হতে পারবোনা কোনোদিন,/শুধু নাথ দেখো অদৃশ্য আঙুর খেতে লাফ দেবো কালো বোধকে পুড়িয়ে/ সরায় অনন্ত ছলায়।

তার 'লোকযাম' ও 'পরিবার' কবিতায় কী সৌখিন নারীবন্দনা! কবি নিজেই যেন স্বয়ং নারী! অসম্ভব সহমর্মিতা! যেমন 'লোকযাম' কবিতায়—

'ভারতীয় বধুরা বনবাস চায়নিকো মিলনের শেষতম দিনে', /'তবুও সিঁদুরের আকাল পড়লে বনমহৎসবে ঘটে যায় / সুখের ভাগ বাটোয়ারা'

ঠিক তেমনই 'পরিবার' কবিতায়— 'সাধ ভক্ষণ করে সুন্দরী হয় দশমেঘে কাঙালী বউ', কিংবা

'উঠোনেয় নারীত্ব খুঁজে হয়রান আমি
নমহ প্রাচীন কাল নমহ উঠোন
জয় রাধা বলে আমি সুস্থির হই...উঠোনেয়
ভাঁজে ভাঁজে আমার সকাল।"

'জপ করি মুন্নি' কবিতার কবির যৌবনকথা, যৌবনের উচ্ছ্বাস, আনন্দ, নারীর প্রতি সহজাত আকর্ষণ, প্রেম-ভালবাসা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। —কবি বলেছেন,

"নিতম্বের খোঁজ করে যৌবন, যৌবনের খোঁজে এক নিতম্ব, /মানুষের ঠিকানা বলে যৌবন, যৌবন জপ করে নিতম্ব,/ আসলে নিতম্ব-ইষ্ট-নিয়ে যুবকের জন্ম,...."

—যুবক যুবতীর যৌবনকথাসহ এই লীলা-নিকেতনে এইভাবে একসময় তাদেরও জন্ম হয়েছে। সেই শাশ্বত কথা এখানে ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠেছে। জীবনের উচ্ছ্বাসে অকবিও কবি হয়ে ওঠে ভাবের আবেশে। কবি সোহারাব সেকথা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন—

"সমস্ত কবিদের জন্ম হয় এই যুবক বয়সে,
রাজনীতির আখড়া ছেড়ে শাড়ির ঘেরাটোপে
বনবন ঘুরতে থাকে যুবক-মানুষ,....."
তখন কবি সর্বত্র দেখতে পান প্রেমিকা মুন্নিকে—
'ইড়ার আসনে দেখি মুন্নির শরীর
পিঙ্গলার আসনে দেখি মুন্নির শরীর
তাহাজ্জদের আসনে দেখি মুন্নির শরীর,
জপ করি-এসো তোমার নিতম্বে গোলাপ ফোটাবো আমি।"

—বৌদ্ধ-সহজিয়া তান্ত্রিক সাধকরা বলেন—ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীত্রয়কে একসূত্রে বেঁধে পিঁড়ির মতো আসন করে বসে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে প্রত্যক্ষ কথোপকথনে ঈশ্বরলাভ ও মহাসুখের উপায় জানার কথা, বাসনার বন্ধন ও ইন্দ্রিয় পারিপাট্যের আশা ত্যাগ করে সর্বত্র ঈশ্বরকেই প্রত্যক্ষ করার কথা। কিন্তু কবি সোহারাব ঈশ্বরকে নয়, সর্বত্র

দেখতে পান নারীর যৌবন,—মুন্নির শরীর, এমনকি গভীর রাত্রে তাহাজ্জদের নামাজেও। এখানে কবির ভোগবাদকে ছাড়িয়ে বাস্তব জীবনবাদও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

শুধু শৈশব, যৌবন-কথা নয়, বৃদ্ধত্ব কথা, মৃত্যুকথা, পাপ-প্রেম, প্রভৃতি প্রকাশ করেছেন কবি। কবি স্পষ্ট করে বলেছেন—

"পাপ-প্রেম-পূজা ভালোবাসা-ভালোবাসা খেলা করে।
পাপের জন্য
প্রেমের জন্য
পূজার জন্য
ইবলিশ-আদম গ্রীষ্মের মাটি হই আমি।" ('পাপ-প্রেম-পূজা')।

কবি পাপ-প্রেম-পূজা প্রসঙ্গে ইসলামী পূরাণের কাহিনী—ঈশ্বরের মানুষ সৃষ্টি ও সব সৃষ্টির সেরা রূপে মানুষকে সম্মাননা, সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার আজাভিল ফেরেস্তার ইবলিস শয়তানে পরিণত হওয়া এবং সেই শয়তানের প্ররোচনায় আদম-সন্তান মানবকে পাপে নিমজ্জিত হওয়ার কথা প্রভৃতি ইসলামী পুরাণের মিথ-এর সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।" (বৈষ্ণবকবিতা', 'সোনার তরী।

আমাদের সোহারাব হোসেনও বলেছেন সেরকম কথা—

"পাপ-প্রেম-পূজা খোঁজে নারীর নাভিমূল,
আমি এখন নারীর বুকে হাত রেখে ঈশ্বরলাভের মন্ত্র পড়ি।
নারী ও ঈশ্বর এখন আমার কাছে একাকার
নারীকে ভালোবেসে আমি ঈশ্বরকে পূজা করি,..." ('পাপ-প্রেম-পূজা')

কবি তাই বলেছেন—

"পাপ-প্রেম-পূজা আমার সব পৌরুষ নারীতে সমর্পিত তাই।" নারী-প্রেম পূজাতুল্য, নারী-প্রেমে আছে পাপ ও পূণ্যও। নারী নরক, আবার নারী স্বর্গও। নারী কষ্ট দেয়, আবার আনন্দেও ভরপুর করে তোলে। তাই নারী-প্রেম, নারীর অঙ্গস্পর্শ ইত্যাদির মহত্ব ও মাহাত্ম্যের মধ্যে কবি নিগূঢ় শান্তি ও স্রষ্টার সৃষ্টি অনুপম মাধুর্য উপলব্ধিতে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করেছেন। কবি ধর্মকে অস্বীকার না করেও মানুষকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, সৃষ্টিকে ভালোবেসে স্রষ্টাকে স্মরণ ও স্মৃতিচারণ করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—

"আমার কাছে নারীর জন্মপদ্মজল আর ঈশ্বরের ভালোবাসা একাকার,
তবু
তুমি আমাকে পূজা করার সুযোগ দিলে না!
অথচ স্পর্শ ছাড়া কোনো পাপ-প্রেম-পূজা পূর্ণ হয় না জেনে



পাপের জন্য
প্রেমের জন্য
পূজার জন্য
তোমাকে ছুঁয়ে ফেলাটাই বড়ো ভুল হয়েছে আমার!"

সুতরাং আমরা বলতে পারি কবি ভোগবাদী নন, ভোগবাদকে আশ্রয় করে প্রবল জীবনবাদ ও জীবনাকূতির অনুপম প্রকাশ ঘটিয়েছেন। মানবসৃষ্টির রহস্য ও সৃষ্টির আনন্দ অকপটে প্রকাশ করেছেন।

কবি সোহারাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন—

"যুবতী নারীর দুধ-পুকুরে সাঁতার কেটে আসে শৈশব,"
('দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস : শৈশব কথা') ('সমান্তরালে সরলরেখা')

এই সময় মায়ের মায়ালতায়, স্নেহলতায়, আহ্লাদলতায়, চুমুলতায় শিশু ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। তারপর শিশু কিশোর হয়ে ওঠে। কৈশোরে মায়ের 'দুধপুকুর' শুকিয়ে যায়—

"দুধ পুকুর শুকিয়ে যায় মাতার, মাতা হাসে,
..... ..... ..... .....
দুধ ছেড়ে মানুষ, মানুষের শিশু বড়ো হয়।" ("তৃতীয় উচ্ছ্বাস : কৈশোর কথা" ('প্রকৃতি স্তব))

"চতুর্থ উচ্ছ্বাস : তারুণ্য কথা" 'দেহস্তব' কবিতায় কবি বলেছেন "এই দেহ রক্ত-শরীর, কামের পাথার।" তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

"দেহতত্ত্ব লই আমি দেহ-বিশারদ, হিসাব কষি।
মানুষের দেহে খুঁজি মানুষ-গন্ধে ওম।...."' ('দেহস্তব')

—তারুণ্য খোঁজে দেহ, আস্বাদন করতে চায় দেহের অনুপম মাধুর্য, উপলব্ধি করতে চায় দেহের ওম (তাপ)। তাই তারুণ্যে—

"যেন শাড়ির ঘেরাটোপে মেলে পদ্ম-ফুল-দেহ,
তাই
খোলা হয় প্রাচীন গ্রন্থ,
বৈষ্ণব পদাবলি কিংবা কামশাস্ত্র খুলে যায় একে একে,
শিক্ষিত হয় তরুণ মানুষ, মানুষের বাচ্চা,
শুরু করে দেহস্তব, রক্তমন্ত্র, বীজমন্ত্র, প্রকৃতিমন্ত্র।
.... .... ..... .... .....
প্রকৃতি চিনতে চিনতে চিনে ফেলে দেহ, নারীর দেহ,
কিশোর-ঝিনুক খুলে ফেলে দু-পাল্লা,
পাল্লার ভিতর মুক্ত, মুক্তা নয় নারীর বীর্য, বীর্য নয় প্রকৃতি।

নারী আর প্রকৃতি বিলীন হয়ে যায় রক্তদেহে অন্যস্বরে।"

—স্পষ্ট বোঝা যায় কবি তারুণ্যের প্রখর দেহপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেমকে একাকার করে দেখাতে চেয়েছেন। এখানে দেহপ্রীতির সঙ্গে প্রকৃতিপ্রীতি তারুণের উচ্ছ্বাসে মধুময় হয়ে উঠেছে। তবে কবি শেষ পর্যন্ত দেহস্তব বলতে গোটা মানুষ তথা পূর্ণাঙ্গ মানুষের কথা বলতে চেয়েছেন-

"তবু কচি নিতম্ব চাই না আমি তরুণ-মানুষ
ভরাট নারীত্বে চাই নিতম্ব-লেহন,
ঠিকানা—গাছের কাছে নত করি মাথা—মানুষের অবয়ব খুঁজি"। ("দেহস্তব')

—কবি সোহারাব নারী দেহ নয়, নারীত্বকে, দেহের এক একটা অংশ নয়, পূর্ণাঙ্গ মানুষকেই পেতে চেয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় দেহ-প্রসঙ্গ থাকলেও তিনি দেহাত্মবাদী বা ভোগবাদী কবি নন, তিনি আসলে মানবতাবাদী কবি, বাস্তববাদী কবি, জীবনবাদী কবি। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক হলেও যেটুকু সময় কবিতা লিখেছেন তাতে কবি হিসেবে বাংলা কাব্যজগতে তিনি একটা বিশিষ্ট আসন পাবেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

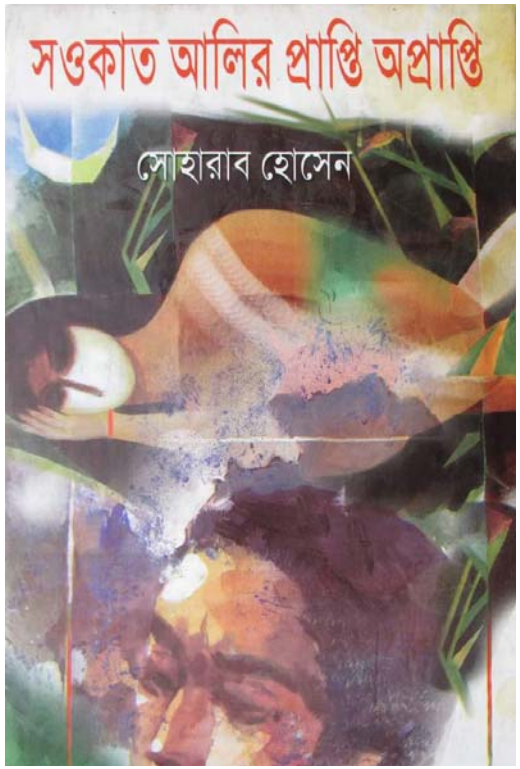


রু মা পা র ভী না রা

## সোহারাবের কবিতায় ভাষা-শিল্প

তর্কের বাঙালী, তেলা মাথার তেল দেওয়া বাঙালী, ভালো-মন্দের পার্থক্যের রুচিবোধহীন বাঙালী সোনা আর পিতলের চক্‌চকানীতে বোঝেনা কোন্‌টা সোনা আর কোন্‌টা পিতল। কারণ বাঙালী যোগ্যতার সঙ্গে আপস করে চলে। বাঙালীর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এমন ধারার বিপরীত ঘটেনি। কোন্‌টা পাকাফল আর কোন্‌টা কাঁচাফল'—সে বোধ জন্মেও না যে বাঙালীর। অথচ তাদের আবার সাহিত্য ইতিহাস, সাহিত্যই সমাজ। সে সাহিত্য ইতিহাসকে বিধৃত করে, সে সাহিত্য সমাজের কঙ্কাল ছাপ চেহারার কঙ্কালটাকে উজাড় করে দেখিয়ে দেয় যে সাহিত্য তার মনোরম চপল বিলাসিতাকে ছাপয়ে সমকালীন প্রজন্মকে অনাগত ভবিষ্যতের ভয়াবহতার সাবধানী শুনিয়ে দেয়, সেই সাহিত্যের কদর কোথায়? আর সেই সাহিত্যিকদেরও একই দুর্দশা। অবশ্য বাঙালি পাঠকের রুচির নিম্নগামীতার ক্ষতি বৃদ্ধিতে হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়, ভ্রূকুঁচকিয়ে ওঠে। সে কারণেই প্রফুল্ল যায়, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোহারাব হোসেনদের সঙ্গে তিলোত্তমা, সুচিত্রাদের পার্থক্য নিরূপণ করা অসাধ্য ঠেকছে। মান বিচারেরও যোগ্যতা হারিয়েছে বাঙালি। আর এটাই যদি বাংলা সাহিত্যের মাপকাঠি হয়ে থাকে। তাহলে বুক ফুলিয়ে বলা যায় বঙ্কিম রবীন্দ্র-তারাশঙ্কর, মাণিকের সাধের সাহিত্যের অকাল প্রয়াণ হতে চলেছে। যোগ্যতার সঙ্গে আপস করার এটাই মনে হয় চরম ফল।

যাই হোক বাংলা সাহিত্যের ভাষা শিল্পের ধারক হিসাবে সোহারাব হোসেন একজন যুগান্তরকারী মাইলফলক। তাঁর লেখনীর ধারা আঞ্চলিকতার প্রবাহ-নিবীড় কাহিনীর উপস্থাপনী, ভাব-ভাষা, চরিত্রায়ণ এবং আঞ্চলিক ভেদে চরিত্রের মনস্তত্ত্ব—প্রসবের নিরিখে তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরী এবং সতীনাথ ভাদুড়ি কিম্বা অদ্বৈত মল্লবর্মনের সমকক্ষ। শিল্পের জন্য যেমন শিল্প গড়ে ওঠে, তাঁর লেখনীও তেমনি গড়ে উঠেছে মানুষের নিরস শরীরকে রসালীন করার জন্য। তাঁর বক্তব্য সহজ-সরল, বাক্-বিন্যাস সর্পিল, তেমনি চরিত্রের রেখায়নও যেন জ্যালজ্যান্ত রূপকাঠি, প্লট যেন শুধু আখ্যান মঞ্জুরী নয়, থিয়েটারে মঞ্চস্থ হওয়া কল্পলোক, কল্পচিত্র হয়ে পাঠকালীন ধরা পড়ে তাঁর ভাষা শিল্পে—এদিক দিয়ে তিনি পড়ন্ত সাহিত্যের এক উড্ডীয়মান চাবিকাঠি। মুমূর্ষ সাহিত্যের শিরে জীয়ন কাঁঠি ছুঁইয়ে বেঁচে থাকার রসদ ও পদ দুই-ই যুগিয়েছেন সোহারাব হোসেন।

শিল্পকে ভাঙা এবং নতুন করে তার রূপদান করা সোহারাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেই বৈশিষ্ট্যের গুণগুলো সমাহিত তাঁর প্রত্যেকটি লেখনীতে । রূপকথা, অরূপকথা, লোককথা, জীবনকথা সবই রূপায়ণে তাঁর মুন্সিয়ানার দখল প্রশ্নের অতীত। সোহারাব হোসেনের জীবন বিশ্লেষিত করার ফলস্বরূপ যেন চুঁইয়ে পড়েছে তাঁর জীবন রূপ ভাষার সৌকুমার্য।



D/Saharab Hossan Sahitya Angn February 20119/16

সোহারাবের ব্যক্তিত্ব শুধুই তাঁর ভাষা, তাঁর রক্ত, মাংস সবই যেন ভাষার ক্রম পর্যায়ে কংক্রীটের ঢালাই স্বরূপ গড়ে ওঠা দেহ। লেখককুলের বক্তব্যে—'ভাষার আমি, ভাষার তুমি' কথাটা যেন লেখক-কবি সোহারাব হোসেনেরই অন্তরস্থ জমীন। লেখা আর তাঁর মনন দুই-ই যেন একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ভাষার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করার পূর্বে সোহারাব হোসেনের একটি স্বীকারোক্তি উপস্থাপন করা হল—"যে বিষয়, যে চরিত্র, আমার আখ্যানাংশে থাকে তারা ভাষার মিউজিকে নাচতে নাচতেই হয়ে ওঠে। সব মিলিয়েই ভাষা-পরিবারে আমি সম্পৃক্ত করিয়ে দিতে চেষ্টা করি একটা ঘোর তথা মায়াকে। ভাষার এই মায়া তথা ঘোর আবার আমার শিল্প সৃষ্টির ঘোরের সঙ্গে অন্বিত।"(১)

অর্থাৎ, মনের আবেগেই চলমান, বহমান স্রোতস্বীনীতেই নির্মিত তাঁর গল্প- কবিতা-উপন্যাসের সাগর-মহাসাগর। তাঁর ভাষা শুধুমাত্র কথাসাহিত্যের বিষয়ের গহন খণিমাত্র নয়—উপস্থাপনযোগ্য জীবনের রূপ এবং রূপান্তিত বক্তব্যের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িত। তাঁর ভাষা যদি শিল্প দৃষ্টির ঘোরের সঙ্গে মিলিত হয় তাহলে তো 'নাচাইতেই বৃষ্টির' সমতুল।

সোহারাবের ভাষার ভুবন যেন অলীক কল্পনার রূপসারী। তাঁর ভাষা জগতে প্রবেশের সাথে সাথে মন সিঞ্চিত হয় সু-মলিন ভোরের শিশিরের ভেজার স্বরূপ। তাঁর ভাষার ভুবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি গজ, প্রতিটি মোড়ে যেন কাব্যিক ব্যঞ্জনার সুমধুর ঝনঝনানী। প্রতিটি শিল্পীর যেমন প্রথম কাব্যিক জীবন শুরু হয় কবিতা দিয়ে, তেমনি সোহারাবের কাব্যিক 'জীবন-ছাঁদে' ওঠার সিঁড়ি তৈরী হয়েছিল কবিতা দিয়ে। কিন্তু তাঁর অভিঘাতের কবিতা এক অন্য জগতের সুর লহমায় ধ্বনিত হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাঁর কবিতার দেহমলিন, বাস্তবিক, দুর্বিসহ জীবনের এক সমব্যার্থি, আবার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের প্রতীকীকাঞ্চন। যেমন তাঁর 'মৃত্যু হে' কবিতায় তিনি নারীর সমব্যথী হয়ে অভিমানী কণ্ঠে বলেছেন—

" ও কন্যে জবাব দে
হাত-দু-খানি পা-দু-খানি হাড় মাংসে সবই দে,
কথায় কথায় হৃদয় দে, সুখের নামে শফৎ নে,
মরণ দিবি দেহ দিবি, এই দেহটা ভিক্ষে নিবি।"(২)

অর্থাৎ, সমাজে নারীর পৃথিবী হল কলঙ্কহীন নিষ্কলঙ্কের বেড়াজাল। সমাজ হল নারীর বেঁচে থাকার ভূমি—যে ভূমিতে নেই নারীর আশা-বাসনার স্থান, সব সময় শুধু আছে নারীর দেওয়ার পালা—মনভরে হাড় মাংসকে বাজী রেখে শুধু দেওয়া আর দেওয়া। নিজের ক্ষত বিক্ষত হৃদয়কে এক রূপক আশ্রিত অক্ষত হৃদয় দেওয়া, মুখ দেওয়া, কিন্তু নারীর আর সমাজ থেকে নেওয়া-চাওয়ার কোন স্থানই নেই। নারীর এই অসহ্য লাঞ্ছনা কবি সহ্য না করতে পেরে নারীর প্রতি প্রতিবাদী কণ্ঠে, অভিমানাহিত হয়ে নারীর কাছে শুধু মরণ



চেয়ে নিয়েছেন। এখানে তার সমব্যথী হৃদয়ের তুলনা অসীম অন্যন্য

আবার কোনো এক কবিতায় দেখা গেছে তিনি বাস্তবকে তুলে ধরে নারীর সঙ্গে সঙ্গ দিয়ে এক বাস্তব লহমাকে আঘাত করতে চেষ্টা করেছেন—

দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম।
লোকগুলো মশাল হল লাল-সাদা-পোলাপি।
এবারে ভাবছি আমিও আমার বউ মশাল হবো।"(৩)

অর্থাৎ, নারীর অসহ্য যন্ত্রণা দেয়তো সমাজই। আর তাই এই সমাজের মুখাপেক্ষি হয়ে সোহরাব প্রতিবাদী লহমায় শেষপর্যন্ত নিজের বউকে সঙ্গে নিয়েই মশাল জ্বালিয়ে পৃথিবীর ক্ষত-বিক্ষত মানসিকতাটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

গল্পে-উপন্যাসে-উপন্যাস যেমন সহস্রাধিক প্রিয়া ভাবনা বিচিত্র। তেমনি তাঁর কবিতাতেও কোনকিছু কম যায়নি। আমরা তাঁর লেখার প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের মতো বৈচিত্র আভাস পাই। তাঁর প্রতিটি উপমার লহমা যেন কাব্যিক ছন্দের ধারায় বহমান। এদিক থেকে তাই তাঁর উপমাগুলিকে তিনটিভাবে দেখা যায়। যেমন—

**(ক) অণু উপমা :** আখ্যান-উপখ্যানের ভ্রাম্যমান পথে এগুলি অলাদাভাবে দৃশ্যমান কিছু নয়। কিন্তু এই আখ্যানের পথের ধূলায় ঝিকমিকিয়ে ওঠা বালুকার মতো অণু উপমা। পথে ঘাটে মৃদু গন্ধ পুষ্পের মতো, বৃহৎ মেলায় সমাগত নারী-পুরুষ-শিশুর আবরণ-অভারণের কথকথায় ধরা পড়া রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ স্পর্শের আবহে প্রবাহমান স্বাভাবিক এগুলির ব্যবহার তাঁর কবিতার দেখা যায় অধিকতম মাত্রায় যেমন—

(i) ঝিনুকের সংসারের কথা মনে হয়/ পৃথিবীর জারজ সন্তান যীশুর কথা মনে হয়। (নারীস্তব তেজপাতায়-১)

(ii) আঁধারের মহিমা বুঝি আমি/ কেননা আমার কাছে ঈশ্বর মানে নারী, নারী মানে তেজপাতা। (নারীস্তব তেজপাতায়-১)

(iii) হ্যারিকেনের ভেতর ঢুকি/টেবিলের নীচে ঢুকি / নারীর ওম ঘরে ঢুকি / পেয়ে মানুষের ঠিকা না। (নারীস্তব তেজপাতায়—২)

(iv) 'ওরে মানুষ উলঙ্গ হ', বমি কর, পোশাক পর ফের।' (নারীস্তব তেজপাতায়—২)

(v) 'মানুষের শৈশব, বড়ো বেশি বাতুলতা/বাতুলতা নয় লতা, মায়ালতা স্নেহলতা আদরলতা/আহ্লাদ লতা, চুমুলতা।' (দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস ঃ শৈশব কথা, 'সমান্তরাল সরল রেখা')

(vi) 'কেননা জ্বরা-শৈশব এখন কিশোর।' (তৃতীয় উচ্ছ্বাস ঃ কৈশোর কথা; প্রকৃতি স্তব)

(vii) 'এই দেহ রক্ত—শরীর, কামের পাথার, প্রবৃত্তি পর্দা।' —(চতুর্থ উচ্ছ্বাস : তারুণ্য কথা, দেহস্তব)

(ix) 'শোকগুলো রকমারি।'—(মশাল)

(x) অলীক বাণী হয় : ঘিলু আর লোম।'— (নৈঃশব্দ বৃষ্টি হবে)

এছাড়াও ক্রিয়াবাচক কিছু ভাব-ভাষা-ছবি পাওয়া যায়।

যেমন—

(i) 'তার সূর্য লতিয়ে আসত ভোর বৃক্ষের শরীর ছুয়ে।' (আমার নৌকার মোহ)

(ii) 'কে আছ আঁচল বিছাও, জলের পুরুষেরা বাসস্থান চাইছে, পাথর-প্রদেশ থেকে জল-প্রবাহে ভেসে আসছে শ্রাবণ সন্ধ্যা, সিক্ত বস্ত্রে কেকারত ময়ূরেরা আবহ রচনা করে, গাভীন হবে বলে আজকের বনবৃক্ষ ভোজন বন্ধ করে, বিদ্যুৎ সতর্ক হয়, কায়ব্যূহ ভেদ করে টিয়াপাখি, প্রবল বর্ষা আসুক। —(বর্ষার গান)

(iii) 'রসভান্তে গজিয়ে গজিয়ে স্নেহের তরুলতা ঘাট পালঙ্ক খোঁজে,
রাধিকার, স্বপ্ন আজ সফল হবে বলে পরকীয়া রমীর অকারণ পুলক।' —(উঠোন).

(iv) 'বক্ষ বাস থেকে ফোঁটা-ফোঁটা সুখ বধূ ফেলে দেয় তমালের পাতার কুটুরিতে।'—(লোকবাস)

(v) 'মেঘের দিনেতে তবু ক্লান্ত মানুষেরা পা ডোবায় আঙ্গুরের রসে,
পাথরের বালিশে সে কী নিবিড় ঘুমে আত্মমগ্ন অহঙ্কারী নারী,
পাথরের গুহা আজ ধানখেত সেজেছে মিথিলের অন্তিমে,
মোহভঙ্গ হলে শেষে ভূমির সেবকেরা পাতার পোকাশ পরে,
গুহাবাসে কী সুখতা শুধু বৃক্ষ-বিলাসী ভাতীয় রমণীরা জানে।' (গুহাবাস)

**(খ) নাটকীয়তাযুক্ত উপমা ঃ**

কবি সোহারাব হোসেনের লেখনীতে বহমান হয়ে আছে বিভিন্ন নাটকীয় উপমা। এধরনের নাটকীয় উপমাগুলি তুলে ধরা হল তাঁর বিভিন্ন কবিতা থেকে। যেমন—

(i) 'তোমাকে ছুঁয়ে ফেলাটাই ভুল হয়েছে আমার
আটপৌরে বেশ্যার মতো যদি তাড়িয়ে দিতে....।
আমি এখন ঈশ্বর ও নারীতে অর্থাৎ দেখি না,
মন্দিরের সিঁড়ি থেকে ফিরিয়ে আনি সমর্পণের থালা।'—(পাপ-প্রেম-পূজা)

(ii) আমার কাছে নারীর জন্ম পদ্মজল আর ঈশ্বরের ভালোবাসা একাকার,
তবু তুমি আমাকে পূজা করার সুযোগ দিলেনা,
অথচ স্পর্শ ছাড়া কোনো পাত-প্রেম-পূজা পূর্ণ হয় না জেনে
পাপের জন্য
প্রেমের জন্য
পূজার জন্য
তোমাকে ছুঁয়ে ফেলাটাই বড়ো ভুল হয়েছে আমার!" —(পাপ-প্রেম-পূজা)।

(iii) দীর্ঘযৌবনে খোঁজ নেওয়া হয়নি মানুষের। স্বার্থপরের মতো শুধু ভালোবেসেছি নিজেকে, নিজেকে নয় নারীকে, নারীকে নয় আমার পাগলামিকে। এভাবেই কেটে গেল বেলপাতার শুদ্ধতা, হয়ে গেলাম বিকেলের গাঢ় রোদ। বার্ষিক গতি পেরিয়ে গেল, আহ্নিক



গতি পেরিয়ে গেল। মুদ্রাদোষে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়ির ভিতর জেগে উঠলাম। হাঁড়ি গলে গেল—এত পাপ! এত পাপ রাখব কোথায়? তাই খুঁজি মাটি পাথর, প্রত্নতত্ত্বে সমকাম। বৃদ্ধতে সান্ত্বনা খুঁজি।

ঠিকানা-গাছের কাছে সকৃতজ্ঞ মাথা নোয়াই। অনুভূতির গভীরে পেয়ে যাই, হাতের কাছে পেয়ে যাই বৃদ্ধার শরীর এক। আমার সমস্ত পাপ সে সঙ্গম সুখের মতো ওম দিয়ে রাখে। প্রণাম করি এই বৃদ্ধত্ব, প্রত্নতত্ত্বে সমকামে।'—(প্রত্নতত্ত্বে সমকাম)

(iv) যীশুর জন্মকালে কি প্রয়োজন ছিল দশজন মাঝি মাল্লার? যে নৌকা চড়ে আমি বাচ্চা পথের সুদীর্ঘ নদী পার হয়েছি, যে নৌকার গায় হাজার সভ্যতার নকশাকাটা, তাতে করে যীশুও কি হয়েছিল পার? দশজন মাঝি-মাল্লা কি করেছিল কোনো ত্যাগ? (নারীস্তব তেজপাতায়)

(v) মিনিট সেকেণ্ড কিংবা মধ্যরাত্তির সব আঁধার, আমারও জন্মঘর ছিল আঁধার। দশমাস দশ দিন অনন্ত জাফ্রি-কাঁটা আঁধারে কেটেছে আমার। অন্ধকারে জন্মে যে শিশু সে কি জারজ নয়? —(নারীস্তব তেজপাতায়)

বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এই নাটকীয়যুক্ত উপমা কাহিনীর বিভিন্ন মোড় কাব্য ও নাটকীয় ব্যঞ্জনার গর্ভে গর্ভিত হয়ে মিলিত কোরাস নির্মাণ করেছে।

**(গ) বিষয়বস্তুগত উপমা ঃ**

বিষয়বস্তু সম্বলিত উপমা কবিতার বিষয়বস্তুর গভীরে শিকড়ের ন্যায় প্রবেশ করে কবিতাকে এক বিশাল মহীরূহতার মাতৃক্রোড় তৈরী করে। এই বিষয়বস্তুর সম্বলিত উপমাগুলি তাঁর একটি কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হল—

যুবতী নারীর দুধ-পুকুরে সাঁতার কেটে আসে শৈশব,
মানুষের শৈশব, বড়ো বেশি বাতুলতা,
বাতুলতা নয় লতা, মায়া লতা
স্নেহলতা
আদর লতা
আহ্লাদলতা, চুমুলতা।
লতায় লতায় চলে শৈশব
আমার শৈশব-তোমার-মানুষের।
দুধ পুকুরে মুখ রাখি, পুকুর শুকিয়ে যায়?
যুবতী মাতা শিউরে ওঠে!
পুরুষের শৈশব আমার, মাতা কি লজ্জা পায়?
ওগো মাতা আদর-লতা, বলো-মানুষ?
(সমান্তরাল সরলরেখা)

—এখানে কবি এমনভাবে বিষয়বস্তুর উপমা টেনেছেন যে, এখানে কবির ভাষার

উপর নির্ভর করে আমরাও যেন বলতে বাধ্য হচ্ছি 'যুবতী নারীর দুধ-পুকুরে' অর্থাৎ, যুবতী মা দশমাস দশদিন অতীব কষ্ট সহ্য করে যখন আমাদেরকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করেন, তখন তো কেবল খাদ্য হিসাবে মায়ের 'দুধ পুকুর' ছাড়া কিছুই থাকে না। ধাত্রী জননীর প্রসবে আমরা যেমন ভূমিষ্ঠ হই পৃথিবীতে তেমনি আমাদের শৈশব কাটে মায়ের কোলে অবস্থানরত 'দুধ-পুকুর'-এ সাঁতার কেটে, দুধ-পুকুরে' মুখ রেখে মায়ের রক্ত শুষে আমাদের শৈশব কাটে। যুবতী মাতা শিউরে উঠলেও আদতে তো সে মাই-ই, তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে নারী-পুরুষের বিস্তার। এখানে নেই কোনো যৌনতার লজ্জা, আছে কেবল যৌন-সঙ্গম। এই নারী-পুরুষের বিস্তার কোনো কাল-পাত্র-সময় বিচার করে না বা নির্দিষ্ট পিতার ঠিকানা না থাকলেও সন্তান জন্মদাত্রী মা, স্নেহময়ী, লাল-পালনকারী মা যে মাই-ই।

এই তিন ধরনের উপমা বা রীতির আবহ কবিতার নাম মাত্রাকে পূর্ণ নামে সিঞ্চিত করে রাখে। কবিতাকে তো তাই **'Best words in the best Order'** বলা হয়। যার মধ্য দিয়ে থেকে বিচ্ছুরিত হবে রসের আলৌকিক আলো। এই কবিতা কবি সোহারাব হোসেনের গল্প, উপন্যাসকে ছাড়িয়ে কবিতার শাখা-প্রশাখার ফাঁক দিয়ে এক অজানা, অনাম্নী পাখির মতো উঁকি মারে কাব্য সাহিত্যে । কোনো কোনো রচনার শেষে এই 'কবিতা'র শব্দ ও মায়ার ডানায় ভর দিয়ে নিজ শক্তি ধরে পুরো আখ্যানটাই উড়ান দেয় দূর-দিগন্ত-সমুদ্র পারে।

(ঘ) কবি সোহারাবেরর কবিতায় কোথাও কোথাও যেন নীরব মিউজিকের সরব বন্দনা প্রবাহিত হয়েছে। যেমন—'নারীফুল-নারীফুল' কবিতায়—

এভাবেই মানুষের বন্দনা শুরু :
মাতৃতলপেট, বাবার জিহ্বা, প্রাচীন সভ্যতা,
মানুষ-পাড়ার চেতনা,
শুরু হয় বিছানা বদল, পোশাক দিনক্ষণ এবং কাল,
কাল বন্দনা করি অকালে বসে, আকালের কোলে দোলে
মহাকাল-শিশু,
মহাকাল চাইনা নারীফুল চাই।'

আবার 'বর্ষার-গান' কবিতায়—
নির্জনে নিরীহ আত্ম হনন,
আজকের নাভিময় বর্ষার গান
জলের মতোই হে প্রণম্য,
ভাঙনের দিনে গর্ববতী হোয়ো।'

(ঙ) কবির কবিতায় আর এক অন্য রসদের সন্ধান আমাদের আধুনিকতার দিনে



প্রাচীন রাজত্বের নির্মাণ সৌধ হিসাবে চিত্রকল্পের ছাঁপও যেন শিকড় নাড়া দেয় পাঠক কুলকে এক চিত্র কারুকার্যের দিকে। যেমন—

'দৌপদীর বস্ত্রে লুকিয়ে রাখত চাঁদ,
অজন্তার মেহেদি চিত্রকল্প পুষি বিড়াল
ছিল বাবার ভুগোলে।
এভাবেই ঈশ্বরের পৃথিবীতে পাপ এসেছিল।
তোমরাই লিখে রেখেছো এই প্রাচীন পুঁথি।'
('আমার নৌকার মোহ' সোহারাব হোসেন কবিতা সংগ্রহ')

(চ) সোহারাব হোসেনের ভাষা পর্বের বিচ্ছিন্ন আলোকে এক আপেক্ষিক নাগরিকত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে, যা তাঁর কাব্যিক কলাকৌশলের ঢঙকে এক স্মার্ট, সাবলিল, সামগ্রিক রসাবেদন সৃষ্টি করে, যেমন তাঁর 'আইবুড়ো বৃদ্ধার চুলের মতো' কবিতায় কবি যেন আইবুড়ো নারীকে সম্মোধন করে বলছেন—

" সাগর-ঝিনুকে লুকানো রয়েছে আমার পুরুষ গন্ধ,
তুমি ধীর পায়ে এসো,
এখানে কপালে দেওয়ার মতো আগুন নেই।
এই রয়েছে আবর্জনাময় ঘর,
আইবুড়ো বৃদ্ধার চুলোর মতো নগর,
হাওয়াই চপ্পল, চিঁড়েমুড়ি আর কিছু থালা-বাসন।
তাড়াতাড়ি এসো
আমাদের সন্তান আমার আগে ঝিনুকের পাল্লাখুলি,
সাগর-ঝিনুকে লুকানো রয়েছে আমার পুরুষ-গন্ধ
অনিঃশেষ হয়ে।"

(ছ) লোকউপাদানের বিচিত্র কোলাজও তাঁর কবিতাকে কেলাসিত করে এক অন্যমাত্রায় রূপদান করেছে, যেমন—

(১) **কথকের মেজাজ ঃ**

(a) 'এই আমার প্রসারিত ডানবাহু বীজবাষ্পে ধুয়ে দাও,
এই আমার বামবাহু আধপোড়া রুটি দাও।"—(হাত)

(b) "মা আমাকে আশীর্বাদ করে শৈশবের,
বুক পকেটে গুঁজে দেয় ওম লাগা তারা।" ((মানচিত্রের রঙ)

(২) **পাঁচালি-ছড়া ঃ**

(a) পাঁচালি ঃ—

(i) "মহারাজের সঙ্গে আমার যুদ্ধ বাধবে
আমি রাজকন্যের মন জয় করে ফেলেছি

এবার রাজ্য জয় করব সিংহাসন উলটিয়ে।" [যুদ্ধ বাধবে]

(ii) এবং তেজপাতায় শুরু হয় সৃষ্টিপর্ব,
এই হিসেবে ইভের ঊরু দখলে আদমকে হারিয়ে দিই আমি,
ঈশ্বরের জিহ্বা চুষি আমি,
বন্দনা করি বাবার জিহ্বা, মাতৃ-তলপেট। [ নারীকুল-নারীকুল]

(b) **ছড়া ঃ**

'নির্জনে নিরীহ আত্মহনন,
আজকের নাভিময় বর্ষার গান,
জলের মতোই হে প্রণম্য,
ভাঙনের দিনে গর্ভবতী হোয়ো।' [বর্ষার গান]

সর্বোপরি আলোচনার নিরিখে বোঝা যায়, সেভাবেই হোক, যত বাধা-বিঘ্নর মাঝে থেকেও সোহারাব নিজ ভাষাকে ভোলেননি। তাঁর নিজ ভাষার প্রতি সংরাগ দীপ্তির প্রখরতা যথেষ্ট পরিমাণ আভাষিত। তিনি কোথাও কোথাও কখনও কখনও নিজের ভাষার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন, তীব্র বিরূপতা করেছেন, কখনও কখনও ধীক্কারজনিত ঘৃণাকেও রূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। যেমন—'প্রকৃতিস্তব' কবিতায় কোথাও একজায়গায় দেখা গেছে—

"চামুণ্ডা-কিশোর জন্ম দেয় মানুষের সভ্যতা' সভ্যতার নাচে পালক, নাচে শুভ্র বস্ত্র খণ্ড। কিশোর বস্ত্রের খেলা করে তিন অক্ষরের মানুষ? সে কিশোর ভাত পায়না। বিড়ি ধরে, গাঁজা ধরে, যেতে শেখে এদিক ওদিক। রতি পাড়ার মেয়েরা আদর করে ডাকে, বাসস্ট্যান্ডের বাবুরা আদর করে ডাকে, কলেজের দিদিরা আদর করে ডাকে। কৈশোর হারিয়ে যায় মহৎ হতে হতে।

আসলে কৈশোরের মগজে পুঁজ জমে, ইড়ার আসরে পুঁজ জমে, পিঙ্গলার আসরে পুঁজ জমে, তাহাজ্জদের আসরে পুঁজ জমে। পুঁজে পুঁজে শুদ্ধ হয় আত্ম, শুদ্ধ হয় বন্ধু, পর শুদ্ধ হয়। পর হয় আপন, আপন হয় আত্মা। পায়ের তলায় ঘাম হয়, ঘাম জলে স্নান করে আত্মা। আত্মার আত্মা কিশোর আত্মা একবার নিতাই-গৌর বলে নেচে উঠলি না?....

ভাষার মধ্যেকার অভিমান, অভিমানিক কণ্ঠভরা তীব্র প্রতিবাদ, সু-মধুর ছন্দের সৌকুমার্য, ছড়ার প্রাচুর্যতা, উপমার মাধুর্য লালিত রস-নিবিড় ভাষা সময়ের ব্যঞ্জনায় এমনভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যা সাহিত্যকুলের সাহিত্যিক, পাঠকমনকে শাণিত করেছে। তাঁর ভাষা বৈচিত্যের আভাষ শেষ হওয়ার নয় কখনঢণ, এটা যেন 'দুগ্ধ-অমৃতসাগর' যতই পড়া হয়, তবুও যেন পড়ার সাধ মেটেনা, মিটবেনা কখনও।

সুতরাং, বলাই বাহুল্য যে কবি সোহারাব হোসেনের দীপ্ত করুণ, মাতৃস্তন্যে লালিত বাংলা ভাষার আন্তরিকতার ছোঁয়ায় ছুঁয়ে গেছে পাঠকমনকে। এই ছদ্মবেশধারিনী ভাষা বাংলা সাহিতে জুড়ি মেলা ভার, এই ভাষা ভঙ্গিমা তাই বিচিত্ররূপী, ব্যতিক্রমী এক নতুন সংযোজন।

**ম হঃ কু তু বু দ্দি ন মো ল্লা**

## ছোটদের ভুবনে সোহারাবের গল্প

"রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।"[১]

—অতীত ইতিহাসে যারা অত্যাচারী-অনাচারী-শাসক-পীড়ক, নররক্তপিপাসু -নরখাদক-মানবিকতাহীন হিংস্র মানুষ—তারাই শিশুপাঠ্য কাহিনীতে রাক্ষস- খোক্ষস, ভুত-প্রেত ইত্যাদি ভয়াল-ভয়ঙ্কর চরিত্র হিসেবে অবতীর্ণ হয়ে শিশুদের মনের মধ্যে একই সঙ্গে ভয় ও বিস্ময় উদ্রেক করে। শিশু সাহিত্যিকরা কখনোই রাক্ষস-খোক্ষস বা ভূত-প্রেত দেখেননি; কিন্তু তাঁরা দেখেছেন অত্যাচারী- অনাচারী-শাসক- প্রবঞ্চক- নরখাদকতুল্য রক্তচক্ষু বিশিষ্ট মানুষকে। তাই তাঁরা রাক্ষস-খোক্ষস, ভূত-প্রেত প্রভৃতি ভয়াল-ভয়ঙ্কর চরিত্রের মাধ্যমে সেই অত্যাচারী, শাসক, খুনী, হত্যাকারী, নিপীড়ক-নির্দয়চিত্তের মানুষের চিত্র তুলে ধরেন। কিংবা রাজকন্যা-রাজপুত্র চরিত্রায়নে সমাজের অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভশক্তির প্রতিষ্ঠার দিকটি তুলে ধরেন। এর ফলে শিশুমনে একই সঙ্গে ভয়, কৌতূহল ও আনন্দ জেগে ওঠে। তারা হয়তো তৎক্ষণাৎ এই কাহিনীর গূঢ়ার্থ বা মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারে না; কিন্তু একটু বড় হলেই তারা বুঝতে পারে তার যথার্থ মর্মার্থ। বুঝতে পারে 'রাক্ষস' অত্যাচারী-শোষক শ্রেণীর প্রতীক; আর 'খোক্ষস' হল নিয়তি বা ঈশ্বর। অত্যাচারীর লোভ ও অত্যাচারের সীমা যখন ছাড়িয়ে যাবে তখনই খোক্ষসের আবির্ভাবে তার বিনাশ ঘটবেই। আর রাজপুত্রের দ্বারা বিপদগ্রস্ত বা বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার—আসলে সমাজে সমাপ্ত প্রতিকূলতা কাটিয়ে সমস্যা বা বিপদের বিনাশ ঘটিয়ে সর্বত্র শান্তি ও স্বস্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীকী শিশুর এই মনের ভিত গড়নের দিক দিয়ে শিশুসাহিত্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তবে একটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে সেকাল আর একালের মধ্যে অনেক তফাৎ। শ্রদ্ধেয় সোহারাব হোসেন একালের গল্পকার। তাই তাঁর শিশু-সাহিত্যের স্বাদ ও বৈচিত্র্য একটু অন্য ধরনের। ইংরেজ-শাসনাধীনে বাংলার সমস্যা একরকম ছিল, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই অন্য রকম অবস্থা এবং সাম্প্রতিককালে বাংলার ও বাঙালীর সমস্যা ও অবস্থা আরও এক ভিন্ন রকমের। তাছাড়া যেযুগে শিশুদের সামনে এমন উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার— রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, কম্পিউটার, ক্যালকুলেটার, মোবাইল ইত্যাদি ছিল না—উদার আকাশ, মুক্ত বাতাস, গভীর বন ও খোলা মন তাদের কল্পদৃষ্টিকে ভরিয়ে তুলতো, কল্পমনকে আবেগে-আবেশে বিভোর, মুগ্ধ ও উদ্দীপ্ত করে তুলতো। তাই তখনকার শিশুসাহিত্যিকদের রূপকথার গল্পে, ডাক ও খনার বচনে, রাক্ষস-খোক্ষস, ভূত-প্রেতিনী, রাজপুত্র-রাজকন্যা প্রভৃতি কাহিনীতে শিশুর কল্পমনও ভাবের আবেশে কল্পপক্ষ বিস্তার করে রাজপুত্রের পক্ষিরাজের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলতো সত্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠার

অন্বেষণে। পক্ষিরাজ উড়তে পারে কি পারে না—সে প্রশ্ন কখনোই শিশুরা করতো না এবং সে মানসিকতাও কখনোই তাদের থাকতো না। বিপদ্‌সঙ্কুলতার মধ্যে পাড়ি দিতে এরকম এক অবলম্বনকে তারা শ্রেষ্ঠ ও প্রয়োজনীয় বলে মনে করতো।

কিন্তু সাম্প্রতিক ইলেক্‌ট্রনিক্স যন্ত্রপাতির যুগে শিশুসাহিত্যের রীতি-প্রকৃতি, ভাষা, গঠন, উপস্থাপন, বিষয়বস্তুর রূপায়ন, রসব্যঞ্জনা একেবারেই অভিনব। সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের শিশুসাহিত্যে সেই অভিনব দিকটি নতুন আঙ্গিকে, তাৎপর্যে ও ব্যঞ্জনায় ধরা পড়েছে. তাঁর এই প্রয়াস সার্থকতা পেয়েছে তাঁর বেশ কিছু শিশুসাহিত্যে, যেমন—

(১) 'কল্পতরু গল্পতরু', ২০০৩, পত্রলেখা,

(২) 'রূপকথার পুতুল', জানুয়ারী ২০০৮, নির্মল বুক এজেন্সি,

(৩) 'ফটিক বারি যাচে রে', জানুয়ারী ২০১০, পুনশ্চ

(৪) 'জম্পেসদার ভূতপুরী অভিযান', ডিসেম্বর ২০১০, দে'জ পাবলিশিং

(৫) 'গুঁফোবুড়োর কান্না', জানুয়ারী ২০১১, শিশু সাহিত্য সংসদ।

"জম্পেসদার ভূতপুরীর অভিযান" গ্রন্থে তিনটি পর্বে গল্পকার সোহারাব হোসেন অর্থলোলুপ দস্যু শ্রেণীর মানুষের ভণ্ড সাধু বেশের আড়ালে অর্থ-সম্পদ আত্মসাতের জঘন্য দিকটি তুলে ধরেছেন। এখানে প্রথম পর্বে যোগিনী ভূত, দ্বিতীয় পর্বে ডাকিনী ভূত এবং তৃতীয় পর্বে প্রেতিনী ভূতের কাহিনীর মাধ্যমে গল্পকার এক অভিনয় আঙ্গিকে অসাধারণ গল্পরস পরিবেশনে শিশুদের চিত্তে যোগনী-ডাকিনী-প্রেতিনী ভূতের উদ্ভব ও তাদের কাঙ্ক্ষিত মানসিকতা এবং মন্দিরের পূজারী বা পাণ্ডার ছদ্মে দস্যুশ্রেণীর মানুষের গোপন হত্যা-পাচার প্রভৃতির মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধি দু'য়ের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গল্পকার দেখিয়েছেন যোগিনীরা সবাই সুন্দরী ও যুবতী। তাদের সমস্যা কিডন্যাপড সমস্যা, তাদের হৃষ্ট-পুষ্ট খোকাদের মাঝে মাঝে কারা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এই যোগিনীরা আবার মনুষ্যসমাজ থেকে গোপনে মনুষ্য সন্তান চুরি করে এনে তারা অতৃপ্ত মনোবাসনা চরিতার্থ করে। এই যোগিনীরা আসলে মনুষ্য সমাজের প্রেম-প্রতারিতা সুন্দরী যুবতী। আত্মহত্যা করে মৃত্যুবরণ করায় তারা ভূতপুরে যোগিনীভূত হয়েছে অতৃপ্ত কামনা-বাসনা নিয়েই। গল্পকার বলেছেন—"ওই অতৃপ্ত বাসনার জোরেই তরুণ যুবক পুরুষ দেখলে যোগিনীদের মনে ঘর বাঁধার ইচ্ছাটা লেলিহান হয়ে ওঠে। সেই ইচ্ছা পূরণের জন্য সুযোগ পেলেই পুরুষ মানুষকে এরা কিডন্যাপড করে।"[২]

যোগিনীরা পৃথিবী থেকে যুবক পুরুষ কিডন্যাপড করে এনে তাদের সঙ্গে যোগিনীপুরে সুখে ঘর সংসার করে যে সন্তান জন্ম দেয়, সেগুলোকে আবার কিডন্যাপড করে ডাকিনীরা। অদ্ভুত বিকট চেহারা এদের। আসলে যে সমস্ত নারীরা গর্ভবতী অবস্থায় মারা যায় তারাই পরে ডাকিনীভূত হয় এবং প্রবল সন্তান-কামনার অতৃপ্ত বাসনা থেকেই তারা যোগিনীপুরী থেকে সন্তান কিডন্যাপড করে আনে। আবার প্রেতিনীরা ডাকিনী যুবকদের অপহরণ করে প্রেতপুরীতে সোনা-দানা-মণি-মাণিক্যভরা গুপ্ত ঘরের প্রহরী করে রাখে। জম্পেসদা



বলেছে—'সেখানেও দেখি কুতুমশার কেভের সেই পিটলে পাণ্ডাটাই নাটের গুরু হয়ে বসে আছে।.....পিটলে পাণ্ডাই দস্যুদলের মালিক। রাত্রিদিন সোনাদানা পাহারার জন্য ওর দরকার ছিল অনুগত বেং অমানসিক পরিশ্রম করতে পারা কিছু প্রহরী। ও প্রেতিনীদের হাতে করে, ডাকিনী-যুবকদের মার্ডার করিয়ে প্রহরীর প্রয়োজন সারত।....ডাকিনীরা তাদের দল পূরণের জন্য ভূত খোকাদের চুরি করত। আর যোগিনীরা সে ঘাটতি মেটানোর জন্য কুতুমশার কেভে বেড়াতে আসা মানুষদের অপহরণ করত।"[৩]

—জম্পেসদার জবানীতে গল্পকারের এ উক্তিতে স্পষ্টত বর্তমান সমাজ ও যুগচিত্র উন্মোচিত হয়েছে। যোগিনী-ডাকিনী-প্রেতিনী ভূতের কাহিনী এযুগেরই কাহিনী হয়ে উঠেছে। একদল মানুষ আছে—যারা সাধু সেজে অসাধুতার ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করে, মণিমাণিক্য গুপ্ত ঘরে সঞ্চয় করে রাখে। এরা মন্দিরের পাণ্ডা নয়; প্রকৃতপক্ষে ডাকাতদলের পাণ্ডা। এরা নিজেদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার জন্য যোগনীপুত্র-ডাকিনীপুরুষদের মতো শক্তিশালী পুরুষদের কাজে লাগায়। গল্পকার এরকম এক বর্তমান যুগচিত্র এক অভিনব আঙ্গিক-বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরেছেন, যা একই সঙ্গে শিশুমনে গল্পরস ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চার করে।

'কল্পতরু-গল্পতরু' গ্রন্থে মোট চারটি গল্প আছে। যথা—(ক) নাস্তিক যুগরাজ (খ) আলস্য নিবারণী সমিতি—জিন্দাবাদ (গ) কুসুমবতীর জন্মদিন ও চন্দ্রগ্রহণ (ঘ) মধুর স্বপ্ন, সোহারাব হোসেন এই প্রথম শিশুসাহিত্য গ্রন্থটির প্রতিটি গল্পে কাল্পনিক গল্পকাহিনীর মোড়কে শিশুমনে রোমান্স, কৌতূহল, উপস্থিতবুদ্ধি, মানবতাবাদ প্রভৃতি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই গ্রন্থের 'নাস্তিক যুবরাজ' গল্পে তিনি তুক্‌-তাক্‌, যন্ত্র-তন্ত্র, ভূত-প্রেত, ঈশ্বরের নামে অলৌকিকতার ভণ্ডামি প্রভৃতি তুলে ধরেছেন। রূপকথার দেশ হালুম-হুলুমপুরীর যুবরাজ ফটিকচাঁদের ঘিলু অন্যদের তুলনায় এক গ্রাম বেশি বলেই বুদ্ধিতে প্রখর। কোথাও কোনো সমস্যা হলে সে দ্রুত সেখানে গিয়ে তা সমাধান করে। পুত্রের এমন বুদ্ধি, করিতকর্মা চরিত এবং সুনাম দেখে রাজা নাজিরাম চাঁদ স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পুত্রকে সত্বর রাজাধিরাজ করে মসনদে বসাতে চান। কিন্তু যুবরাজের ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকায় মহামন্ত্রীর ঘোর আপত্তি। কেননা, এই আস্তিক্যবাদের দোহাই দিয়ে রাজপুরোহিত ভণ্ডামি করে বেশ কিছু অর্থ রাজভাণ্ডারে পূর্ণ করেন। যুবরাজ ফটিক চাঁদ রাজাদেশে হাঁদর-বাঁদর গড়ের পাহাড়ি রাজ্যের ভূস্বামী নিধিশর্মা দাসের বাড়িতে গিয়ে তার 'ভূতদলন ক্লাবের' সদস্যদের নিয়ে প্রমাণ করে সেখানে কোনো ভূত-প্রেত বা দৈত্য-দানবের উৎপাত নয়, একটি ছোট মেয়ের (নিধিশর্মার বড় নাতনি) মানসিক রোগের কারণে নানা উৎপাত। আর সেটাতেই স্বার্থান্বেষী আস্তিক্যবাদীর দল ভূত-প্রেতের আলৌকিক বিশ্বাসে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষাও হয়নি। হালুম-হুলুমপুরীর মানুষ তবুও ঈশ্বরের অলৌকিকতার অন্ধ বিশ্বাস কাটিয়ে রাজপুত্র ফটিকচাঁদকে মেনে নিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত প্রজাদের চাপে রাজা রাজপুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করতে বাধ্য হন। গল্পকার এখানে একটা সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের খোঁজা দিয়েছেন। গল্পের একেবারে শেষে গল্পকার ভারতবাসীর ভূত-প্রেত-আলৌকিকতার প্রতি বিশ্বাসে তীব্র শ্লেষ হেনেছেন ফটিক চাঁদের উক্তিতে—

"পৃথিবীতে ভারতবর্ষ নামক একটা দেশ আছে। শুনেছি সেখানেও এমন ভূতুড়ে ব্যাপার খুব ঘটে। আমি সেখানেই চললুম। ভাবছি ওখানেও এমন একটা ক্লাব খুলব।"[৪]

—আলোচ্য গল্পটি একাধারে শিশুমনের খোরাক এবং বড়দের বোধ-বুদ্ধি-বিবেকের জাগরণের গল্পও। মানুষ যে সবকিছু বাস্তব ঘটনার মধ্যে আলৌকিকতা যুক্ত করে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধ করে এবং অগণিত সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে সেই ভিত্তিমূলে তিনি কুঠারাঘাত হেনেছেন এবং শিশুদের এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন।

'আলস্য নিবারণী সমিতি—জিন্দাবাদ' গল্পে গল্পকার আলস্য দূর করে মানুষকে কর্মপটু হওয়ার গল্পকাহিনীর রূপকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উৎস এবং সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে স্বার্থসিদ্ধির প্রবণতা প্রভৃতি গভীর ও জটিল দিকটি উন্মোচন করেছেন। আলস্য নিবারণী সমিতির সদস্যদের নামগুলিও ইতিবাচক অর্থপূর্ণ। যথা—সম্পাদক-কর্মনারায়ণ, সভাপতি—আলস্যভঞ্জন রায়মক্কেল, প্রচারসচিব—হতাশতাড়ন চিন্তাগ্রাহী। প্রত্যেকটি নামই কর্মঅনুযায়ী অর্থবহন করে। গল্পকার সোহারাব হোসেন প্রথমে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গল্পের মতে লঘুরসে কাহিনী শুরু করে তারপরেই গুরুগম্ভীর গূঢ় সত্য কথা বলেছেন। আসল্য নিবারণী সমিতির কার্যকলাপের সার্থকতা প্রকাশে হালকা লঘুরস প্রকাশিত। যেমন—(ক) নরহরি ঘোষের মেজো ছেলে ন্যালাখ্যাপার লজেন্স চোষার নির্দেশে লালাক্ষরণ বন্ধ হওয়া (খ) নেয়ামত গাজির একমাত্র ছেলে ল্যায়চাঁদের চিমটি কাটার নির্দেশে ঘুমরোগ দূর হওয়া, (গ) নববধূ কঙ্কালি সরকারের স্বামীর কাছে সড়সড়ে পিঁপড়ে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশে তার কুঁড়েমি দূরীকরণ প্রভৃতি কাহিনী শুনতে শুনতে শিশুরা যখন হাসতে হাসতে কঁকিয়ে ওঠে, তখন তিনি ভারতে সাম্প্রদায়িকতার তীব্র সমস্যা ও যন্ত্রণা তুলে ধরেছেন শিশুমনের উপভোগ্য করে। সমিতি ছাব্বিশ নম্বর সদস্য যখন বলে—

"নানা ধর্মের নানা খাপ।
ধর্ম করা মহাপাপ।।"[৫]

—তখন তার প্রত্যুত্তরে সম্পাদক কর্মনারায়ণ কথাবাগীশ জানিয়েছে—

"নানা ধর্মের নানা বাপ।
তীরের মতোন আসবে চাপ।।"[৬]

—প্রথ শ্লোকে বিভিন্ন ধর্মের পরস্পর-বিরোধী বক্তব্যে ও মন্তব্যে শেষ পর্যন্ত ধর্মের প্রতি মানুষের মোহভঙ্গতা, নাস্তিক্যবাদের উদ্ভব এবং দ্বিতীয় শ্লোকে ধর্মীয় মানুষের দ্বারা নাস্তিকের প্রতি নানাধরণের চাপ ও যন্ত্রণা ব্যঞ্জিত হয়েছে। গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন যে, ধর্মীয় মানুষের সাম্প্রদায়িক বিষেবাষ্পে পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধে এবং তাতে অগণিত মানুষ যারা যায়। অথচ সব ধর্মেরই মূল কথা মানবকল্যাণ। ঈশ্বরের বক্তব্য—

"আপনারা সবই মহামানব। অবতার। আপনাদের প্রত্যেকের ধর্মের মূলকথা তো মানুষের মঙ্গল না কি?



—হ্যাঁ হ্যাঁ। একথা ঠিক—বুদ্দ, যিশু, কৃষ্ণ, মহম্মদের এজেন্টরা সবাই ঘাড় নেড়ে বলে উঠলে।"[৭]

—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য বাতিল করে দিয়ে কেউই মানুষের জন্য শান্তির বাণীর প্রচার করতে পারেননি; বরং উল্টোটাই হচ্ছে। ধর্মের গোঁড়ামিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মানুষই মরছে এবং মানুষের মধ্যে অশান্তি, দ্বন্দ্ব, কলহ, অবিশ্বাস প্রভৃতি সৃষ্টি হচ্ছে। গল্পকার সোহারাব হোসেন সুকৌশলে সেই দিকটি উন্মোচন করেছেন।

'কুসুমবতীর জন্মদিন ও চন্দ্রগ্রহণ' নিছক বাচ্চাদের আড্ডামূলক গল্প। চন্দ্রগ্রহণের একটা বৈজ্ঞানিক কারণ আছে; ক্লাসের পড়ুয়া ছাত্র অজয় তার যথাযথ উত্তরই দিয়েছে। কিন্তু আনন্দ ও কৌতূহল দুইই জাগিয়ে তোলে। শেষ পর্যন্ত জেদী রাজকুমারী কুসুমবতী বুঝেছে চাঁদ সকলের জন্য। তাকে একার মতো করে পেতে গেলে সব নষ্ট হয়ে যায়। তাই এটা তার অন্যায় বায়না। এই গল্পকাহিনীর মাধ্যমে গল্পকার শিশুমনে এই বোধ জাগাতে চেয়েছেন যে, যা সবার জন্য—তা একার জন্য পেতে চাওয়া ও পাওয়া ঠিক নয়। সবার পাওয়ার মধ্যে তারও পাওয়া হয়ে যায়। শিশুর এই বোধে জাগরিত হলে তারা কখনো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠবে না।

'মধুরস্বপ্ন' গল্পে গল্পকার কোনো নীতি-আদর্শ নয়, প্রবল আগ্রহ ও ইচ্ছেশক্তিতে শিশুরা অনেক অসাধ্যসাধন করার মানসিকতা নিয়ে থাকে—তা সোহমকে নিয়ে শুভর সুন্দরবনে গিয়ে মৌলীদের মতো মধু সংগ্রহের স্বপ্নে প্রকাশিত হয়েছে। এ গল্পে শিশুদের মধ্যে আগ্রহ, উত্তেজনা, অসাধ্যসাধনের মানসিকতা প্রভৃতি জাগ্রত হয়।

'রূপকথার পুতুল' গল্পগ্রন্থে মোট তিনটি গল্প আছে। যথা—

(১) রূপকথার পুতুল
(২) রাক্ষস ও তার তিন বন্ধু
(৩) নাস্তিক যুবরাজ

—এর মধ্যে 'নাস্তিক যুবরাজ' গল্পটি 'গল্পতরু-কল্পতরু' গ্রন্থে প্রথম সংকলিত হয়েছিল এবং তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও দিয়েছি, এখানে অন্য দুটি গল্পের পরিচয় সংক্ষেপে তুলে ধরারা চেষ্টা করবো।

'রূপকথার পুতুল' গল্পে গল্পকার রূপকথার পটভূমিতে রাজা অঙ্কন-বঙ্কনের দুই স্ত্রী বড়রাণী দুয়োরাণী শান্তিকুসুম এবং ছোটরাণী সুযোরাণী ঈর্ষাকুমে মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেছেন। ন্যায় ও সত্যের আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা থাকলে ঈশ্বর তার সহায় হন এবং চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও অসাধ্যসাধন করা যায়। গল্পকার দুয়োরাণী ও তার তিন ছেলের হালুম-হুলুম বন থেকে স্বর্ণমৃগ নিয়ে আমার দুঃসাধ্য-সাধনায় তা দেখিয়েছেন। সুয়োরাণী ঈর্ষাকুসুম দুয়োরাণীকে সহ্য করতে পারে না এবং আরও সহ্য করতে পারেনা তার ছেলেকে বাদ দিয়ে বড় রাণীর ছেলেকে রাজা করা, আর সেটাই বন্ধ করতে রূপের মোহে মুগ্ধ করে রাজাকে বশ করে মনোবাসনা পূর্ণ করতে চায়। স্বর্ণমৃগ আনতে হালুম-হুলুমপুরীর গভীর

বনে গিয়ে পুতুলের নির্দেশ ঠিকমতোমেনে না চলায় প্রথমে বড় রাণী একটি চাঁপাফুল গাছ হয়ে যায়, পরে বড় ভাই একটা খরগোস হয়ে যায়, পরে মেজোভাই একটি পাখিতে পরিণত হয়ে যায়। এরপরে ছোটভাই পুতুলটিকে সঙ্গে করে নিয়ে হালুম-হুলুম পুরীতে গিয়ে পুতুলের নির্দেশমতো সবকিছু করে রাক্ষসীর কবল থেকে স্বর্ণমৃগ এবং মা-ভাইদের উদ্ধার করে এনে রাজার সামনে আসে। এবং শুধু তাই নয়, ছোটকুমার স্বর্ণমৃগকে হত্যা করে প্রমাণ করে দেয় যে, এই স্বর্ণমৃগটিই আসলে এক রাক্ষসীর ছদ্মরূপ এবং সেই রাক্ষসীই ছোটরাণীও রূপ ধারণ করে আছে। স্বর্ণমৃগের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ছোটরাণীর রাক্ষসীর রূপধারণ করে মৃতুবরণ করে। যে সমস্ত সুন্দরী স্ত্রী স্বামীকে রূপের মোহে মুগ্ধ করে স্বামীকে দিয়ে তার খল-উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে এবং ভাল মানুষের ক্ষতি সাধন করে—তারা যে আসলে এক একটি ছদ্মরূপিনী রাক্ষসীই সেই দিকটি গল্পকার তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং শিশুমনে তার একটা প্রাথমিক ধারণা ও বোধ সঞ্চার করিয়েছেন।

'রাক্ষস ও তার তিন বন্ধু' গল্পে গল্পকার দেখাতে চেয়েছেন—হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি দূর করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলে শান্তি ও স্বস্তি পাওয়া যায় এবং বিপদের দিনে একে—অপরের সাহায্যে প্রাণ বাঁচানো যায়। রাক্ষসের সঙ্গে প্রথমে লম্বলেজা (ইঁদুর), খরচক্ষু (পেঁচা) ও লোমঝুলঝুলা (বিড়াল)-এর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়েছিল; তখন তাদের সদ্ভাব ছিল এবং একে অপরের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু পরে রাক্ষস তাদের খেতে চাইলে বন্যার সময় পেঁচাতাং ডানায় করে বিড়াল ও ইঁদুরকে নাচিয়েছে। রাক্ষস জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে।

'রূপকথার পতুল' গল্পের মতো 'গুঁফোবুড়োর কান্না' গল্পগুলিতে দুয়োরাণী ও সুয়োরানীর কাহিনী আছে এবং এখানেও সুয়োরানী একজন রাক্ষসী মায়াবিনী, সুন্দরী রূপসীর রূপ ধারণ করে রাজার সুয়োরানী হয়ে রাজাকে সর্বস্বান্ত করতে চেয়েছে, বড়রাণী ও বড়রাণীর ছেলেকে সর্বনাশ করতে চেয়েছে। শেষপর্যন্ত তার মরেছে।

এই গল্পগ্রন্থে একটি কাহিনী চারটি পর্বে বিন্যস্ত হয়ে পরিবেশিত হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পর্বে আছে সুযোরাণী ছোটোরাণী নিজের পুত্র মল্লটকে যুবরাজ করার জন্য দুয়োরাণী বড়োরাণীর ছেলে শক্তিমান নাগভট্টকে মারতে রাজাকে মোহমুগ্ধ করে ভয়ঙ্কর গুঁফোবুড়োর কাছ থেকে একেরপর এক মরকত মণি, রামধনুমানিক, চন্দ্রমাণিক্য, সূর্যমাণিক্য আনতে বলে। আর রাজপুত্র নাটভট্ট কাঠের ঘোড়ার সাহায্যে গুঁফোবুড়োকে জব্দ করে সেগুলো উদ্ধার করে আনে। এই উদ্ধার কাহিনী নিয়ে চারটি পর্ব যথাক্রমে— (১) 'নাগভট্ট, মরকত মণি ও গুঁফোবুড়ো', (২) 'কাঠের ঘোড়া, রামধনুমানিক ও গুঁফোবুড়ো' (৩) 'কাঠের ঘোড়া বনাম গুঁফোবুড়ো ও চন্দ্রমাণিক্য' (৪) 'কাঠের ঘোড়া বনাম কাঠের ঘোড়া ও সূর্যমাণিক্য।'

প্রথম পর্বে দেখা যায় কাঠের ঘোড়ার তীক্ষ্নবুদ্ধিতে ও কৌশলে গুঁফোবুড়ো নাকাল হয়ে যায় এবং নাগভট্ট মরকত মণি উদ্ধার করে আনে। দ্বিতীয় পর্বে রামধনুমাণিক উদ্ধার করতে নাগভট্ট ও কাঠের ঘোড়াকে একটু বেশি কষ্ট পেতে হলেও শেষ পর্যন্ত তা উদ্ধার



করে আনে। আর তৃতীয় পর্বের ঘটনায় আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠি। কাঠের ঘোড়া গুঁফোবুড়োকে 'দাদু' বলে সম্বোধন করলে গুঁফোবুড়ো অবাক হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে তার মধ্যেকার সুপ্ত-লুপ্ত মানবিক চেতনা জেগে উঠতে থাকে। তারপর কাঠের ঘোড়া একটা এল. সি. ডি. প্রোজেক্টরে পরপর দুটি সি. ডি. চালিয়ে স্ক্রিনে ছবি দেখায়—একটি গ্রামের সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা সুন্দর গ্রামচিত্র; অন্যটি গ্রামের ভয়ঙ্করতার ছবি। এই দৃশ্যগুলো দেখে গুঁফোবুড়োর মনে পড়ে তার গ্রাম, ভিটে-মাটির কথা। সে হাহাকার করতে থাকে তার নদী, সোনার ধান, মাঝির গান, যাত্রাপালা, ঘরদোর, পরিবার-পরিজন—সবকিছুর জন্য। গুঁফোবুড়ো অঝোরে কাঁদতে থাকে, তার চোখে অবিরাম জল ঝরতে থাকে এবং স্বেচ্ছায় চন্দ্রমাণিক্য দিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য এই তৃতীয় পর্বে গল্পকাহিনীতে অভিনবত্ব এসেছে এবং সোহারাব হোসেনও এখানে আধুনিক শিশুসাহিত্যে নতুন টেক্‌নিক ও আঙ্গিক এনেছেন। সাধারণত আগেকার রূপকথা গল্পে কোনো লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে বা বা চেতনার জাগরণ ঘটাতে অন্য কোনো উপকাহিনী উপস্থাপন করা হতো বা অন্য কোনো চরিত্রের বা আলৌকিক কাহিনী বা অকাশবাণী উপস্থাপন করা হতো বা 'ফ্ল্যাশ ব্যাক' অতীত কাহিনী দেখানো হতো, কিন্তু সোহারাব হোসেন সেখানে এল. সি. ডি. প্রোজেক্টরে সি. ডি. সংযোগে আধুনিক শিশুসাহিত্যে অভিনবত্ব এনেছেন এবং আধুনিক কম্পিউটারপ্রিয় শিশুদেরও তা স্বাভাকি ও উপাদেয় এবং আকর্ষণীয় হয়েছে।

চতুর্থ পর্বের কাহিনীতে গল্পকার সুচারুভাবে সত্যোন্মোচন করেছেন। আমরা অবাক-বিস্ময়ে জানতে পারি গুঁফোবুড়ো আসলে মানুষ। ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তার লালসা তাকে রাক্ষসের পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছিল। জানতে পারি কাঠের ঘোড়ার দেখানো সি. ডি-র ছবি দেখে গুঁফোবুড়োর সম্বিৎ ফিরে এসেছে। সে গ্রামে ফিরেছে এবং মানুষের জীবন যাপন করছে। সে একজন চাষীমানুষ ছিল। এক লোভী বণিক তাকে মাণিক চুরির কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল। লুঠতরাজ-ডাকাতি-ছিনতাই করে তারা বহুমূল্য মাণিক্য মরকত মণি, রামধনুমাণিক্য, চন্দ্রমাণিক্য, সূর্যমাণিক্য সংগ্রহ করেছিল। পরে সেই বণিক ধনসম্পদের গরমে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে। সব ধনসম্পদ একা ভোগ করার লোভে সেই বণিক সমস্ত পার্টনারদের ফাঁকি দিয়ে লোকালয় ছেড়ে হেঁতাল-বেতাল অরণ্যে আস্তানা গেঁড়েছিল শুধু তাকে সঙ্গে নিয়ে। এই বনে বণিকের এক রাক্ষুসি দোসর ছিল। সেই রাক্ষুসীই তাকে গুঁফোতে রূপান্তরিত করে রেখে নিজেই পুতুলপুরী দেশের রাজার সুয়োরাণী-ছোটরাণী হয়ে ছিল। আর বণিক রাক্ষসে পরিণত হয়ে পরে সে একটি হলুদ চাঁপাগাছ হয়ে আছে। আর মাত্র একমাস কাটলেই গুঁফোবুড়োও রাক্ষসে পরিণত হয়ে যেত। নাগভট্ট গুঁফোবুড়ো ও কাঠের ঘোড়ার সাহায্যে রাক্ষস ও রাক্ষসীকে বধ করে সূর্যমাণিক্য উদ্ধার করে বাড়িতে ফেরে। আশচর্যের বিষয় রাক্ষুসী বধের সঙ্গে সঙ্গে সুয়োরাণীও বীভৎস রাক্ষুসী রূপ ধারণ করে মৃত্যুবরণ করে।

গল্পকার সোহারাব হোসেন রাক্ষুসীকেই ছোটরাণী সুয়োরাণী করে দেখিয়েছেন এবং তার কার্যকলাপে ঈর্ষা-লোভ-কুটিলতা প্রভৃতি চরিত্রায়ণে হিংসাকুটিল নারীর রাক্ষুসী স্বভাবকে দেখাতে চেয়েছেন। আর মানুষ স্বার্থসিদ্ধি ও লোভে রাক্ষস-স্বভাব হয়ে যায় বণিক ও গুঁফো চরিত্রায়ণে সেটাই দেখাতো চেয়েছেন।

সোহারাব হোসেন শুধু ছোটদের গল্প নয়, নাটক রচনায়ও সিদ্ধহস্ত, তাঁর ফটিকবারি যাচে রে' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই নাটকে তিনি ভূতরাজ্যের পটভূমিতে শিশুমনে আধুনিক যুগযন্ত্রণা সুকৌশলে তুলে ধরেছেন, তাই এ নাটকের কাহিনী শিশুমনের উপভোগ্য হলেও গভীর ব্যঞ্জনায় বড়দের রসভোগ্যও হয়েছে। ভূতরাজ্যের পাঁচটি শিশুচরিত্র- রাজকন্যা সুমনা, মন্ত্রীপুত্র সমৃদ্ধ, সেনাপতিপুত্র রীতিকি, রাজকবির কন্যা ঋতিসা, কোটালপুত্র ঋজু এবং একটি চাতকপখির সরকার জলপ্রার্থনায় নাট্যকাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এই পাঁচরিত্রের সঙ্গে চাতকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে এবং হৃদয়ের কথার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে আধুনিক যুগযন্ত্রণা উন্মোচিত হয়েছে। চাতক বলেছে আমাদের এই দেশ একসময় চন্দনবনে পূর্ণ ছিল। চন্দন বলতে লেখক 'জীবন'কেই বোঝাতে চেয়েছেন—"চন্দন হয় জেনো জীবনের আর নাম।"[৮] একসময় সেই চন্দনবন রাক্ষসের দৃষ্টিতে পড়ে যায়। রাক্ষস সেই চন্দনবন চায়-ই চায়। আর সেজন্য সেই রাক্ষস রাজাকে তুষ্ট করে সব দখল করতে থাকে। শ্রদ্ধেয় সোহারাব হোসেন চাতকের উক্তিতে সেই প্রসঙ্গটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন—

'ধন দিল সাময়িক নগরীর মাঝারে।।
রাস্তা দিল নাস্তা দিল ঋণও দিল তিল তিল।
বিনিময়ে কেড়ে নিল আমাদের তহবিল।
এইভাবে একমুখে নগরীতে দিয়ে সুখ।
মসনদে শুয়ে রাজা সুখ খেল চুকচুক।।"[৯]

—এ সংলাপ যেন শিশুদের নয়; শিশুরা এক ভৌতিক পটভূমির আবহে তা উপভোগ করে বটে, তবে এখানে আধুনিক যুগ-জীবন যন্ত্রণা, শাসক-শাসন প্রভৃতি আরও বেশি প্রকটিত হয়ে ওঠে। শাসকগোষ্ঠী নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম—আরামের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে বিকিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই দেশের 'তহবিল' অঙ্গ কোষাগার নিয়ন্ত্রণ করে, সেই দিকটিই গল্পকার উন্মোচন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদী বা মুনাফাবাজদের লোভানলে শেষ পর্যন্ত রাজ্য যে নিঃস্ব হতে থাকে তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন—

"রাক্ষসে ভোগে মাতে চন্দন সুবাসে।
মুনাফার বাহুবলে খুকখুক সে হাসে।।
চন্দন দিনে দিনে কমে গেল রাজ্যে।



রাক্ষসে বিষ দিল নেই সুখ আর যে।।
জল নাই ফল নাই নাই পাখি একটাও।
চারিদিকে গজরায় রাক্ষসে হাঁওমাও।।"[১০]

—শাসকের রাক্ষুসে মনোভাবে ও মুনাফাবাজদের লোভাতুর ছোবলে দেশ কিরকম নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত হতে চলেছে—সেই দিকটি লেখক এখানে শিল্পীত করেছেন।

রাজা দেশের স্বার্থে একটা 'কল' বসিয়েছে। সেই কল আসলে মানুষ-মারার ফন্দি—

"রাজা-কলে পেতেছে নাকি সন্ধি।
কল নাকি মানুষ মারার ফন্দি।।"[১১]

মন্ত্রী বলেন দেশের সুমঙ্গলের জন্য এই কল বসেছে, রাজকবি এই কলের নামে জয়গীতি গাওয়ার কথা বলেছে; ঋতিসা রাজার গোপন অভিসন্ধি ধরে ফলেছে।

সে বলেছে—

"খবর আছে সত্যি ভীষণ জেনো
কলের মালিক দুষ্ট পাজি বদ।
উন্নয়নের চাটনি মুখে ধরে
করছে চুরি দেশেরই সম্পদ।"[১২]

—রাজা এবং শাসক গোষ্ঠী দেশের উন্নয়নের মুখরোচক বুলির নামে নানা 'কল' করার প্রচারে আসলে দেশের সম্পদ লুঠপাঠ ও তছরূপ করেছে সেই দিকটিই সোহারার হোসেন এখানে তুলে ধরেছেন। নাটকের শেষে চাতকের গানে প্রকাশিত হয়েছে, যে দেশ চালায় স্বার্থপর মানুষের দল। যে-ই রাজা হোক না কেন শাসকপদে এলে তারা পাল্টে যায়। শোষিত শাসক হলে পরে সেও শোষক হয়ে ওঠে, মিস্টি ফটিক জল অর্থাৎ শান্তি-স্বস্তি আর ফিরে আসে না—

"দেশ তো চালায় ধ্বংসকারক পুতুল নাচের দল।
আর যাবো না খেতে ও ভা-ই মিষ্টি ফটিক জল।"[১৩]

'মিষ্টি ফটিক জল' অর্থাৎ শান্তি-স্বস্তি। 'চাতক' যে-কোনো শান্তিকামী সুস্থ মনের মানুষ। এই ধরনের মানুষ দেশ-দেশান্তরে সর্বত্র 'ফটিক বারি যাচে' অর্থাৎ দেশে সুমনোরম শান্তি-স্বস্তি-প্রার্থনা করে। এই নাটকের নামকরণে সেই দিকটি গভীর ব্যঞ্জনাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, আর এই নাটকটি একাধারে শিশুপাঠ্য ও বড়দের বোধোদয়ে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। সোহারাব হোসেনের অসাধারণ বিষয় বিবাচনে পরিবেশন-নৈপূণ্যের গুণে নাটকটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানেই তিনি শিশুসাহিত্যিক হিসেবে আরও মহৎ ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

১ = 'ওরা কাজ করে', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'আরোগ্য' কাব্য,

২ = "জম্পেসদার ভূতপুরীর অভিযান", সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা-২২

৩ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩০
৪ = 'কল্পতরু-গল্পতরু', সোহারাব হোসেন, পত্রলেখা, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা-১৭
৫ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২
৬ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২২
৭ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ২৩
৮ = 'ফটিক বারি যাচে রে', সোহারাব হোসেন, পুনশ্চ, কলকাতা, জানুয়ায়ী ২০১০ পৃষ্ঠা-২৬
৯ = পূর্বোক্তা, পৃষ্ঠা-২৬
১০ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৬
১১ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫
১২ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৩
১৩ = পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৬

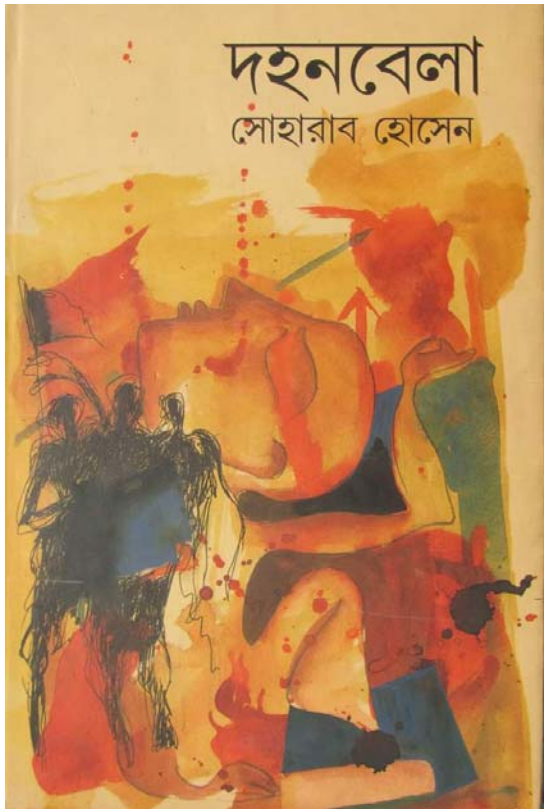


তৌসিফ আহমেদ

## সোহারাব হোসেনের শিশু সাহিত্য

বাংলা শিশুসাহিত্যের বয়সকাল সুপ্রাচীন। বিশেষ করে মৌখিক সাহিত্যের সরণিতে। হাজার-হাজার বছর ধরে বাঙালির বেঁচে থাকার জীবনানুষঙ্গে মিশে গেছে শিশুসাহিত্যের ধারা। আবার বিপরীতভাবে একথাও সমানভাবে সত্য যে, একবিংশ শতকের সূচনালগ্নে এসে বাঙালির নিত্য-নৈমিত্তিক সুখী গৃহকোণের স্বপ্নলব্ধ ভুবন থেকে ক্রমাগতভাবে হারিয়ে যাচ্ছে 'ঠাকুরমার ঝুলি', 'হিতোপদেশ', 'জাতকের গল্প', 'কথামালা' বা রূপকথার বৈচিত্রময় জগৎ। এই অনিবার্য ক্ষয়িষ্ণু জীবনতন্ত্রে খানিকটা বিকল্প সরণির মতো সোহারাব হোসেনের শিশুসাহিত্য। সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো অবিরাম বিচরণ নয়, বরং অনেকটাই শ্লথ গতিতে শিশুসাহিত্যের যাত্রাপথে তাঁর পরিভ্রমণ।

বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে সোহারাব হোসেনের অবস্থানকে চিহ্নিত করতে প্রথমেই যে প্রশ্নের অবতারণা করতে হয়,তা হল তাকে শিশুসাহিত্যিক বলা যাবে কতখানি? আসলে বাংলা শিশুসাহিত্যের অতীত ঐতিহ্য থেকে বর্তমান পর্যন্ত যে কালপরম্পরা সেখানে নবরূপকথার বৃত্তান্ত নিয়ে হাজির হলেও যে অর্থে যশ প্রসিদ্ধ কথাসাহিত্যিক, সেই অর্থে শিশুসাহিত্যের আঙিনায় তাঁর অবস্থান অতি উচ্চাসনে না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বে আসীন। ইতোমধ্যে তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থের সংখ্যা ছয়।

সোহারাব হোসেনের শিশুসাহিত্য গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র ছয়টি হলেও প্রকাশকাল সুদীর্ঘায়িত এবং শিশুসুলভ গল্প বিষয়ে উদ্ভট-ভৌতিক, মজাদার ভাবনার সঙ্গে ছোটগল্প সুলভ মেজাজকে অন্বিত করে গেছেন। আমরা জানি ছোটগল্পের শিল্পরূপ শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রভূমি থেকে কিছুটা দূরে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। সেখানে ব্যঞ্জনা, অন্তঃবাস্তবতা, একমুখী গল্প বিষয়াবলী বা বাস্তবতার অভিনব বিবর্তনের রূপায়ণ অনিবার্যভাবে সারসত্য নয়। কোথাও কোথাও হয়ত রূপক-চমক, নাটকীয়তা-অলৌকিক মায়াবি জগৎ তার ঐতিহ্যময় বর্ণচ্ছটা নিয়ে অন্যরূপে হাজির হয়। ব্যতিক্রমী ধারার শিশুসাহিত্য সৃজনার আদিকথাকে স্পষ্ট করতে এখানে লেখকের ব্যক্তিক অভিমতকে তুলে ধরতে হয়—

"আসলে বাচ্চাদের জন্যে লিখব এ আমার কখনো কোনো পরিকল্পনা ছিল না। বাচ্চাদের জন্যে লেখা আমার কাছে খুবই আকস্মিক। আগে বাচ্চাদের জন্যে ছড়া লিখতাম। যদিও তা আজ নেই, সবই হারিয়ে গেছে। তারপর খেলাচ্ছলে দু' একটা গল্প লিখেছি। ঠিকই তো একজন লেখক কতটা শক্তিশালী তা প্রমাণ হয় তিনি বাচ্চাদের জন্যে লিখতে পারছেন কিনা এবং বাচ্চাদের লেখার মধ্যে এক অদ্ভুত নির্মল আনন্দ আছে, শুদ্ধির জায়গা আছে। আমারও মনে হয়েছিল ঠিকই, সাহিত্যের একটি বৃহৎ প্রান্তর সেখান থেকে আমি বঞ্চিত হব কেন? আর এ বিষয়ে কোনো অনাগ্রহই নেই; এই মুহূর্তে আর একটি বাচ্চাদের লেখা লিখছি। এছাড়াও একথা বলতেই হয় ছোটদের লেখা শুধুমাত্র অদ্ভুত, আবোল-তাবোল, কল্পমূলক

হবে তা নয়, সেটা একটা আলাদা জগৎ কিন্তু ছোটদেরও প্রথম থেকেই জীবনের পাঠ দিতে হবে; দায়বদ্ধতার পাঠ দিতে হবে। শিশুদের মধ্যেও কল্যাণ, মঙ্গলবোধের পাঠকে প্রোথিত করতে হবে।"[১]

সমকালে অন্যান্য শিশুসাহিত্যিকদের পাশাপাশি শিশুপাঠ্য সাহিত্য সৃজনায় নিমগ্ন হয়ে যে চমকিত ভাব সুষমার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন, সেই গ্রন্থপঞ্জি হল—

১. কল্পতরু গল্পতরু
২. ফটিক বারি যাচেরে
৩. রূপকথার পুতুল
৪. ভূতপিসের ডাক
৫. জম্পেসদার ভূতপুরী অভিযান
৬. গুঁফো বুড়োর কান্না

আমরা এ সত্য বুঝে নিয়েছি যে, অনেক পরে হলেও সোহারাব হোসেন ছোটদের জন্যে কলম ধরেছেন। অন্যান্যদের অনুরোধে লিখতে শুরু করলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে তাঁর বিচার-বিশ্লেষণ খানিকটা রহস্যময় যেমন তেমনি অসম্ভবও। শিশু-কিশোর রচনা সৃষ্টিতে কিছু নাম যেমনভাবে জনপ্রিয় হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। কিন্তু বর্তমান সময় ও সমাজে জনপ্রিয়তার কোনো সংজ্ঞা নেই বিশেষ করে শিশুদের কাছে। এ প্রসঙ্গে লেখকের একটি মন্তব্যকে এখানে তুলে ধরা যেতে পারে—

"বাচ্চারা আসলে কোনো নাম দেখে নয়: এমনকি কাগজের কোনো বলে দেওয়া নামও নয়, তারা দেখে পছন্দ, ছবি। তারা দাঁড়িয়ে দু' একটা গল্পও পড়ে, তৎক্ষণাৎ ভালোলাগা গল্পই কিনে ফেলে তারা।"[২]

জনপ্রিয় হয়ে ওঠা, সাহিত্যক্ষেত্রে একটা তাৎক্ষণিক বিষয় মাত্র। সাহিত্য যদিও চিরকালের কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের উত্থান-পতন ঘটেই। জনপ্রিয় সাহিত্যিকের সমস্ত সৃষ্টি সম্ভারই যে জনপ্রিয় তা আদৌও নয়। বরং শিশু-কিশোর সাহিত্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা যথেষ্টই কঠিনতর ব্যাপার।

সোহারাব হোসেনের ছয়টি শিশুপাঠ্য গ্রন্থের বিষয় প্রকরণে দেখা যায় মূলত ভূত-প্রেত-আলৌকিকতা সর্বস্ব গল্পে বা রূপকথামূলক অভিযান সর্বস্ব গল্প আবার কোথাও ডিটেকটিভ, রহস্য-রোমাঞ্চকর ভয়াল ভাব পরিবেশমূলক গল্প, এছাড়াও সমাজ বাস্তবতার অনিবার্য প্রক্ষেপণে, গল্প বা শিশুপাঠ্য নাটক রচনা লক্ষ করা যায়। প্রথমে তাঁর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ সম্ভারকে একটি ছকের সাহায্যে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

| ক্রমিক নং | গ্রন্থ নাম | প্রকাশকাল ও স্থান | শিল্পরূপ | বিষয় ভাবনা |
|---|---|---|---|---|
| ১. | কল্পতরু গল্পতরু | ২০০৩ খ্রীঃ কলকাতা বইমেলা | গল্প | গ্রন্থে ৪টি গল্প আছে। ২টি গল্পে রূপকথার ভাব বৃত্তান্ত থাকলেও অন্য দুটির বয়ন ও বিষয় চয়নে গভীর সমাজ-বাস্তবতা ও আধুনিক জীবনবৃত্তান্তের প্রতিরূপ নির্মিত হয়েছে। |
| ২. | ফটিক বারি যাচেরে | ২০০৩ খ্রীঃ | কাব্যনাট্য | শিশু উপযোগী নাটক হলেও এখানে এসেছে সমকাল ও তার ভয়ংকর ধ্বংসগ্রাসী লীলা। বিপরীতে সভ্যতা সৃষ্টির বিকাশ গড়ে তোলা, বেঁচে থাকার অনির্বচনীয় শুভ শক্তির ধারণা। |
| ৩. | রূপকথার পুতুল | ২০০৮খ্রীঃ কলকাতা বইমেলা | গল্প | এ গ্রন্থে ৩টি আলাদা - আলাদা গল্প (নাস্তিক যুবরাজ) পূর্ববর্তী গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। অন্য ২টির ১টিতে রূপকথার ভাবমূলক নির্মাণ ও অন্যটিতে নীতি বা হিতোপদেশ ধর্মী বিষয়ের বয়ন লক্ষিত হয়। |
| ৪. | ভূত পিসের ডাক | ২০০৯ খ্রীঃ কলকাতা বইমেলা | গল্প | একটি পূর্ণাঙ্গ গল্প কয়েকটি উপ শিরোনামে বিভাজিত। নিখাদ ভূতের গল্প, অপূর্ব আকর্ষণীয়, রোমাঞ্চকর মজাদার গল্পাবলী এ গ্রন্থে সৃজিত হয়েছে। |
| ৫. | জম্পেসদার ভূতপুরী | ২০১০ খ্রীঃ কলকাতা | গল্প | একটি গল্প। বৈঠকী ঢঙে অ্যাডভেঞ্চারমূলক-রহস্য উদ্‌ঘাটন বৃত্তান্ত। গোয়েন্দা জম্পেসদার নানান ভূত |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | রহস্যের মিমাংসা কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভাজিত। |
| ৬. | গুঁফো বুড়োর কান্না | জানুয়ারি, ২০১১খ্রীঃ কলকাতা | গল্প এ গ্রন্থে একটি গল্পই কয়েকটি উপশিরোনামে বিভাজিত। অবয়ব সংগঠনে রূপকথাধর্মী নির্মাণ এলেও বিষয় চয়নে এসেছে আধুনিকতার স্পর্শ। সময়ের চালচিত্র। |

বাংলা শিশুসাহিত্যে সোহারাব হোসেন নক্ষত্রের মতো। নক্ষত্রের সুদুর ঔজ্জ্বল্যে মর্তাকাশ, প্রখরভাবে আলোকিত শোভাময় না হলেও তার সৌন্দর্য, মায়াবি আলো, যে অপার্থিব চেতনার অন্তর্জগতকে আমাদের সামনে আরেকটু আলাদাভাবে প্রকাশ করে সোহারাব হোসেনের শিশুসাহিত্যও তেমনি। এ জগতে তাঁর বিচরণ নতুনভাবে ঘটলেও সৃষ্টির চমকিত তাৎপর্যে স্বল্প সংখ্যক রচনাবলি অপূর্ব মনোহারী সৌন্দর্যের রসভূমি যেন। সেখানে তিনি স্বল্প আলোকে মায়াবী মোহাচ্ছন্নতায় যে কল্পভুবন গড়ে তুলেছেন তা নক্ষত্র আলোক দীপ্তিসম।

প্রথম শিশুসাহিত্য 'কল্পতরু গল্পতরু'। এ গ্রন্থ মাত্র ৪টি গল্পের সংকলন। গল্পগুলি হল—

ক. নাস্তিক যুবরাজ।

খ. আসল্য নিবারণী সমিতি—জিন্দাবাদ।

গ. কুসুমবতীর জন্মদিন ও চন্দ্রগ্রহণ।

ঘ. মধুর স্বপ্ন।

প্রথম গল্প 'নাস্তিক যুবরাজ'। এ গল্পের দেশ-বিদেশ বর্ণনাক্রম অপূর্ব। গল্পের বয়ন রীতিতে লোকরীতি ও রূপকথাধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। কথক নিজস্ব ভঙ্গিতে অনেককে গল্প শুনিয়েছে। 'ঠাকুরমার ঝুলি'র মতো এখানেও গল্পের আসর বসেছে। 'হালু হালুম পুরী'র অলৌকিক সমস্ত সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নাস্তিক যুবরাজ। ধর্ম-সংস্কার বর্জিত, নীতিবাদী-আদর্শবাদী বুদ্ধিমান যুবরাজ সমিতি স্থাপন করে জাগতিক মানুষের সমস্যার বুদ্ধিদীপ্ত সমাধানে মত্ত। গল্পের যুবরাজ 'হাঁদর-বাঁদর গড়ে' এসেছেন অদ্ভূত অলৌকিক সমস্যার সমাধান করতে। চারটি আলৌকিক-ভূতুড়ে ক্রিয়াকাণ্ড ঘটেছে সেখানে—

১. যক্ষত্রাস চাঁদের পিঠে আচমকা সকলের সামনে জুতোর ঘা পড়েছে।

২. রান্না ঘরে জনশূন্য ক্ষেত্রে হঠাৎই উনুন থেকে পাঁচসের চালের ভাতসহ হাঁড়ি উল্টে পড়া।

৩. সকলের মাঝেই রান্না ঘরের দেওয়াল থেকে বাজারের থলি উড়ে এসে রাধুনির পিঠের উপর পড়া।



৪. কুকুর ছানার শূন্যে লাফিয়ে উঠে ধপাস করে পড়া।

চারটি ঘটনাক্রমই আপাতদৃষ্টিতে অলৌকিক বলে বিশ্বাস হলেও নাস্তিক যুবরাজ এ রহস্যের উন্মোচন করেছে। সাধারণ মানুষের ভাবনার বাইরে গভীর বুদ্ধিমত্তায়, তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তাশীলতায় যুবরাজ সমস্যাগুলির সমাধান করেছে কিন্তু দেশের ধর্মধ্বজাধারী ভণ্ড প্রতারকের দল তাকে নানাভাবে হেনস্থা করতে চাইলে এমনকি মহারাজও প্রাণদণ্ডের হুমকি দিলেও সে ভয়ে পিছপা না হয়ে বরং জয় করেছে। প্রতিকূলতাকে। মহারাজ রাজধর্মে অচল। যুবরাজ এখানে জিতলেন আবার হারলেনও, হারলেন আবহমান মানুষের সংস্কার, অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানুষের প্রচল ধর্মচেতনার কাছে। যুবরাজকে দেশ ত্যাগ করতে হল, বঞ্চিত হতে হল সিংহাসন থেকে। তার ব্যক্তিক নাস্তিকতার ঊর্ধ্বে এখানে রাজনীতি তথাকথিত ধর্মনীতি বড় কথা।

"প্রজাদের দাবি নাস্তিক যুবরাজ দেশে থাকলে তারা হালুম-হুলম পুরীতে আর থাকবে না। তাই প্রজাপালক মহারাজ বিধান হেঁকেছেন—'আজ থেকে যুবরাজকে তিনি ত্যাজ্য পুত্র করেছেন। যুবরাজ যেন রাজধানীতে প্রবেশ না করে।"[৪]

ট্র্যাজিক পরিণতিতে গল্প শেষে যুবরাজের জন্যে সঞ্চিত হয় অস্ফুষ্ট ক্রন্দন। এ অতি বাস্তব। রচয়িতার আত্মদ্রষ্ট অভাবনীয় অভিজ্ঞতার সারবত্তা চমকিত করে তুলেছে গল্প বিষয়কে। এ প্রসঙ্গে গল্পকারের অভিসন্দর্ভ—

"এ গল্প আমার বানাতে হয়নি। সমস্যাকে দেখেছি সামনে থেকে। ব্যক্তি জীবনের ঘটনাবলিকে এখানে রূপকথার ঢঙে তুলে আনা মাত্র। আসলে অনেকদিন আগে আমার গ্রামের একটি বাচ্চা মেয়ের এ ধরনের একটি রোগ হয় এবং তার কর্মকাণ্ডকে কেউ ধরতে পারেনি। আমি এবং আমার সঙ্গে কয়েকজন এ সমস্যার সমাধান করি।"[৫]

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'আলস্য নিবারণী সমিতি—জিন্দাবাদ'। গল্প বিষয় সময়োপযোগী। ২০০২ সালে দেশ জুড়ে গুজরাট দাঙ্গার যে ঢেউ আছড়ে পড়েছিল এবং সময়ের কলঙ্কিত ঘটনাপ্রবাহ, এর যে বিষবাষ্প তা থেকে নিজেদের সরিয়ে আনতে অন্যধারার গল্প বয়ন। শিশু কল্পিত ভাবনা হলেও গল্পের চরিত্রাবলিতে কেউ শিশু নেই। লেখকের ভাবনায় এ গল্প মূলত কিশোরদের জন্যে, শুদ্ধতার জন্যে, দায়বদ্ধতার জন্যে, কল্যাণ ও মঙ্গলময় ভাবনার জন্যে তাদের মনে যুক্তি-বুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায় তথা সত্যের ভাবমর্ম স্থাপনে গল্পকারের চেতন প্রয়াস ও গল্প। গল্পের চরিত্রগুলির নামকরণে আছে হাস্যের ফল্গুধারা। মানুষের সহজাত আলস্যপ্রিয়তা বা আরাম-আয়েসি জীবনধারাকে বদলে কর্মমুখী জীবনের রূপায়ণ করতে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার পর তারা তিনটি সাফল্য লাভ করেছে—

"সমিতির তৃতীয় এবং সব থেকে বড় সাফল্যের খবর পাওয়া গেছে গত সপ্তাহে। দশ ক্রোশ দূরের কুঁড়ের ঢিবি গ্রাম থেকে। গ্রামের নববিবাহিত বধু কঙ্কালি সরকার খাসা কুঁড়ে স্বামীকে কর্মপটু করার মানসে সমিতির হর্তা-কর্তাদের পায়ে কেঁদে পড়েছিল—'একটা উপায় বাতলে দিন বাবুরা',

খাসা কুঁড়ে যখন শুয়ে বসে থাকবে তখনই তুমি সড়সড়ে পিঁপড়ে ধরে সে জায়গায় ছেড়ে দেবে ব্যাস, দেখবে কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

হপ্তা পেরোয়নি। কুঁড়ের ঢিবি থেকে খবর এসেছে খাসা কুঁড়ে এমন দৌড়ে বেড়াচ্ছে আর ফালুক-ফুলুক দেখছে।...."[৬]

গল্প শেষে সমিতির বাৎসরিক সভা। সেখানে সম্পাদক কর্মনারায়ণ দা'র অতিপরে আগমনকে কেন্দ্র করে সমিতির সভ্যদের মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা এবং অবশেষে সম্পাদকের ভাষণ গল্প বিষয়কে অন্য ভাবনায় স্থাপন করছে। গল্পের 'ধৃ' কেন্দ্রের নির্মাণ ঘটেছে এখানেই। এ গল্প আসলে সমসাময়িক কুসংস্কার আচ্ছন্ন সমাজ ও ধর্মে ঊর্ধ্বে মানুষকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার গল্প। সর্গের সভাতে যে সমস্যার মিমাংসা হয়নি তাই মর্ত্যে বিভিন্ন ধর্মীয় দূতেরা ছুটে আসছেন সেই সমস্যার সমাধানে—অর্থাৎ ধর্মীয় সুড়সুড়িতে মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে চাইছেন হিংসা-ধ্বংসাত্মক মনন। কিন্তু গল্পকার একেবারে শুরু থেকে কিশোর মনে ধর্মীয় অপঘাত বা কলুষতার বিরুদ্ধে যুক্তির দ্বার খোলার জন্যে প্রয়োজনীয় আবেগ নির্মাণের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কুঁড়েমি-ঢিলেমি-আলস্য-অপবাদকে ঘোচাতে তারা বেছে নিল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনাবোধকে; বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে সংকীর্ণ, জটিল, ধ্বংসাত্মক ভাবনার বিরুদ্ধে—অশুভ কুটিল প্রবৃত্তিজাত কিছু শক্তিশালী মানুষদের লেলিহান লোভাতুর আক্রোশ থেকে মানুষকে বাঁচাতে সুস্থ সমৃদ্ধময় পৃথিবীর রূপকল্পনায় লেখকের মানস সংগ্রাম এ গল্প।

সোহারাব হোসেনের শিশুসাহিত্যের সর্বোত্তম সৃষ্টি 'ফটিক বারি যাচেরে'। কাব্যনাট্যের আঙ্গিককে রচিত এ নাটক ২০০৩ খ্রীঃ প্রথমে মনোজ মিত্রের সম্পাদনায় 'নতুন নতুন নাটক' গ্রন্থে সংকলিত হলেও পরবর্তীকালে তা 'পুনশ্চ' থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এ নাটকের বিষয় ভাবনা সমকাল ও মানসিক জীবন চেতনা বাস্তবতার অনিবার্য নির্দেশনায় নাট্যরস ঘনীভূত রূপ লাভ করলেও তা এসেছে রূপক এবং সাংকেতিকতার আদলে। শিশুশিল্পীর চমকিত ভাবসুষমায় এ নাট্যবস্তুর নির্মাণ সম্পন্ন হলেও একে শিশুসাহিত্য বলা দুরূহ। এখানে আলগা গোছের মুখরোচক গড়পড়তা ভূত-প্রেত রূপকথা বা হাস্যের ফল্গুধারা নেই বরং আছে উল্টো পথে হাঁটা। কী বিস্ময়কর আখ্যানের বিন্যাস এখানে। পরিবেশকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে মানুষকে। কিন্তু সভ্যতার অবগতির সঙ্গে-সঙ্গে নষ্ট হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে মানবিক সম্ভাবনার জীবন্ত চালচিত্র। তারই বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত লেখক। শিশুদের খেলাচ্ছলে সিরিয়াস বিষয়ের অবতারণা এসেছে। বন-জঙ্গল কেটে তৈরি হচ্ছে কল-পরমাণু নিক্ষেপের কল। যন্ত্রবাদের ধ্বংসাত্মক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই—এ লড়াই অসম।

নাটকের শুরুতে দেখি সকলেই ভূত রাজ্যের বাসিন্দা। কিন্তু সমস্যা অন্য। শিশুদের নিত্যদিনের খেলার মধ্যে বৈচিত্র এসেছে। তারা নব রূপকথার রাজ্য গড়তে চেয়েছে। আরসেই রূপকথার ধারক-বাহক হল মহামন্ত্রী পুত্র সমৃদ্ধ। শিশু কল্পনায় যে সৃষ্টির মন্ত্রগান, তা আসলে ধ্বংসের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, সম্মিলিত লড়াই-এর বাণী। নাটকে দেখি—



সমৃদ্ধর স্বপ্ন = "গাছ ঝড় মেঘ নদী কিছু নাহি হব।
হই যদি হব আমি রূপকথা নব।।"[৮]

সমৃদ্ধের স্বপ্নের ভুবন রূপকথার মতো দেশ। 'সমৃদ্ধ' শব্দের অর্থাভাবে সে বিষয়টিও পরিলক্ষিত হয়। যে দেশে ধনী-দরিদ্র প্রভেদ থাকবে না, থাকবে না অন্ন কষ্ট। সবাই মিলে সমানভাবে ভাগ করে খাওয়ার অংগীকার থাকবে। যেখানে আর্তজনের সেবায় বুক চিতিয়ে লড়বে সবাই। কিন্তু খেলার জগৎ ও স্বপ্ন কল্পনার অতি উচ্চমিনার ভেঙে পড়ে চাতকের সাবধান বাণীতে। চাতক এখানে কোরাসের মতো ভবিষ্যৎবাণী, বা আধুনিক সময়ের মিডিয়াধর্মী সংবাদ পরিবেশন করেছে। নাটকের শুরুতে যে জীবনকথক গান শুনিয়েছে তা সময়ের যন্ত্রণালব্ধ আবাহন গীত, তা ক্রন্দনের আবহে সকরুণ রাগিনীতে বেজে চলেছে চিরন্তন ভাবে—

"ভূতের দেশে মহারাজার আজব ভারী চল।
দেশের মাঝে পুঁতিয়াছেন তেজস্ক্রিয় কল।
... ... ... ... ...
দুঃখে ভরা সেই কাহিনির দুঃখের গাথা শোনো।
ছোট্ট সবুজ হৃদি-পাতায় দুঃখ গীতি বোনো।"[৯]

দুঃখে বোনা সেই গীতি আসলে নব রূপকথা। রাজকন্যে সুমনা নদী হতে চেয়েছে। কুমির-কামোটহীন আঁকা-বাঁকা নদী। আম-জাম কাঁঠালের ছায়ামাখা কল্লোলিনী নদী। যে নদীর সুশীতল জলে ধন্য হবে ধরা। আবার সেনাপতি পুত্র রীতিক হয়ে উঠতে চেয়েছে গাছ। কিন্তু সবকিছু ছড়িয়ে সমৃদ্ধের চিন্তনে এসেছে অন্যকথা। সে সাম্যবাদের কথা বলেছে। শোষকের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই-এর কথা বলেছে। সঙ্গে পেতে চেয়েছে সকলকে—

"উপকথার দেশে যদি যেতে সবে চাও।
এসো তবে আমার সাথে তাহারাই গীত গাও।।"[১০]

হঠাৎই তারা একটি পাখির ডাক শুনেছে। চাতক পাখি, যে আকাশের দিকে তাকিয়ে জল চায়। বাঁচার জন্যে, উষ্ণ নিংশ্বাসের জন্যে দু'দণ্ড জীবনের অক্লান্ত সংগীতের আশায় সে জল চায়, চাতক পাখি কথা বলে। লোককথার অনির্বচনীয় মিশেল। চাতক এখানে কালো বাণী বাহক। সে শুনিয়েছে হতাশার গান। ভেঙে গেছে সমৃদ্ধের নব রূপকথার স্বপ্নের ভুবন। সুন্দর-সুস্থ-সবুজ পৃথিবী আজ রিক্ত-নিঃস্ব মরুময়। মনের রূপকথাকে সরিয়ে চোখ খুলে সত্যের নিঃসীম দাপটে দেখাতে চেয়েছে চাতক। কালের ধারক-বাহক, সভ্যতার বিনাশকারীরা এসে পড়েছে। নিস্তার নেই কারো—

"শোনো ভাই শোনো তবে মনে বড়ো আপশোষ।
পৃথিবীতে আসিয়াছে দুই মুখো রাক্ষস।।"[১১]

কাল রাক্ষসকে জব্দ করতে প্রাণের শব্দকে জাগিয়ে তুলতে হবে। চাকতের নিদানবাণীতে জেগে ওঠে সকলে।

রাজদ্রোহী হয়ে ওঠে। আত্মপ্রবঞ্চনা নয়। বরং অসাম্যের বিরুদ্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে যন্ত্র সভ্যতার ধ্বংসোন্মুখ চেতনার বিরুদ্ধে লড়াই। কাল ভাঙতে চেয়েছে সকলে। কিন্তু রাজশক্তির কাছে সে শক্তি তুচ্ছ মাত্র। হেরে গেছে—বন্দি হয়েছে তারা।

সোহারাব হোসেনের তৃতীয় শিশুসাহিত্য গ্রন্থ "রূপকথার পুতুল' অন্ততপক্ষে পাঁচ বছর পর এ গ্রন্থ প্রকাশিত। এ গ্রন্থে ৩টি গল্প থাকলেও ১টি পূর্ববর্তী গল্প গ্রন্থে প্রকাশিত ('নাস্তিক যুবরাজ')। বাকি ২টি গল্প— 'রূপকথার পুতুল' এবং 'রাক্ষস ও তার তিনবন্ধু' মূলত ভিন্ন গোত্রের দুটি গল্প। বিষয়ের বিচিত্র অভিনেবেশ লক্ষ্য করা যায় 'রূপকথার পুতুল' গ্রন্থে। এখানে রূপকথাধর্মী আলৌকিক মায়ালু রসঘন পরিবেশ সৃজনাই মূলকথা। দেশের নামটিও অদ্ভুত—আঁকা বাঁকা পুরী। মহারাজের নামও তেমনি। রূপকথার প্রথা মেনে বড় রানি দুয়োরানির মতো তিনটি পুত্র নিয়ে বসবাস করে নগরের প্রান্তে—কুঁড়ে ঘরে। অন্যদিকে রাজমহলে সদা বিলাসিনী সুয়োরানি ঈর্ষা কুসুম থাকেন আনন্দ সায়রে নিমজ্জিত। নিঃসন্তান ছোটরানির প্রবল ঈর্ষামূলক বিদ্বেষ ভাবাপন্ন মানসিকতায় রাজা জব্দ হন। সতীন সহ তার পুত্রদের ধ্বংসের গোপন ষড়যন্ত্র লিপ্ত হন ছোটরানি। নিজের মায়াবি রূপমোহে রাজাকে বশে আনে। রাজার পক্ষ থেকে নির্দেশ যায় স্বর্ণহরিণ ধরার। হালুম-হুলুম বনে যেতে হবে। রাজাদেশ মানতে বাধ্য তারা। যাওয়ার আগে বড়রানি পুত্রদের হাতে তুলে দেয় কাঠের পুতুল। পুতুলের সাবধান বাণী ভুলে বনের স্বর্ণহরিণের মায়া জাদুতে বশ হয়ে গেছে বড় রানি। সে ফিরে আসতে পারেনি। চাঁপাফুল গাছ হয়ে থেকে গেছে সে। তার খোঁজে যখন বড় রাজকুমার পথে বেরিয়েছে সেও ভুলে গেছে পুতুলের নির্দেশবাক্য। সেও ফিরে আসেনি। মানবদেহ হারিয়ে সে হল খরগোস। আবার দীর্ঘদিন প্রবাসে মা ও বড় দাদাকে হারিয়ে যখন মেজরাজপুত্র হালুম-হুলুম বনে তাদের সন্ধানে গেছে তখন সেও পুতুলের অভয়মন্ত্র ভুলে গেছে। পরিবর্তে তার অবস্থা হয়েছে পাখি। অবশেষে পথে বেরোয় ছোট রাজকুমার। মনে-মননে অকুতোভয় ভাবনা নিয়ে পুতুলকে সঙ্গে নিয়ে একাগ্র সমাধানে ব্যস্ত সে। মায়াবি ছলনায় সে ভুলে যেতে বসলেও শেষ পর্যন্ত সে জয়ী হয়েছে। আত্মসংবরণ করে উদ্ধার করেছে আত্মীয় পরিজনকে। স্বর্ণমৃগ রহস্য উদ্ধার করে ফিরে এসেছে রাজ মহলে। সকলের সামনে ঈর্ষা কুসুমের মায়ালোক উদ্ঘাটন করে তাকে হত্যা করেছেন। সে আসলে রাক্ষসী। এ গল্প চিরন্তন, দীর্ঘকালীন শিশুমনে তার অবস্থান। রূপকথার পুতুল পরামর্শদাতা বৃদ্ধ, সে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের ধারক। ছোটরানি যেন সাংসারিক গৃহী ক্ষেত্রে অত্যাচরী কুটিল, ঈর্ষাময়ী নারী। আর বড়রানি সব কিছুর পরেও বাঙালি সতীস্বাধ্বী শান্তি প্রিয় সর্বংসহা নারীর প্রতীক। মহারাজ হলেন শান্তিপ্রিয় অর্থবিত্ত সম্পদের অধিকারী সমাজপতি। আর বাঙালির নিত্য-নৈমিত্তিক সাংসারিক জীবনের অনাস্বাদ্য টুকিটাকি এখানে মূল। সেই যেন অলক্ষে সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ। মানুষের মতো কথাবলা, আচার-আচরণ এমনকি



মানুষের থেকে আরেকটু বেশি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দানে পুতুলের কীর্তি বর্ণনায়, দেশজ-লোকজ ভাবনার বয়নে গল্পের বিষয় নির্মাণ চমকিত ও অভিনব হয়ে উঠেছে।

এ গ্রন্থের দ্বিতীয় গল্প 'রাক্ষস ও তার তিনবন্ধু'। গল্পবিষয় অনেকখানি নীতিকথাধর্মী হিতোপদেশের ভঙ্গিমায় সৃজিত হয়েছে। আসলে বাংলা ছোটগল্প সৃষ্টির অনেক আগেই পশু-পাখি জীবকূলকে নিয়ে গল্প লেখার যে প্রচলিত ঢঙ ছিল, বর্তমানে অতি আধুনিক জীবনবিন্যাসের কালেও গল্পকার শিশুমনের উপযোগী করে তুলতে, বিচিত্র বয়ন রীতিতে রচনা করেছেন এ গল্পাখ্যান। এখানে তিন বন্ধুর কথা এসেছে। মনুষ্যেতর তিন প্রাণী, তিন ধরনের তিন প্রকৃতির। স্বভাব ও বেঁচে থাকার ধরন-ধারণও আলাদা। নামের চমক ও বহুল।

**১। লম্বলেজা ঃ** একটা ছোট্ট ইঁদুর। দেহের তুলনায় লেজ অনেকটাই লম্বা বলে নিজ সমাজে তার এমন নাম প্রচলিত।

"লেজটা বেজায় লম্বা বলে ইঁদুর পল্লির সবাই তার অমন নাম দিয়েছে।"

**২। খরচক্ষু ঃ** "একটা আধবয়সী পেঁচা। তার দু'চোখ শুধু রাতে নয় দিনের বেলাতে ও জ্বলজ্বল করে জ্বলে বলে পেঁচা পাড়ার ছেলে বুড়োরা তাকে খরচক্ষু নামে ডাকে।"

**৩। লোম ঝুলঝুলা ঃ** একটা বিড়াল, গায়ে লোমভর্তি, চেহারাতে বালক-বালক, সেকারণে তার নাম লোম ঝুলঝুলা।

এক বহুল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাময় পরিস্থিতিতে খাদ্য সংকটের কালে তাদের বন্ধুত্ব। বাঁচার জন্যে একার মতো করে লড়াইতো মাতোয়ারা ছিল তারা। সেই পরিস্থিতিতে ইঁদুরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সবল পেঁচা ও বিড়ালের লড়াই সেখানে—কে তাকে খাদ্য হিসাবে পেতে পারে। যখন দুজনের কেউ পেল না তখনই লড়াই পৌঁছেছে চরম পর্যায়ে, শেষমেষ ঝগড়ার মিমাংসা করতে এগিয়ে এসেছে ইঁদুর স্বয়ং। সে প্রস্তাব রেখেছে—"বলছি চলো আমারা বন্ধুত্ব করি...তারপর চলো খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি"[১৭] ইঁদুরের প্রস্তাবে রাজি হল দু'জনে। সংকটের মুহূর্তে একে অপরের প্রতি কোন্দলে জড়িয়ে পড়া নয় বরং পারস্পরিক সহমর্মিতায় একে অন্যের সহযোগিতায় অন্যায়কে রুখতে হবে, বাঁচতে হবে—এই বার্তা দিতে তিন গোত্রের তিন প্রতিনিধির বন্ধুত্ব হল। তারপর অনেক আকাশ-নদী-বন-পথ পেরিয়ে এল তিনজনে। জঙ্গল ঘেরা এক গ্রামে দেখা পেল এক মানুষের। সে মানুষের চেহারাও অদ্ভুত—

"লোকটির চেহারা বিদ্‌ঘুটে। ধ্যাবড়া-ধ্যাবা পেশি, লোমশ দেহ, কোদাল-কোদাল দাঁত, ঠেলে, বেরনো গোল-গোল চোখ। দেখলেই ভয় লাগে।"[১৮]

প্রথম পর্যায়ে তারা ভয় পেলেও ভয়কে কাটিয়ে উঠে বন্ধুত্ব হল তাদের সঙ্গে। পথ যাত্রার ক্লান্তিতে তিনজনে ঘুমিয়ে পড়লে তাদের দেখে আনন্দিত হল গজকুমার। ঘুম ভাঙার পর তারা অবাক হয়েছে। অতিথি বৎসল গজকুমার তাদের জন্যে সমস্ত ব্যবস্থা করে

রেখেছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িত অনাহার ক্লিষ্ট জীবনের অবসান ঘটবে যেন। সুখাদ্যের ঘ্রাণে তারা মহা আত্মহারা—

"ঘুম ভেঙে তিন বন্ধু তো অবাক! দেখল মাথার কাছে সাজানো আছে তাদের প্রিয় প্রিয় সব আহার। লম্বলেজার জন্য সুগন্ধীধান, লোম ঝুলঝুলার জন্য একমাত্র দুধ, আর খরচক্ষুর জন্য একটা মরা ছুঁচো।"[১৯]

খাদ্যের লোভ দেখিয়ে, অতিথি বরণে বন্ধুত্ব হলেও গজকুমারের অভিসন্ধি ছিল আলাদা। হিংস্র লোভাতুর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বন্ধুত্বের আগল ঘুচিয়ে গজকুমার তাদের বন্দি করল। তারা গজকুমারের খাদ্যে পরিণত হল। দুর্বলের প্রতি সবলের অধিকতর রূঢ় আচরণ বা শোষিতের প্রতি শোষকের তীব্র আক্রোশ অথবা বলা যেতে পারে খাদ্যের প্রতি খাদকের যে অনিবার্য লেলিহান আর্তনাদ তা যেন প্রত্যক্ষ করল তিনজনে। একে অন্যের খাদ্যবস্তু হওয়া থেকে বাঁচতে সম্প্রীতির বন্ধনে জড়িয়ে পড়া আর এখানে গভীর জঙ্গলে গজকুমারের হাতে তিনজনেই ধরা পড়ল। গভীর সংকটে নিজেদের মধ্যে বাগ-বিতণ্ডা থামিয়ে পথ খোঁজে বাঁচার। এক্ষেত্রেও সেই লম্বালেজাই নিদান বর্তাল। মাটিতে কাঁপনের ইশারা সে পেয়েছে। অর্থাৎ ভূমিকম্প আসছে। মহাপ্রলয়ের ইঙ্গিত পেল সে। বন্ধুদের তৈরি হতে বলল। সাগরের জল এসে সব ভাসিয়ে দেবে অর্থাৎ সুনামি হবে। লম্বালেজার সাবধান বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলল। তার আগে অতীব বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে প্রস্তাব রাখল গজকুমারের কাছে— আমাদের মেরে রেখে তবেই মজুত করো। গজকুমার এ প্রস্তাবে যখন অতি আনন্দিত হয়ে তাদের মারতে উদ্যত হল তখনই সেই মহাপ্রলয় কাল উপস্থিত। লম্বলেজা ও লোমঝুলাঝুলাকে পিঠে চাপিয়ে মুহূর্তেই উড়ান দেয় খরচক্ষু। এ উড়ান জীবনের দিকে। মৃত্যুর ভয়াল গ্রাস থেকে বাঁচার সর্বময় প্রচেষ্টা। বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষিত হল। চরম বিপদের দিনে বেঁচে থাকল তারা। অন্যায় বা দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই তারা দিয়েছে, তেমনি বন্ধুত্বের মধ্যে জটিল-কুটিল মনন নিয়ে স্বার্থপর প্রবৃত্তিময়তাকে ভর করে বেশি দিন চলতে পারে না এ সত্যেরও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এখানে। পশু-পাখির সঙ্গে মানুষের সরাসরি সহাবস্থানে গল্পকায়ায় এসেছে লোকমনস্কতা আর সৃষ্টির চমকিত ঐশ্বর্যে এ গল্প পেয়েছে শিশুসাহিত্যের অনিবার্য শিরোপা।

সোহারাব হোসেনের শিশু সাহিত্যের সংখ্যা মাত্র ছয়টি হলেও ভাব-বিষয়ের বৈচিত্র লক্ষিত হয়। শিশু মনোপযোগী ভাব-বিষয়কে গড়ে তুলতে রোমাঞ্চধর্মী ডিটেকটিভ, বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসময় বা কোথাও লোককথাকে ব্যবহার করে সরস রসিকতা সৃষ্টি করেছেন। সবশেষে বলা যায় গঠনের নানা মাত্রায় চিন্তনের মুক্ত প্রয়াস হয়ে উঠেছে সোহারাবের শিশুসাহিত্য।

ম হু য়া ভ ট্টা চা র্য

## সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন ও সাহিত্যিক আফসার আমেদের কলমে গ্রামবাংলা ও বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের ধার্মিক ও সামাজিক পরিস্থিতি সার্বিক বিশ্লেষণ

আমি প্রচলিত ধর্মমতে বি(্বাস করি না। .....লেখালেখির জগতে জীবন অনেক বড়ো, সেখানে অনেক দায়বদ্ধতা থাকে মানুষের জন্যে, সমাজের জন্যে কিছু করার।*—

সোহারাব হোসেন।

সোহারাব হোসেন বর্তমান সময়ের একজন ব্যতিত্র(মী গ্রামজীবনের কথাকার। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির (ে ত্রে বিষয় নির্বাচনে, চরিত্রচিত্রণে সমাজ ও জীবন সমস্যার অবতারণায় ছিলেন ব্যতিত্র(মী পু(ষ। তাঁর সাহিত্য উপন্যাস গল্পে বারবার উঠে এসেছে ব্রাত্য জীবনের প্রে(াপট। তিনি বাংলা ছোটগল্পে দুঃসাহসিক গবেষণায় তুলে ধরেছেন সমাজের নানান অন্ধকারাচ্ছন্ন দিক যা তাঁর ছেলেবেলা থেকে দারিদ্রের বাস্তবতার সঙ্গে বসবাসের এক সচিত্র ভাবনাময় সাহিত্য সাধনা। তিনি গল্পশিল্পীকে এক বিশেষ ধরণের উড়ান মনে করতেন, যা পরিচিত একটা জীবন কিংবা ঘটনার থেকে অন্য ভূখণ্ডের উড়ান যা গল্পের প্রচলিত সংজ্ঞাকে এক নতুনত্বে উত্তীর্ণ করে গল্পের বোধ-বোধি-মেধা ও সত্যকে করে তোলে উজ্জ্বল। তিনি তাঁর সাহিত্য রচনায় যেমন সমাজ, সমাজের মানুষ ও সমকালীন সময়ের অসুখের পরিচিতিকে করে তুলেছেন প্রাঞ্জল তেমনিই সেই সমাজ, সময় ও মানুষের মনের জটিলতা ও পঙ্কিলতার মুক্তি(র আলো-কেও তাঁর লেখার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন মানুষেরই কল্যাণে। এভাবেই তিনি হয়ে উঠেছেন কাল-সচেতন এক সাহিত্যিক যিনি সমকালীন সমাজের মঙ্গ ল, মানবতার মোড়কে মুড়ে সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠককে বারবার উপহার দিয়েছেন মননশীল পাঠক চেতনাকে জাগ্রত করার জন্যে।

সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের জন্ম ২৫শে নভেম্বর ১৯৬৬ সালে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাট মহকুমার সাংবেড়িয়া গ্রামে হয়। তাঁর বাবার নাম (স্তম আলি সরদার ও মায়ের নাম আমিনা বিবি। চকখামার পাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৭৫ সালে তাঁর শি(া শু(া। ১৯৭৫ সালেই তিনি চতুর্থ শ্রেণীর 'সেন্টার পরী(া'য় বসিরহাট মহকুমার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন ও রাজ্যপালের হাত থেকে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৮২ সালে তিনি ধান্যকুড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৮৪ সালে এই বিদ্যালয় থেকেই উচ্চমাধ্যমিক পরী(ায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তিনি 'গাঙ' নামের একটি সাহিত্য পত্রিকায় দুই-তিন বছর সম্পাদনার কাজও করেন। বসিরহাট মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৭ সালে তিনি সাম্মানিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক হন। কলিকাতা বি(্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ১৯৮৯ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করে স্নাতকোত্তর হন। ১৯৮৮ সালে স্নাতকোত্তর

স্তরে পাঠরত অবস্থায় দৈনিক 'বর্তমান' সংবাদপত্রে আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাংবাদিকতার কাজ করেন। ১৯৯০ সালে লাভ করে বি. এড. ডিগ্রি। বসিরহাট মহাবিদ্যালয়ে ২রা মে ১৯৯১ সাল থেকে ১৮ই মে ১৯৯৩ পর্যন্ত আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে অধ্যাপনা করেন। তাঁর নিজের ছোটবেলার স্কুল ধান্যকুড়িয়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২রা আগষ্ট ১৯৯৩ থেকে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৬ পর্যন্ত শি( কতা করেন। ১৯৯৪ সালে মুনিয়া বারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ৩রা ডিসেম্বর ১৯৯৬ সাল থেকে আমৃত্যু কলকাতার আনন্দমোহন কলেজে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন। ১৯৯৬ সালে তাঁর পুত্র সোহমের জন্ম হয়। ১৯৯৮ সালে কলিকাতা বি(বিদ্যালয় থেকে বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্য জীবন ঃ ১৯০১-১৯৯০ বিষয়ে পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। ২০০৬ থেকে ২০১১ দুই দফায় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শি(া পর্ষদের সভাপতির পদের দায়িত্ব পালন করেন। ২রা মার্চ ২০১৮ সালে এই মহান সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের প্রয়াণ হয়।

সভ্য মানব জাতির সভ্যতার ত্র(মোন্নতির বাহন হ'ল সাহিত্য। সাহিত্য চর্চা ছাড়া কোনো জাতির প( ই উন্নতি করা সম্ভব নয়। সভ্য মানব জাতির ইতিহাস, দর্শন, বিভিন্ন মতবাদ, বিভিন্ন তত্ত্ব, বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল, সংস্কৃতি ইত্যাদি সংর( ণ করা হয় সাহিত্যে। তাই সাহিত্যকে বলা যায় অর্জিত জ্ঞানের আধার বা উৎস। সাহিত্য নতুন জ্ঞান অর্জন, সংগঠন এবং উপস্থাপনের (ে ত্রে প্রচলিত জ্ঞান, যা সবসময় সহায়তা করে থাকে। সাহিত্য সৃষ্টি এক কঠিন প্রত্রি(য়া। এই প্রত্রি(য়ায় যাঁর শৈল্পিক কৃতিত্ব যত বেশী তিনি তত সফলতা অর্জনে স( ম সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। মানুষ ও সমাজের বাস্তব জীবনযন্ত্রণা, জীবনসুখ, জীবনধারাপাত যে সাহিত্যিকের অন্তরে সুস্পষ্টভাবে চিত্রায়িত হয়ে ধরা দেয় এবং সেই চিত্রের প্রত্য( রূপটি যখন সাহিত্যিক অসাধারণ সাবলীলতার সঙ্গে, ভাষার সারল্যের নৈপুণ্যে পাঠকের সামনে পরিবেশনে স( ম হন, তখনই তিনি এক পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক হয়ে ওঠেন। সোহারাব হোসেন ছিলেন এমনই এক পরিপূর্ণ সাহিত্যিক। শতাব্দী লালিত লোক-বি(্বাস, লোকসংস্কার, সংস্কৃতি, ধর্মসাধনার মূল সত্যকে সহজ উপলব্ধিতে ধরে, ভাবনায়, চেতনায়, সমাজ, দেশ, জাতি, শি(া জগৎকে যে আলোক সরণী দর্শিয়েছেন তা একজন সুস্পষ্ট জীবনযোদ্ধার পরিচয়ের প্রতিলিপি। তিনি যা প্রত্য( করেছেন তাই লিখেছেন। ধর্ম নিয়ে আমাদের সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম হাতে খড়ি চর্যাপদে। সেই চর্যাপদে পদকর্তারা সঠিক সময়, জীবনচর্চা, ও সামাজিক চিত্র যেমন সম্পূর্ণ সততার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তেমনি আধুনিক কালের সোহারাব হোসেন কালচিত্রকে সঠিক সততার চালচিত্রে তুলে ধরেছেন।

একটি আলোচনায় 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক ড. বি(্বেবন্ধু ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন—একটি ব্যাপারে সোহারাবের স্পষ্টতা ভালো লাগে। সেটি উপন্যাস এবং ছোটগল্প উভয়ের (ে ত্রেই সত্য। ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি, উৎসব, ফকিরি সাধন পদ্ধতি কোনোটিরই গু(ত্ব তিনি উপে(া করেন না। অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা দিয়ে প্রত্যেকটি বিচার করেন, তথাকথিত



প্রগতিশীলতা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। তাই তাঁকে অনেক সৎ এবং আন্তরিক বলে মনে হয়। চরিত্র গুলিও বি(্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে।*

প্রকৃতপ( সোহারাব হোসেন একজন নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। তিনি একজন শ্রেণিসচেতন লেখক ছিলেন। তাঁর কলমে বারবার তাই কৃষক আন্দোলন, জমি আন্দোলন, ভেড়ি আন্দোলনের নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষের কথা প্রকাশ পেয়েছে সচ্ছন্দ ধারায় যা পাঠককেও শ্রেণিসচেতন করে তুলতে স( ম হয়েছে।

বি(্বায়নের মানদণ্ডে অপরাবিদ্যা অর্থাৎ শুধুমাত্র বিজ্ঞান প্রযুক্তি(র পেশাশি( াকেই প্রাধান্য দিয়ে তাকে প্রকৃত শি( ার আখ্যা দেওয়া হয়। পরাবিদ্যা অর্থাৎ মানবিক মূল্যবোধের জাগরণ, আত্মিক ও মানসিক উন্নয়নের শি( া অচল। সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন তাঁর জীবনবোধের দর্পনে ঔপনিবেশিক শাসন, উত্তর স্বাধীনতা ও আধুনিক গণতান্ত্রিকতার উন্নয়ন ও বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি(র বন্যায় পরাবিদ্যার ছোঁয়ায় প্রতিবিম্বিত করলেন এমন এক শি( ার প্রতিচ্ছবি যা বি(্বায়নের এক নতুন চিত্র তুলে ধরেছে। মানুষকে তিনি দুই রকম প্রে( িতে দেখেছেন। এক—মানুষের নিজস্ব ব্যক্তি(ক-বৃত্ত। দুই—মানুষের জাগতিক-বৃত্ত। তিনি এই দুই বৃত্তের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয় সৃষ্টি করেছেন। গ্রামের মানুষ ও শহরে মানুষের মধ্যে যে আকাশ পরিমাণ পার্থক্য তাও জয় করতে পেরেছিলেন উদারতা, তা(ণ্য, ও গভীরতার সঞ্চয়ে। গ্রামের ও শহরের মানুষের অপ্রাপ্তিজনিত অপূর্ণতাকে এক নব আধুনিকতার স্পর্শে একে অন্যের পরিপূর্ণতার পূরক হয়ে ওঠার শি( ায় শি( িত করে তুলতে চেয়েছিলেন। গ্রাম্যজীবনের আদিগন্ত আকাশের উদারতা, সবুজ( তের মত তা(ণ্যভরপুর প্রাণ আর গভীর জলাশয়ের অতলান্ত গভীরতাকে, শহরের কেতা দুরস্ত, কায়দা সর্বস্ব আধুনিকতার সঙ্গে অসাধারণ বুৎপত্তিতায় গেঁথে এমন এক জীবন মালিকার উদ্ভাবক হয়েছিলেন যা এক শৈল্পিক সৃষ্টির দাবী রাখে। নিজের সন্তানতুল্য ছাত্রদের এই অভিনব মিশেলে করে তুলতে চেয়েছিলেন আত্মস্থ অথচ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক সম্পূর্ণ মানুষ। একজন প্রকৃত শি( ক হিসেবে শুধুমাত্র বিদ্যাশি( া নয়, সর্বপ্রকারে ছাত্রদের নিজের ছত্রছায়ায় আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে শি( কতাকে করে তুলেছেন এক সততা ও আবেগের মহান বৃত্তি যা সুষ্ঠু ও সুন্দর মানুষ তৈরী করার মানবিক যন্ত্র। একজন লেখক বা শি( কের নিজস্ব দর্শন তাঁর লেখায় ও কর্মে ফুটে ওঠে। তাই সোহারাব হোসেন এক জায়গায় একটি সংলাপে লিখেছিলেন—'ভালো মানুষ না হলে ভালো সাহিত্যিক হওয়া যায় না।' সোহারাব হোসেন একজন সত্যিই ভালো মানুষ ছিলেন। নিজের মধ্যে কিভাবে নিজস্ব মৌলিক দর্শন গড়ে তুলতে হয় তা তিনি শুধুমাত্র নিজের জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন তা নয়, এই ভাবনার আবিরের রঙে তাঁর সন্তানতুল্য ছাত্রদেরও রাঙিয়ে গেছেন।

মুসলমান জীবনের কথা এপার বাংলার সাহিত্যে তেমনভাবে ধরা পরে না। স্বাধীনতার পরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের প্রথম প্রবেশ। এরপরে এসেছেন আফসার আমেদ, আবুল বাশার, আনসারউদ্দিন। এরপরে আরও অনেক নবীন

লেখক এসেছেন। সোহারাব হোসেন তাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্র ও অন্যতম। তিনি তাঁর দর্শনানুযায়ী বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। 'সরম আলির ভুবন', 'মহারণ', 'মাঠ জাদু জানে'-র মত উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন অসাধারণ জীবনদর্শন যা তাঁর হৃদয়ের সৃজনশীলতার বীজ থেকে মহি(হে পরিণত হয়েছে উপন্যাসের সাবলীল চলার ছন্দে। 'দোজখের ফেরেশতা' গল্পে ভূমিহীন (েতমজুর সায়েব আলি হয়ে উঠেছে যেন সত্যকার রক্তে(-মাংসের এক জীবন্ত চরিত্র যে মৃতের দেহের কবর দেওয়ার সময় তা থেকে নির্গত গন্ধে বুঝতে পারে যে সেই মুর্দা বেহেস্তে যাবে না দোজখে যাবে। এমনকি সে নিজের মরার সময়ে বুঝতে পারে তার দেহ থেকেও যে গন্ধ বের হচ্ছে তা তাকে নিশ্চিত করছে যে সে দোজখেই যাবে। এভাবেই সোহারাব এক অভিনব কথন শৈলিতে বেহেস্তের মানুষের বাস্তব অস্তিত্বকে মূল্যায়ন করেছেন তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গীতে। দাঙ্গার পটভূমিতে লিখেছেন আর এক গল্প— 'ছায়া প্রলম্বিত'। এক প্রহরীর গল্প যে রাতে এক বড় পুলিশ কর্তার বাড়িতে ডিউটি করে। তার রাত কিভাবে কাটে এই অদ্ভুত চিন্তাধারা থেকে জন্ম নেওয়া গল্পের নাম 'বায়ুতরঙ্গের বাজনা'। 'মহারণ' উপন্যাসে উপস্থাপিত করেছিলেন জমিকেন্দ্রিক রাজনীতিকে, তাতে ফকির দরবেশদের আন্দোলনের ইতিকথাকে তুলে ধরেছিলেন। অসাধারণ সাবলীলতায়, শহরের প্রে(াপটে লিখলেন 'সহবাস পরবাস', 'বদলি বসত'। এই 'বদলি বসত' শহরের ফ্ল্যাট বাড়ির মানুষদের নিয়ে লেখা। তিনি সুফি দর্শনকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন। বাউল-ফকিরদের নিয়ে লিখেছেন তাদের জীবনধারার বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি, তাদের গুপ্ত সাধনার নানা ত্রি(য়াকৌশল যা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে মানবমুক্তি(র সাধনাকে। একই সরলরেখায় ফকিরি আন্দোলন ও মার্কস নির্দেশিত বামপন্থী জমির অন্দোলনকে পথিক করে তুলেছেন। সেখানে রোমান্সের মত বাণিজ্যিক উপাদানের ছোঁয়ায় নয়, বাস্তবতা ও সততার ছোঁয়ায় তা প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। 'গাঙ-বাঘিনি' ও 'দ্বিতীয় দ্রোপদী' দুটি উপন্যাসের পটভূমি সুন্দরবন ও পু(লিয়া। এই উপন্যাস দুটি লেখার সময় তাঁর একটা চোখ প্রায় অন্ধ ও আরেকটি চোখে আংশিক দেখতে পেতেন। তবু তিনি 'Local dialect' পুরো উপন্যাসের ঠিক করার জন্য স্থানীয় মানুষদের সাথে দিনের পর দিন কাটিয়েছেন। কারণ ব্যক্তি(মানুষ সোহারাব হোসেনের অভিধানে 'ফাঁকি' শব্দটির কোনো স্থান ছিল না।

বি(্বের সমস্ত সাহিত্যস্রষ্টার মতই সোহারাব হোসেন একজন সত্যদ্রষ্টা, সংবেদনশীল কবি। যদিও কথাসাহিত্যে ব্যস্ত থাকার দ(ণ তাঁর মাত্র দুটি স্বল্পায়তন কবিতার বই বর্তমান। (১) রক্ত(দেহে অন্যস্বর। (২) বৃষ্টির নামতা। মেধাবী ও কৃতী ছাত্র, উদারমনা মানুষ, প্রণয়মূলক প্রেমিক পু(ষ, তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসুর এক অপূর্ব সমন্বয়ের বীজপর্ব হ'ল 'রক্ত(দেহে অন্যস্বর' কাব্যগ্রন্থটি। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'বৃষ্টির নামতা'য় দেহতত্ত্ব প্রাধান্য পেলেও সংযত তার প্রকাশভঙ্গি।

সোহারাব হোসেনের শিশুসাহিত্য তাঁর পরম মমতায়, গভীর আন্তরিকতায়, ভাবনাময় পন্থায় ও প্রচেষ্টায় হয়ে উঠেছে সজীব ও প্রাণবন্ত। তিনি শিশুসাহিত্য সৃষ্টিতে নতুনত্বের



আহ্বায়ক ও বিবর্তনের পরিচায়ক। তাঁর লেখা 'কল্পত( গল্পত(' (২০০৩), 'রূপকথার পুতুল' (২০০৮), 'ভূতপিসের ডাক' (২০০৯), 'ফটিক বারি যাচে রে' (২০১০), 'জম্পেসদার ভূতপরী অভিযান' (২০১০), 'গুঁফোবুড়োর কান্না' (২০১১) এই ছয়টি শিশুসাহিত্য বিষয়ক গল্প-সংকলন শিশুর কল্পনাবিলাসী সুস্থ মনের সপ(ে মানুষের মত বেঁচে থাকার এক দৃঢ় অঙ্গীকার ও ঘোষণার প্রতিফলন।

'মিথ্যে আখ্যানের কুশীলব' গল্পগ্রন্থে তুলে ধরলেন সোহারাব হোসেন যে একুশ শতকে প্রেম নেই। প্রতি(া নেই। প্রেমের মূল্যবোধ নেই। আধিপত্য বিস্তার করেছে প্রেমের অন্তঃসারশূন্য লাস্যময়ী শরীরীস্পর্শে। আখ্যানের কুশীলবরা যেন লায়লা-মজনুর রক্ত(( রণের সেই প্রেমস্পর্শে পেতে অধীর। এই প্রে(াপটে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সেই শা(্বত সত্য যে, যে শহরে প্রেম-মৃত সে শহরের আখ্যান তো মৃত হবেই। সোহারাব হোসেন এভাবেই আঁকলেন প্রেমের লাশের পোস্ট মর্টেম।

সোহারাব হোসেনের মননে কবিতা ও কলমে গদ্য। এর পরিচয় পাওয়া যায় 'সহবাস পরবাস' গল্পে। সোহারাব হোসেনের সঙ্গীতপ্রীতি বিশেষতঃ বাউলগান ও লালনপ্রীতি তাঁর প্রাণের আরাম, মনের শান্তি হলেও হরিপ্রসাদ, ভীমসেন যোশী, বিলায়েত খান এঁদের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তাঁর মনের (ুধা মেটাতে সহায়কের ভূমিকা পালন করত।

মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি ১০টি গল্পগ্রন্থ, ১২টি উপন্যাস, ১২টি আলোচনা ও প্রবন্ধ গ্রন্ধ ও ছোটদের জন্য ৬টি বই, ৩টি কাব্যগ্রন্থ লিখেছিলেন যা সংখ্যার থেকেও গু(ত্বপূর্ণ তার গুণগত মানে।

সোহারাব হোসেনের এক বিরাট গুণ ছিল নিজে লেখক হয়েও, অন্য অনেক লেখক তৈরী করা। তিনি প্রচুর বন্ধু-বান্ধব, অধ্যাপক বন্ধু ছাত্রের লেখা বই প্রকাশ করিয়েছেন। বর্তমানে বেশিরভাগ মানুষ যখন অন্যকে পেছনে ফেলে স্ব-অগ্রসরে নিমগ্ন তখন সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন সকলকে সঙ্গে নিয়ে চলায় বি(্বাসী ছিলেন, যা তাঁকে পাঠক, বন্ধু, ছাত্রদের কাছে করে তুলেছে দরদী বন্ধু বা পথপ্রদর্শক।

মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন ২রা মার্চ ২০১৮ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে ঈ(্বরাভিমুখী হয়েছেন। তিনি যেমন বাংলা সাহিত্যের একজন বড় লেখক ছিলেন তেমনি অনেক বড় মনের মানুষও ছিলেন। ইতিহাস সচেতন এই লেখকের কাছে ইতিহাস হ'ল অতীত ও বর্তমানের মধ্যে এক অনোন্য কথোপকথন। অতীত বর্তমানকে অভিজ্ঞতায় সুন্দর করে তোলে আর বর্তমান অতীতের শি(ায় শি(িত হয়ে পথ চলে। সাহিত্যিক সোহারাব হোসেনের শি(া আমাদের এভাবেই শি(িত করে তুলবে তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে যা আমাদের ভবিষ্যৎপথকে নিশ্চিতভাবে আলোকিত করে তুলবে।

প্রসঙ্গত্র(মে সোহরাব হোসেনের কথাসাহিত্যে যে ধর্ম এবং আর্থসামাজিক প্রে(াপটে সমাজ ইতিহাসের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সেই একই প্রে(াপটে সাহিত্যিক আফসার আমেদ স্ববী(াকে অসাধারণ মুন্সিয়ানার বাস্তব প্রয়োগে বাঙালি মুসলমান সমাজের সুচিত্র

বর্ণনা এঁকেছেন। তিনি সোহারাব হোসেনের থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও সমকালীন লেখক ছিলেন। কিন্তু তিনিও বাংলা সাহিত্যের এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি(ত্ব। সমাজ ও সময়ের চাপে বিধ্বস্ত নিঃসঙ্গ শিল্পীসত্বাই ত্র(মে আত্মপ্রকাশ করেন লেখক হয়ে, যাঁর কলমের আঁচড়ে কথা বলে সমাজ ইতিহাস। এমনই এক ব্যতিত্র(মী স্রষ্টা হলেন সাহিত্যিক আফসার আমেদ যিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অসঙ্গতির বিপন্নতাকে কলমের কালিতে চিত্রিত করেছেন অসাধারণ আত্মবোধের স্বকীয় রঙে।

আফসার আমেদ বর্তমান সময়ের সাহিত্য পাঠকদের কাছে একটি জনপ্রিয় নাম। অধুনা হাওড়া জেলার কড়িয়া গ্রামে ১৯৫৯ সালে তাঁর জন্ম। প্রায় তিন দশক ধরে তাঁর সেই সহজ-সরল অভিজ্ঞতার মোড়কে মোড়া স্বভাবসিদ্ধ মনোভঙ্গির রচনায় মুসলমান সমাজ এক সত্য আখ্যানশিল্পের মূর্ত সাহিত্য হয়ে উঠেছে। মানুষের বানানো ধর্মের ক্লেদ অতিত্র(ম করে তাঁর লেখনীদর্শনে মানুষই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। সমাজের অনেক সমস্যা বহু পুরোনো কিন্তু সেই সমস্যাগুলির আঙ্গিকে সমাজ বি(ে-ষণ যে নবীন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, তা সর্বাংশে অত্যন্ত আধুনিক। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ধর্মের উপস্থিতি ও সেই ধার্মিক প্রতিত্রি(য়ায় সমাজের প্রে( াপটে সেই সমস্যার তাৎপর্য তিনি তাঁর রচনায় অত্যন্ত সুচা(ভাবে ফুটিয়ে তুলতে স( ম হয়েছেন। মুসলমান সমাজের নিরন্তর নিষ্পেষিত, নারী সমাজ, শুধুমাত্র নারী নয়, পু(ষত্ব কিভাবে ধর্মশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত তা অসাধারণ ব্যুৎপত্তিতায় তিনি তুলে ধরেছেন। সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতার লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে, কালের উষ(তা, কালকূট বা তীব্র বিষ, সুখ, সন্তোষ আবেগ, ব্যর্থতা এই সমস্ত মানবিক অনুভূতির সাহায্যে রচনা করেছেন এক সাহিত্য মালিকা যার মাধ্যমে কাল সংকট, কাল-সংগ্রাম এক নান্দনিক রূপ প্রাপ্ত হয়েছে যা সমাজ ইতিহাসের একটি অত্যন্ত জ(রী বিষয়।

তিনি কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্নাতকোত্তর ব্যক্তি( । ১৯৮২ সালে 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাস দিয়েই তাঁর সাহিত্যজগতে প্রথম পদ( প। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'সানু আলির নিজের জমি', সাহিত্যজগতে সাড়া জাগায়। ১৯৯৩ সালে পেয়েছেন সোপান পুরস্কার, ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত 'ধানজ্যোৎস্না' উপন্যাস অবলম্বনে ২০০২ সালে বি(েবন্দিত চলচ্চিত্রকার মৃণাল সেন 'আমার ভুবন' কাহিনিচিত্র করেছেন। ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা' পাঠকসমাজে এক সম্মানীয় স্থান অধিকারে সমর্থ হয়। ২০০৪ সালে তিনি মঞ্জুস দাশগুপ্ত স্মারক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 'হত্যার প্রমোদ জানি' ২০০৫ সালে প্রকাশিত উপন্যাস যা সমকালীনতার আবহে পাঠক মনে শিহরণ জাগাতে স( ম হয়েছিল। ২০০৬ সালে পেয়েছেন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তি(বাদী সমিতি পুরস্কার। নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন পুরস্কার পান ১৯৯৭ সালে। ১৯৯৮ সালে বাংলা একাদেমি সোমেন চন্দ্র স্মারক পুরস্কার পান। ১৯৯৯ সালে তিনি কথা পুরস্কার পান। আকসার আমেদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমির কাজের সঙ্গে যুক্ত( ছিলেন।



মানুষ সমাজের প্রে( াপটে একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্মের স্থান সর্বজনবিদিত। এই বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে বুদ্ধিসম্পন্ন সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার সারস্বত প্রয়াসে যে সমস্ত কালজয়ী রচনা রচিত হয়েছে তা থেকে ধর্ম ও সমাজের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কের মানুষের মেধা ও মনন আরোও বেশী সুসংস্কৃত ও সুউন্নত হয়েছে। আধুনিক যুগের আটচালায় এই সমস্ত সাহিত্য রচনাগুলির পাতায় পাতায় মানুষের জীবনচিত্র অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও সুচা(ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আমরা জানি মানুষের জীবন ধর্ম ও সমাজ দ্বারা জড়িত ও প্রভাবিত। সাহিত্য মানুষের জীবন পাঠ যার সহায়তায় আমরা পাঠকেরা তৎকালীন ও সমকালীন সমাজের ধর্ম ও তার সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হই। সাহিত্য হ'ল সমাজ দর্শন। বিভিন্ন যুগ ও সেইসব যুগের ধর্ম ও সমাজকে জনগণ জানতে পারে ও বর্তমান সমাজোপযোগী ধর্ম প্রতিষ্ঠার পদ( প, সমাজে ঘটিত অবিচার, অত্যাচার, শোষণজনিত ধর্মসংকট ও ধর্ম দ্বন্দ্ব থেকে সমাজকে যাতে মুক্ত( করে তুলতে পারে, তার জন্য সাহিত্যের গু(ত্ব অপরিসীম। সাহিত্যের মাধ্যমেই আমরা প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন ধর্ম সম্পর্কেও জ্ঞাত হই। ঐতিহাসিক কালের জন্ম নেওয়া বিখ্যাত ধর্মের উপস্থিতি বর্তমানের সমস্ত ধর্মের সাথে পাশাপাশি চলছে বটে কিন্তু তাদের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক অনেকসময়ই অনুপস্থিত। সমস্ত ধর্মগুলির মধ্যে যেমন মিল আছে তেমনিই গভীর বিপরীত মনোভাবও বর্তমান। তবু এদের আমরা ধর্ম বলেই আখ্যা দেই এবং কেন দেই তার ধারণা স্পষ্ট করে সাহিত্য। বিভিন্ন সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্যিক আফসার আমেদ যেভাবে মুসলমান বাঙালি সমাজের বা ধর্মের আরাধ্য, আচার-আচরণ, ধর্মপথ অন্বেষণ ও সুষ্ঠ মুসলমান সমাজ তৈরীতে ব্রতী হয়েছেন, সেই বিষয়গুলি এই প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে প্রতিবেদকের কৌতুহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। তাই এই প্রতিবেদন বা বিবরণীর পথচলা। প্রতিবেদনের সুসংহত অগ্রগতির কারণে এই প্রতিবেদনের ( ত্রে বিষয়বস্তু বি(ে-ষণ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

সাহিত্যে অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ধর্ম ও সমাজ। অতীত সমাজব্যবস্থার ধর্ম, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে কতখানি প্রভাবিত করছে ও ভবিষ্যতে ধর্মের স্থান সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে তা সমকালীন লেখক ও সাহিত্যিক আফসার আমেদের লেখা বিভিন্ন উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্পের মাধ্যমে পাওয়া মুসলমান ধর্মের অবস্থানকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলেছে। পাঠক ও লেখকের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র হ'ল সাহিত্য। লেখক আফসার আমেদ তাঁর সেই সাহিত্যের মাধ্যমে পাঠকের কাছে বাঙালি মুসলমান সমাজকে অত্যন্ত সুচা(ভাবে তুলে ধরার সামাজিক দায়বদ্ধতাকে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। তাঁর মতে পশ্চিমবঙ্গে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গড়ে ওঠার সমস্যা বহুদিনের। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিপুষ্টতার আশ্রয় হ'ল সমাজ সংস্কার, শি( াদী( া বা ব্যক্তি(বিকাশের স্বাভাবিক প্রত্রি(য়ার মধ্য দিয়েই অর্জন করতে হয়। সেই প্রত্রি(য়ার অনুপস্থিতিই মুসলমান সমাজের সঙ্কটের প্রধান কারণ। বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠির মধ্যে হীনমন্যতার অন্তরালে যে ঈর্ষার বীজ

বপিত তা যেমন অযৌক্তি(ক তেমনিই অসুখকর কারণ তা মুসলমান সমাজকে সমাজের মূলস্রোতের থেকে বিচ্ছিন্ন করার এক প্রধান কারণ। মুসলমানরা ভারতবর্ষে সংখ্যালঘু। তাই মুসলমানদের সংখ্যালঘু হিসেবে একটা বাড়তি চাপ বহন করতেই হয়। লেখক আফসার আমেদ ডিসেম্বর ২০১০-এ 'মুসলমান সমাজ নানাদিক' গ্রন্থটিতে বাঙালি মুসলমান সমাজের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ হয়ে, সাময়িকতার উষ(তায়, প্রগতিশীল বিকাশের স্বার্থে যে আত্মকথন করেছেন তা সুষ্ঠু মুসলমান সমাজ সৃষ্টির এক সুন্দর, অভিনব পদ(ে প, বলা যেতে পারে।

মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সমস্যার সাথে অস্তিত্বর(ার সঙ্কট অত্যন্ত প্রকট। কারণ সংখ্যাগু(দের এক অসত্য ধারণা হ'ল—দেশভাগের জন্য মুসলমানরাই দায়ী। ফলে সাম্প্রয়াদিকতার খাঁড়া যেমন ভারতবর্ষের সংখ্যালঘুদের আত্র(মণ করেছিল তেমনি বাংলাদেশের হিন্দু সংখ্যালঘুদের ওপরও নেমে এসেছিল। ভারতবর্ষে বাঙালি মুসলমান মূলত নিম্নবর্গীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মান্তরের ফল। ধর্মান্তরিত মানুষ ত্র(মে নিজস্ব এক ধরণের জন্ম দিয়েছেন যে রূপান্তরে এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের আচার-আচরণে ইসলাম ধর্ম বিশেষ প্রভাব বিস্তারে অপারগ হয়েছে। এই লোকজীবনে পীর-গাজিরা ইসলাম ধর্মের ধার্মিক পুস্তকস্থ প্রবাহ প্রবেশ করাতে চাইলেও পীর-গাজিদের মাজার, দেবমন্দিরের মত পুণ্যস্থান হয়ে উঠেছে যা প্রকৃতপ(ে ইসলাম বিরোধী। বাঙালি মুসলমানদের নিজস্ব পদ্ধতির মধ্য দিয়েই এই ধর্ম প্রচারক পীর-গাজিরা দেবতার স্থান অধিকৃত করেছেন। এই রূপান্তরের মাঝে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও লোকাচারের কৃষ্টির সমন্বয়-দর্শিত হয়।

ইসলাম ধর্মে সামাজিক আচরণবিধি অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা এই আচরণবিধির সঙ্গে অসহযোগীতা করেছে, তার জীবনধারার নিজস্বতা বজায় রাখতে। এর একটা বিরাট কারণ হ'ল আর্থ-সামাজিক অবস্থা। বহু মুসলমান নারীকে সংসারের খাদ্য সংস্থানের জন্য খেটে খেতে হয়। ফলে পর্দাপ্রথা এঁদের ে(ত্রে সংর(িত হয়নি। এঁরা নিয়মমত নামাজও পড়ার সময় করে উঠতে পারেন না। 'বসবাস' উপন্যাসে লেখক বলেছেন—সপ্তাহ দুয়েক হ'ল আকলিমা নামাজ পড়েনি। ছেলে পেটে নিয়ে নামাজ পড়তে কষ্ট হয়। তবে এরকমটাই হয়—নামাজ ধরে, নামাজ ছাড়ে। ছাড়াটা কচির পেচ্ছাপের মত হয়ে যায়। ধরার পেছনে কিছু কারণ থেকে যায়। বড় কারণ স্বপ্ন। স্বপ্নে ভয়, কান্না, সংকট দেখা দিলে নামাজ পড়তে শু( করে। তাছাড়া পাড়ায় কাউকে জিনভূতে ধরলে, কাছেভিতে কোনো মিলাদ মহফিল হলে, কেউ মারা গেলে পড়ে। কিংবা মেয়ে কুটুম এলে ফজরের নামাজ না পড়ে থাকলেও আসর জোহর থেকেই শু( করে দেয়।* তাহলে দেখা যাচ্ছে ইসলামের গোঁড়া ধার্মিক আচরণবিধিকে বাঙালি মুসলমানরা ততটা প্রাধান্য দেন না। তাঁরা আল্লার বাণীতে বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করেন আল্লা যা করেন ভালোর জন্যই করেন। দুনিয়ার জীবন আসল নয়, মৃত্যুর পরেই আসল জীবন। তার জন্য দুনিয়ার জীবনে আল্লার পথে চললেই যে পুণ্য সঞ্চয় হবে তাতে বেহেস্তের সুখপূর্ণ অনন্ত জীবনলাভ হবে। মানুষকে



পরী(া করার জন্যই আল্লা পাঠান। তাই সর্বদা আল্লার এবাদতের পথে নিজেকে চালিত রাখতে হবে যা আসল সুখপূর্ণ জীবনের চাবিকাঠি। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণ থাকবে কিন্তু আচরণবিধির কড়া শাসনে আবদ্ধ থাকতে হবে না। 'প্রেমপত্র' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ লিখেছেন—মুসলমান নর-নারীর একান্ত কর্তব্য এই যে কেয়ামতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভয় রেখে অন্যায় বর্জন করে পুণ্যকাজে আস্থাবান হওয়া।*

ইসলাম নির্দেশিত বিবাহে বাঙালি মুসলমানরা দেশজ লৌকিক আচার-আচরণ যোগ করেছেন যা তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনচিত্রের সংঘর্ষকে গু(ত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কট্টর মুসলমান নির্দেশিত তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ যেমন আইনানুযায়ী হওয়া উচিৎ তা তাঁরা মানেন না। কারণ হ'ল আর্থিক সেই সঙ্গতি বেশীরভাগেরই নেই যার ভিত্তিতে এই কট্টর নিয়ম পালন করা সহজ হবে।

'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্‌সা' উপন্যাসে লেখক আফসার আমেদ বলেছেন—নাসিম নানা কিতাব পড়েছে। কোরাণ হাদিস পড়েছে। সে জানে টানা তিনবার তালাক বললেই স্ত্রী-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এই বিচ্ছেদ হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে তার কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু তালাক না দিয়ে, তালাক প্রচার হওয়ার বিরোধী। সা(ী রেখে তিনবার টানা তালাক দিলেই যখন বিবি ত্যাগ হয়ে যায় এই সরল প্রক্রি(য়ার জন্যই নাসিম বিপদাপন্ন হয়েছে। এটা আর একভাবে বোঝে নাসিম। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস দিয়ে বোঝে না।*

বাঙালি মুসলমানদের লৌকিক জীবনযাত্রাতেই তাঁদের প্রকৃত স্বভাবের চিত্র ফুটে ওঠে। ইসলাম ধর্মে জাতিভেদ অনুপস্থিত। কিন্তু জাতিভেদের স্রোতের বীজ ভারতবর্ষে এমনভাবে লুকিয়ে বংশবিস্তার করছে যে সাতশো বছরেও তা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয়নি। শ্রমবিন্যাসের ভিত্তিতে আজও তার অস্তিত্বের সন্ধান প্রকট রূপেই দৃশ্যমান। মহম্মদ ইয়াকুব আলী 'মুসলমানের জাতিভেদ' গ্রন্থে এ বিষয়টিকে অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন। এই বিষয়টি লেখক আফসার আমেদ তাঁর 'মুসলমান সমাজ নানা দিক' প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

মুসলমান মেয়েদের শি(া সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানরা এখনো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে পিছিয়ে আছেন। সমসংখ্যক ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় এগিয়ে আসছেন না। অভিভাবকেরা সাধারণত মেয়েদের মাধ্যমিক পাশের পরেই পড়াশোনার ছেদ ঘটিয়ে তাঁদের বিয়ের জন্য তোড়জোড়ে বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের মধ্যে উচ্চশি(া তো নয়ই, সাধারণ শি(ার বা নূন্যতম শি(ার আলো থেকেও বেশীরভাগ ে(ত্রে মেয়েরা বঞ্চিত। ফলস্বরূপ উচ্চশি(িত, অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান বাঙালী ছেলেরা মুসলমান মেয়েদের থেকে, বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছে হিন্দু শি(িত মেয়েদের প্রতি। যার উদাহরণ অহরহ সমাজে দেখা যাচ্ছে। 'মেটিয়াবু(জে কিস্‌সা' উপন্যাসে সাহিত্যিক আফসার আমেদ

লিখেছেন—ধর্ম প্রতিষ্ঠানে এক কথায় বিশ-তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে নাম কিনতে পারবে। পাড়ায় একটা মসজিদের জায়গায় দুটো মসজিদ হোক তাতে খুব উৎসাহ, কিন্তু একটা শি( াপ্রতিষ্ঠান গড়তে আসে না কেউ।*

বাঙালি মুসলমানদের লৌকিক জীবনযাত্রাতেই তাঁদের লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস, ক্রি(য়াকর্ম অর্থাৎ প্রকৃত স্বাভাবিক স্বভাব-প্রকৃতি, স্বভাব সুন্দরভাবেই লুকিয়ে থাকে। লেখক আফসার আহমেদের মতে ফোকলোরের অনুসন্ধান সমী( ণের মাধ্যমে সেই সত্যালোকের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। বাঙালি জাতির গভীরতার শিকড়ই বাঙালি মুসলমান জীবনযাত্রা অনুসন্ধানের হাতিয়ার। এই অনুসন্ধানের মাধ্যমেই পরিচিত হওয়া যাবে সেই সব কারণের, যেগুলি এই বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কৃতি, ধর্ম, সমাজকে প্রত্য( ও পরো( ভাবে প্রভাবিত করেছে। সমাজজীবনের বাস্তব রূপ বাঙালি মুসলমানেরা তাঁদের অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি(তে প্রকাশ করেছেন। সমাজজীবনের সমালোচনার দ্বারাই সমাজচিত্রের মর্মোদ্ধার সম্ভব। 'খণ্ডবিখণ্ড' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আফসার আমেদ লিখেছেন—স্বাধীনতাউত্তর সময়ে ছিন্নমূল অর্থঅৎ শিকড়বিহীন সভ্যতার মানুষেরা পূর্ববাংলা থেকে প্রত্যাখ্যাত যাঁরা মূলত শেয়ালদা স্টেশনে আশ্রয় নিয়ে কর্মের জাত-কৌলিন্য ভুলে পূর্বধারা, মধ্যধারা ও নব্যধারায় মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এঁদের ধর্ম নেই। কিন্তু ধর্ম বিশ্বাস আছে। প্রতিদিনের খাদ্যাভাব তাঁদের ধর্মসাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সাম্প্রদায়িকতার মৃত্যু হয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অপূর্ব সম্প্রীতিপূর্ণ মেলামেশায়, শ্রমের মাধ্যমেই এক নি(ছিদ্র ঐক্য সত্য হয়ে ওঠে। মিথ্যে হয়ে যায় দেশভাগ, স্বাধীনতা। এইসব অশি( ত মুসলমানেরা কারিগরি শি( ায় পটু হয়ে ওঠে কারণ স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে সাহেবদের কাছে তখন হিন্দু বঙ্গসন্তানদের নাগাল পাওয়া যেত না কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ(ণ জমিদারি বণ্টন হয়ে হিন্দুদের জীবন শি( া ও অর্থের অনাভাবে সচ্ছল হয়ে উঠেছিল এবং দরিদ্র হিন্দুরা নিজস্ব জাতব্যবসায়ে সন্তুষ্ট থাকতো। ফলে দরিদ্র মুসলমানদের সাহেবরা সহজেই নিজেদের কাজে লাগাতে স( ম হতো। সাহেবেরা তাই এই দরিদ্র মুসলমানদের বাবুর্চি, আর্দালি, কোচোয়ান বানায়। (টি, কেক, বিস্কুট বানানো শেখায়। সভ্যতার অগ্রসরে তাঁদের কাজে লাগায়। যেমন—ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, দর্জি ও সাহেবদের ব্যক্তি(গত কাজ ও প্রশাসনিক কাজে এঁরা অত্যন্ত পটু হয়ে ওঠে। এই বাংলা, ওই বাংলা অন্য দেশ, অন্য রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও মানুষ উৎপাটন বর্তমানেও অব্যাহত যা সেই আদি অখণ্ড বঙ্গদেশের সময় থেকেই প্রবহমান। ফলে বাঙালি মুসলমানদের ধর্ম বোধ যত গভীর ধর্মাচরণ তত গভীর নয়।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে পীর মুরিদানের একটা সম্পর্ক খুব গু(ত্বপূর্ণ। 'ঘরগেরস্তি' উপন্যাসে লেখক আফসার আমেদ বলেছেন—পীর দিব্য চ( দিয়ে দেখতে পান কে কেমন আছে। তাদের জন্য আল্লার কাছে দোয়া চাইবেন। পীর হ'ল আল্লার খাস বান্দা।* অর্থাৎ পীরসাহেব সব অশুভ কাটিয়ে দেন। পীর সকল মুরিদানকে সেইসব নেক রাস্তা দেখান যা আল্লার সাথে সংযুক্ত( হওয়ার উপায়। যেমন—হক্ হালাল খেতে হয়, সৎপথে চলতে হয়,



নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি করতে হয়, চুরি বা পরের ধন দৌলতের ওপর লোভ না থাকা, আল্লাকে বিশ্বাস করা, আল্লা যা দিয়েছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি। দোজখের বা নরকের যন্ত্রণার কথা মনে রেখে উপরোক্ত( নির্দেশাবলী মেনে চলাই ধার্মিকদের একমাত্র উপায়। 'আত্মপরিচয়' উপন্যাসে লেখক দোজখের রূপ বা আল্লার শাস্তির রূপ খুব সুন্দরভাবে এঁকেছেন। আল্লা কি কি শাস্তি দিতে পারে তার বিবরণ মৌলবি সাহেব জানিয়ে দিতে থাকে। এ জীবনটা একটা সওদা করতে আসা, জগতের লোভে হতচকিত হলে চলবে না। সওদা করে নিয়ে যেতে হবে পুণ্য। পাপ আর পুণ্য দাঁড়িপাল্লায় ওজন হবে। যে নেক্কার বান্দা, সে-ই চুলের সাঁকো ( রের ধার ফুলসরাত পার হতে পারবে। যে গুনাহ্ বদি করেছে দু আধখানা হয়ে পড়ে যাবে। যেদিন কিয়ামত আসবে, পৃথিবী ধ্বংস করবে ইসরাফিল তাঁর শিঙা ফুঁকে, সেই কিয়ামতের ময়দানে তাবত মানুষ কবর থেকে উঠে আসবে। তাদের বিচার হবে। মানুষের মৃত্যুর পরে তাকে যখন কবর দিয়ে আসবে, তারপরেই তার শাস্তি দেবে মাটি। দুপাশের মাটি সরে এসে তাকে পিষে মারবে। একে বলে 'গোরাজাব'। কবরেই তার এক শাস্তি। কবরের পর আল্লার এরেস্তা এসে তাকে (হু (আত্মা) দিয়ে জিন্দা করে তুলবে। উঠে বসাবে। তারপর তার জিজ্ঞাসাবাদ। ফেরেস্তা আরবীতে সওয়াল করবে। যে নেক্কার বান্দা হবে সে যথার্থ উত্তর আরবীভাষায় দেবে। যে গুনাগার বান্দা হবে, তার ভাষাতে সে ভুল উত্তর দেবে। তখন তাকে পাতালে নিয়ে গিয়ে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে প্রহার করা হবে। টকটকে গরম শিক দিয়ে কষ্ট দেওয়া হবে। কানে গরম সিসে ঢালা হবে। দোজখের আগুন বড় ভয়ংকর। পৃথিবীর আগুনের সত্তর গুণ বেশি তার তাপ। যে পুণ্য সঞ্চয় করতে পারবে না তাদের ঐ দোজখের আগুনে নি( প করা হবে। পুড়তে থাকবে, কিন্তু মরবে না। অনন্তকাল পুড়তে হবে। তার কোনো লয় নেই, অন্ত নেই।* এই দোজখের থেকে মুক্তি(র উপায় হ'ল বারো বছর বয়স হয়ে গেলেই নামাজ, রোজা তার ফরজ। বারো বছর বয়স হয়ে গেলে ছেলে মায়ের কাছে ও মেয়ে বাবার কাছাকাছি শোয়া নিষেধ। পরপু( ষে মুখ তো দূরের কথা মেয়েদের হাতের নখ পর্যন্ত যেন না দেখতে পায়। তাই বোরখার ব্যবস্থা। কিন্তু বাঙালি দরিদ্র মুসলমান মহিলারা বোরখা কোথায় পাবে? আর বোরখা পেলেও সেই বোরখা পরে কিভাবে ধান ভানা সম্ভব? মেয়েমানুষের গলার স্বর নীচু হতে হবে। যেসব মহিলাদের খেটে খেতে হয় তাদের অনেকসময় অনেক প্রতিবাদও করতে হয় অবিচারের। তাহলে সে( ত্রেও নিয়মের খেলাপ করা হয়।

মহিলারা সম্মানের শিকড় ছোঁয়ার সুখে কিভাবে উদ্বেল হয়ে ওঠেন তা লেখক আফসার আমেদ তার লেখা 'অন্তঃপুর' উপন্যাসে অত্যন্ত সুচারিতায় স্পষ্ট করেছেন। তিনি লিখেছেন—বিয়ে, আকিকা (মুখে ভাত তুল্য) মোসলমানী ধর্মীয় উৎসবে আনন্দে মেতে ওঠে মেয়েরা। ঠিক তেমনি দুঃখের দিনে সকলে সকলের গলা জড়িয়ে কাঁদে। একজনের কান্না আরেক জনের কান্নাকে টেনে বের করে আনে। কেউ মারা গেলে মৃত ঘরের আট দশজন আত্মীয়দের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে সত্তর আশিজন নারী পু( ষকে জড়ো করে। পু( ষরাও কাঁদে। যে কাঁদতে

চায় না তাকেও কাঁদায়। তখন মনে হয় এ কান্না উদ্দিষ্ট মৃতের উদ্দেশ্যে শুধু নয়, এই কান্নায় অনেকের নিজস্ব কান্না মিশে যায়। তাছাড়া এই অনুষ্ঠান একটি অন্যতম অনুষ্ঠান মেয়েদের মিলিত হওয়ার। পরিচিত মানুষদের একসাথে পাওয়ার আনন্দাশ্রু থাকে। আবার দেখা না হওয়ার বেদনাও তাতে মিশে থাকে। সেখানে আত্মসমর্পনের আনন্দ দাম্পত্য পরিচয়কে ছাড়িয়ে যৌথ পরিচয়ের গণ্ডিতে হারিয়ে যায়। মেয়েদের অপূর্ণ জীবনতৃষ(া মনে অশান্তির দারিদ্র, একঘেয়েমি দিনযাপন তাদের মানুষের সাথে, আত্মীয়দের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য তৃষ(ার্ত করে রাখে। পু(ষের বাহিরজীবন আছে যা মেয়েদের নেই। তাই তারা কারো মৃত্যুসংবাদ পেলেই ছুটে আসে, নিজস্ব অপূর্ণতার কান্না কাঁদে যা নারীদের একান্ত, নিজস্ব, সম্মিলিত, সমব্যথিত কান্না। সমব্যথিত হৃদয়ের উৎসব তাই তাঁরা খুঁজে পায় মৃত্যুতে, বাসরে, ধর্মীয় আসরে। জননী-জায়া অতিরিক্ত( জীবন তাদের নেই। তারা স্বামীর শয্যাগ্রহণ করে খাদ্যগ্রহণের মতই। সন্তানের জননী হওয়াই যার মুখ্য উদ্দেশ্য। অথচ আসলে নারী তার নিজস্বতা চায়। যে নিজস্বতার গোপনে বিরাজ করে শিল্পবোধ যা প্রকৃত ও মুখ্য জীবনবোধ।

প্রকৃত জীবনবোধের জন্য চাই প্রকৃত শি(া। তাই অভিন্ন (অর্থাৎ পু(ষ নারী সমান) শি(া ব্যবস্থার পত্তন ও সেই ব্যবস্থায় মুসলমান সমাজকে স্থান করে দেওয়া খুব জ(রী। শি(া হবে উদার, জীবনবোধসম্পন্ন। তাই শি(াত্র(মের ভেতর ধর্মীয় আবেগকে কখনোই প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। শি(ার সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই ঠিকই, কিন্তু শি(ায় ধর্মের উপস্থিতিও অনভিপ্রেত হওয়া উচিৎ। তা নাহলে মুসলমানদের পশ্চাদপদতা তাদের সর্বাঙ্গীন অগ্রসরে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়াবে। মুসলমান মেয়েদের বিশেষতঃ বাঙালি মুসলমান মেয়েদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন অস্বীকার করে স্বয়ংম্ভর হওয়ার মাধ্যমে যতদিন না নিজেরা সরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে নিজেদের সুস্থ অধিকারের প্রতিষ্ঠা করতে স( ম হবেন, ততদিন তাদের সর্বাঙ্গীন সুস্থ উন্নতি অসম্ভব। বাঙালি মুসলমানরা এই সমাজেরই অংশ। তাদের মূলস্রোতের একজন হয়ে উঠতে হবে নিজস্ব ধর্মাবেগরহিত শি(ার মাধ্যমে যা কুৎসিত রাজনীতি ও ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী পদ( প। মূলস্রোতের না হলে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সমস্যার মুখোমুখি হবেন বারেবারে যা অশি(ার আবরণে আবরিত। মুসলমান অর্থাৎ পৃথক বসবাস, পৃথক শি(া-ব্যবস্থা, পৃথক পোষাক, পৃথক ভাষা, কর্মসংস্থান, পৃথক কৃষ্টি, এসবই এক পৃথক পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা যা সংখ্যাগু(র পৃথিবী থেকে বাঙালি মুসলমানদের পৃথক করতে বদ্ধপরিকর। এই পৃথকত্ব জন্ম দেয় কিছু ভ্রান্ত ধারণার যা বাঙালি মুসলমানদের হীনম্মন্যতার অন্ধকারে নিয়ে যায় ত্র(মশঃ। মুসলমান মানেই অপরাধপ্রবণ এ ধারণা সর্ব্বৈব ভ্রান্ত। তাঁরাও সহৃদয়, অতিথিবৎসল, সরল, সাধাসিধে মানুষই হন। কিন্তু সঠিক শি(াবঞ্চিত হন বলে ও সংখ্যালঘু হওয়ার দ(ণ স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্নতা ও হীনম্মন্যতার শিকার হন। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য সংখ্যাগু(দের কিছু দায় থাকে। তবুও সর্বাগ্রে ধর্মাবেগকে প্রশ্রয় না দিয়ে প্রকৃত শি(ালোক প্রাপ্ত বাঙালি মুসলমানদেরই



সদর্থক পদ( প গ্রহণ করতে হবে যা কে ইতিবাচক বাঙালি মুসলমান সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবে।

মধ্যশি(াপর্ষদের উপস্থিতি সত্ত্বেও মাদ্রাসা বোর্ডের উপস্থিতি বর্তমান। যে মাদ্রাসা বোর্ডে ধর্মীয় আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠত্র(মে এক বিদেশী ভাষা আরবিকে প্রাধান্য দেওয়ায় বাঙালি মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ওপর এ এক অতিরিক্ত( বোঝায় পরিণত হয়ে তাদের বিচ্ছিন্নতার অন্ধকারে দিশাহারা করে তুলছে। মূলস্রোতের শি(াব্যবস্থায় যদি মুসলমানদের সাথে অমুসলমানদের শি(াগ্রহণের আছিলায় সম্পর্ক বিনিময়ের মত সুন্দর এক শি(াব্যবস্থা গড়ে উঠতো যা সমস্ত বাঙালি মুসলমান ও অমুসলমানদের এক অভিন্ন মানব সম্পর্কের অনুভূতির সুতোয়, মৈত্রী ও বন্ধনের মালা গাঁথতে স( ম হত, তাহলে সার্বিক সমাজ উন্নয়নের পথও প্রশস্ত হয়ে উঠতো। আলোকপ্রাপ্ত, নবআত্মপরিচয়ে উদ্বুদ্ধ বাঙালি মুসলমানরাই মূলস্রোতের ধারাবাহিকতায় স্নান করে, বিচ্ছিন্নতার অন্ধকার দূর করে এক যৌথ সমাজ গড়ে তুলতে পারবেন, যেখানে বাঙালি মুসলমানরা আর অবজ্ঞার বাতাবরণে জীবন অতিবাহিত করে মানবিকতার অসংগতিকে তুলে ধরবে না। যেখানে অভিন্ন পাঠ্যসূচি ও মেধাবিকাশের ব্যবস্থাপনা উন্নতির সোপান দর্শাবে সকলকে সমভাবাপন্ন হয়ে। বর্তমানে আল্ আমিন মিশন, শিশু বিকাশ একাডেমি, মৌলানা আজাদ একাডেমি এই প্রতিষ্ঠানগুলি ধর্মাবেগকে একেবারে নিশ্চিহ্( না করেও মুসলমানদের মধ্যে শি(া সম্ভাবনার উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়ে এক নবজাগরণের পরিবেশ জাগ্রত করে তুলতে স( ম হয়েছে যার আলোকে বাঙালি মুসলমানদের সর্বস্তরের পরিস্থিতি প্রত্যাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠছে ত্র(মশঃ। বাঙালি মুসলমানদের এই আত্মোদ্যোগ প্রশংসার দাবী রাখে। শি(ায় অংশগ্রহণ জনজাগরণকে ত্বরান্বিত করে তুলতে পেরেছে যা বৃহত্তর সমাজের প্রজ্ঞা ও মনীষার আবরণ উন্মোচনে ব্রতী হয়ে মূলস্রোতের সমাজকে সম্ভাবনাময় করে তুলবে।

সাহিত্যিক আফসার আমেদ মুসলমান সমাজ নিয়েই লিখেছেন। উপন্যাস এমন এক শৈল্পিক রচনা যার মাধ্যমে সমাজ, ধর্ম, মানুষের আশা-আকাঙ্খা রচনাকারের নিজস্বতায়, অখণ্ড সত্তাসন্ধানের দ্বারা পাঠকের দরবারে হাজির হয়ে এক সমগ্র বি(ে ইতিহাসের চিত্র তুলে ধরে যা সেই উপন্যাসের চরিত্র সৃষ্টির নির্যাস। ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার গল্পকার আফসার আমেদ এমন এক অসাধারণ উপস্থিতি সাহিত্য দরবারে, যাঁর হাত ধরে, সমগ্র মুসলমান সমাজজীবন, ধর্মজীবন, মেয়েদের অসহায়তার দিকগুলি সব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। তিনি অসম্ভব নারীবাদী। কিন্তু ধর্মসমাজ পু(ষতান্ত্রিক। কিন্তু তাঁর মতে অর্ধাকাশের কাহিনী সর্বাকাশের কাহিনীর মর্যাদা পাওয়ার উপযুক্ত( নয়। তিনি একজন নিরপে( দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন সাহিত্যসৃষ্টিকালে। তাঁর রচনাশৈলীতে এক অসাধারণ লোককাহিনী ও আবহমানতার বাতাবরণ বর্তমান, আধুনিক মননের প্রে(াপটে। রচনাকারের উদ্দেশ্য সাহিত্যের স্রোতে বয়ে দিকভ্রষ্ট হয়নি। প্রবহমান জীবনের স্বতঃস্ফূর্ততা সাহিত্য নিমজ্জিত হয়ে বি(ে মানবিকতার সন্ধানে রত হয়েছে যা অপূর্ব সাহিত্য রসসিক্ত(।

তিনি একটি বিশেষ সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমান সম্প্রদায়কে নিয়ে লিখলেও এই সম্প্রদায়ের মানুষের যন্ত্রণা, পরাধীনতা, অসহায়তা, নিরপে( ভাবে তুলে ধরার সাথে সাথে সেই মানুষদের মধ্যেই স্বাধীন মানুষদেরই অনুসন্ধান করেছেন যাদের পরিচয় শুধুই মানুষ, নিরপে( মানুষ। তাঁর লেখার বাস্তব জীবনসত্য, প্রত্য( সত্যের চেয়েও তীব্র ও মর্মভেদী হয়ে উঠেছে যা এক আত্মানুসন্ধানের পথিকৃৎ। তাঁর কল্পলোকের কাহিনী কথনে সমাজ সম্প্রদায়ও কথা বলে উঠেছে, যা হয়ত পাঠকেরও আত্মকথন। মিলনের মধ্যেই নিমজ্জিত বিভেদ দূর করার সামাজিক সহজ প্রত্রি(য়া, যা যে কোনো ধর্মের মূলকথা। ধর্মীয় আবেগই সমাজ মানবিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করে। যা যে কোনো সম্প্রদায়ের অভিন্নতার প্রে( াপট। যার আর এক নাম উৎসব। সেই উৎসবেই আবিষ্কার করতে হবে আমার আমিত্বে মিশে আছে পাশের মানুষটির আমিত্ব। তাহলেই আমি ও সে অভিন্ন। এই হ'ল প্রকৃত ঈ(রের বা আল্লা আরাধনা। তাই মানুষকে অবহেলা করাই ঈ(রের অবহেলার নামান্তর। উৎসব হয়ে উঠুক সবার সাথে সবার মিলনস্থল, যা সর্বমঙ্গলের উপাসক। লেখক আফসার আমেদের এখানেই সাহিত্যিক নামের সার্থকতা। নিরপে( , বেনজির, ব্যতিত্র(মী সাহিত্যিক আফসার আমেদ যিনি নিজেই নিজস্ব ে( ত্র সমী( ার ফসল।

পৃথিবীতে সব মানুষ দীর্ঘজীবন নিয়ে আসেন না। সোহরাব হোসেনের হাতে সময় ছিল স্বল্প কিন্তু তাঁর অনন্য সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি হয়ে উঠেছেন কালজয়ী বক্ত(া, শি( ক, অধ্যাপক লেখক কবি ইত্যাদি। তিনি রেখে গেছেন তাঁর অসাধারণ সমকালীন গ্রাম্য ইতিহাস সাথে শহুরেপনার বাস্তব শিল্পিত প্রকাশকে, যা সমাজ ইতিহাসের এক পরিপূর্ণ পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। আবার আর একজন পূর্ণ মান-হুঁশ সম্পন্ন পরিপূর্ণ-সাহিত্যিক মানুষ আফসার আমেদ, যিনি সোহরাব হোসেনের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ্য, তিনি তাঁর রচনার পথে পাঠক-পাথিককে সেই বাস্তব বাঙালি মুসলমান সমাজের ইতিহাসের বৃ( ছায়ার আন্দোলনের দর্শক করে তুলেছেন, যা পাঠক-পাথিকদের পাঠক্লান্তিতে কখনোই ক্লান্ত হতে দেয় না। এমনই ঋজু, দৃঢ় অথচ পল্লবিত সেই সাহিত্যবৃ( । সমাজ ইতিহাসই সাহিত্যের জন্মদাতা। আবার সাহিত্য সমাজ ইতিহাসের দর্পণ বা বাহক। সমাজ ইতিহাস থেকে সৃষ্ট সাহিত্য পাঠকের সম্মুখে সমাজের সঠিক প্রতিচ্ছবি এক সোনালী ফ্রেমে উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরতে সাহায্য করে। এই সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো সমাজচিত্র সাধারণ পোঠক কুলকে সমাজ ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করে তার আগামী জীবনের প্রগতির পথ-উন্মুক্ত( করে থাকে।

সোহরার হোসেনের গ্রামীন বংলার সামাজিক ইতিহাসের প্রে( াপট ও আফসার আমেদের বাঙালি মুসলমান সমাজ ইতিহাসের প্রে( াপটে রচিত তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টি প্রকৃতপ( হয়ে উঠেছে এক মানবিক আত্মানুসন্ধান যা মানুষকে মানুষের কাছের পরমবন্ধু করে তুলতে চেয়েছে, কারণ মানবতার আকালই সমাজের এক গভীর অসুখ। কাল সেই আকালকে চিহ্নি(ত করে দৃষ্টিগোচর করে তোলে মানুষের কাছে। সময় ও সমাজ তাই দুজনের রচনায় হয়ে উঠেছে মানবিকবোধ স্বরূপ বৃত্তের কেন্দ্র।



**আকরগ্রন্থ**


মহারণ, সোহারাব হোসেন, ক(ণা প্রকাশণী, কলকাতা, ২০০৩

মাঠ জাদু জানে, সোহারাব হোসেন, ক(ণা প্রকাশণী, কলকাতা, ২০০৪

সরম আলির ভুবন, সোহারাব হোসেন, ক(ণা প্রকাশণী, কলকাতা, ২০০৪

সহবাস পরবাস, সোহরাব হোসেন, ক(ণা প্রকাশণী, কলকাতা, ২০০৭

বদলি বসত, সোহারাব হোসেন, ক(ণা প্রকাশণী, কলকাতা, ২০০৯

গাঙ বাঘিনী, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, ২০১১

দ্বিতীয় দ্রৌপদী, সোহারাব হোসেন, দে'জ পাবলিশিং, ২০১২

দোখজের ফেরেশতা, সোহারাব হোসেন, রত্নাবলী, কলকাতা,১৯৯৬

বায়ু তরঙ্গের বাজনা, জি জে বুক সোসাইটি, কলকাতা, ২০০২

গল্প সরণি, সোহারাব হোসেন বিশেষ সংখ্যা, প্রকাশক তাপসী দে, কলকাতা, ২০১৯

মুসলমান সমাজ নানাদিক, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং ( কলকাতা, ২০১১

বসবাস, আফসার আমেদ, বাকশিল্প, কলকাতা ১৯৮৮, পৃ ২১-২৫

প্রেমপত্র, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৪, পৃ ১২-৫৭

বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ ৯-১৫, ৩৯-৪৬, ৮০-৭০

মেটিয়াবু(জে কিস্সা, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ২০০৩, পৃ ১১-২৩, ৪০-৪১, ৭১-৭৩, ১৫৪-১৬৩

খণ্ডবিখণ্ড, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ১৯৯২, পৃ ১৯, ৭২-৭৩

ঘরগেরস্তি, আফসার আমেদ, স্বরলিপি, কলকাতা ১৯৮২, পৃ ৩২-৩৫, ৬২-৭২, ১২৩-১২৯

আত্মপরিচয়, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ ১১২-১১৩

অন্তঃপুর, আফসার আমেদ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৩ পৃ ২৮-২৯


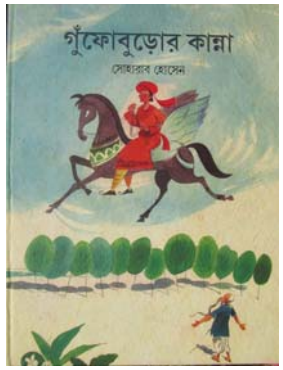

চ ন্দ না  ম জু ম দা র

## সোহারাবের ‘রাজার অসুখ’ ঃ বর্তমান সময়ের রূপকথা

১.

বিশিষ্ট অধ্যাপক এবং কথাসাহিত্যিক সোহারাব হোসেন (নভেম্বর ১৯৬৬—জানুয়ারী ২০১৭)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র। বাংলা ছোটগল্পের উপর গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

সোহারাবের কর্মজীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকায় তিনি সাংবাদিকতা করেছেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

অধ্যাপক এবং সাহিত্যিক সোহারাবের লেখা বিভিন উপন্যাস ‘মহারণ’ (২০০৩), ‘সরম আলির ভুবন’ (২০০৪), ‘মাঠ জাদু জানে’ (২০০৪), ‘সহবার পরবাস’ (২০০৭), ‘রাজার অসুখ’ (২০০৮), ‘বদলি সত’ (২০০৯), ‘সঙ্গ বিসঙ্গ’ (১ম খণ্ড ২০১২ খ্রীঃ, ২য় খণ্ড ১৪২২ বঙ্গাব্দ), ‘গাঙ বাঘিনি’ (২০১১), ‘দ্বিতীয় দ্রৌপদী’ (২০১২) ইত্যাদি।

সোহারাবের বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ ‘বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন’, ‘ছোটগল্প পরিক্রমা’ (১ম), ‘জনজাগরণের উপন্যাস ঃ অরণ্যের অধিকার’, ‘প্রবন্ধ সমীক্ষা’ ইত্যাদি।

সোহারাব তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির জন্য বহুবিধ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। মাত্র ৫২ বছরের জীবনকালে, তিনি তাঁর ছাত্র ছাত্রী এবং সাহিত্য-পাঠকদের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা, সম্মান পেয়েছেন। এমন একজন উদারচেতা, মুক্তমনা, সুবক্তা, ছাত্র-দরদী শিক্ষক এবং এমন কেজন শক্তিমান বাংলা সাহিত্যিকের অকাল প্রয়াণে (জানুয়ারী ২০১৭) খ্রীঃ) গুণমুগ্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা এবং বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ ব্যথিত এবং শোকস্তব্ধ।

২.

‘রাজার অসুখ’ (২০০৮ খ্রীঃ) উপন্যাসে বর্তমানকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যাচারিতা, রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে লেখকের ভাবনার-দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য ও স্বচ্ছতা, প্রকাশের নতুনত্ব আমাদের বিস্মিত করে।

২০০৬ খ্রীঃ ‘বাংলার আভাস’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘রাজার অসুখ’ উপন্যাসটি। পুস্তকাকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রীঃ করুণা প্রকাশনী (কলকাতা-৯) থেকে।

রূপকথার ধাঁচে ‘রাজার অসুখ’ উপন্যাসটি রচিত। এটি রচনার প্রস্তুতি বা প্রাক্ পর্ব প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের ভাবনার পরিচয় পাই উপন্যাসের ভূমিকায় ‘অন্য কথা’ অংশে। লেখক জানিয়েছেন ঃ ‘এ পথে হাঁটার একটা ইতিহাস আছে। খুব সম্ভবত, বছর আট-নয় আগে বারাসাত জেলা-বইমেলা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনা-দুই তরুণ মেলার ক’দিন একটা করে বুলেটিন বের করার উদ্যোগ নিয়ে আমার কাছে হাজির হয়। দাবি—প্রতিদিন অন্তত





একটা করে লেখা দিতে হবে। তাদের চাপাচাপিতেই পেট মোটা শেয়ালকে আশ্রয় করে সময়ের রূপকথা লিখতে শুরু করি।’

সমকালীন সময়ের ঘটনাকে রূপকথার মোড়কে পরিবেশনের সূত্রপাত হল এইভাবে। এরপর সোহারাব এই ধরণের বহু গল্প লিখেছেন। পরবর্তীকালে সেই গল্পগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে মিলেমিশে সৃষ্টি হয়েছে। ‘রাজার অসুখ’ উপন্যাসটি।

সোহারাব তাঁর গল্প-উপন্যাসে রাজনীতির প্রকৃত স্বরূপ, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠা মানুষগুলির মুখ-মুখোশ বদলের ঘটনা তুলে ধরেছেন। দেশের বর্তমান বাস্তব পরিস্থিতিকে, তিনি তাঁর লেখায় শিল্পীত কথাবস্তুতে পরিণত করেছেন।

‘রাজার অসুখ’ রূপকথার কাহিনীর ধরণে রচিত। কাহিনীতে রয়েছে রূপকথার জগতের শুকপক্ষী, টুনটুনি। রাজা হিসাবে পাই সিংহরাজা, পেটমোটা শেয়ালরাজা, দ্বিতীয় শেয়ালরাজা, বোয়াল রাজাকে। মন্ত্রী-সেনাপতি-পুরোহিত পাত্রমিত্র সভাসদ---রাজকবি, বগাবগি—খরগোস-পুতুল ইত্যাদি অবলম্বন এক অন্য ধরনের উপন্যাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন লেখক।

‘রাজার অসুখ’ পঞ্চবটী নামক এক পশুরাজ্যের রূপকথা। রাজার অসুখ, রাজ-রোগের ক্রমবর্ধমান জটিলতা, ফলে রাজার পরিবর্তন। রাজ্য জুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

দেশে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র এসেছে। এরপর গণতন্ত্র ভেঙ্গে এসেছে একনায়কতন্ত্র। ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের পরিবর্তে এসেছে ‘রামরাজ্যে’-র প্রতিষ্ঠা। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-জনকল্যাণ ইত্যাদি খাতে ব্যয়-বরাদ্দ কমাতে কমাতে দেশকে সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। দেশের নারীরা ভোগ্য পণ্যে পরিণত হয়েছে। পরকালে স্বর্গবাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, রাজা তাঁর প্রজাসাধারণকে গভীর অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

পাঠক এখানে যেন যুগপৎ শ্রোতা এবং দর্শক। শুকের ধারা-বিবরণী শুনছেন পাঠক। মনে হচ্ছে, চোখের সামনে ঘটে চলেছে কাহিনীর চরিত্রদের বর্ণময় কার্যকলাপ। চলচ্চিত্রে যেমন আমরা বাস্তব জীবনের নানা ঘটনার চিত্ররূপ দেখি।

‘রাজার অসুখে’ পশু-রাজ্যের রাজনীতির রূপকে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের রাজনীতি-নিয়ন্ত্রিত দেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেছেন সোহারাব। পরমাণু বিস্ফোরণ, নকশাল আন্দোলন, দাঙ্গা, ধর্মীয় অন্ধত্ব, বিশ্বায়ন, পাশ্চাত্য ভোগবাদ, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শীতল সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় কাহিনীতে এনেছেন লেখক।

কাহিনী পরিবেশনে আরণ্যক রূপকথার আদল গ্রহণ করেছেন সোহারাব। প্রতিদিন আমাদের চতুর্দিকে নানা অসঙ্গতি, অনৈতিকতা ও অন্যায় আমরা দেখছি এবং ভুগছি। সিংহরাজা, প্রথম শেয়ালরাজা, দ্বিতীয় শেয়ালরাজা, বোয়াল রাজার কাহিনীতে রাজনীতির ভেতরের গোপন সত্য কিছুটা অতিশয়োক্তির রং-এ রঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন লেখক। তিনি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভেতরের সত্য অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন।

গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সিংহরাজার পতন হয়েছে। রাজা নির্বাচিত হয়েছেন শেয়াল।

সাধারণ পশুরা খুশি হয়ে ভেবেছে, এবার দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু এরপর যা হল, তার জন্য প্রজারা প্রস্তুত ছিলেন না। দেশ সামনে এগোনোর নামে বরং পিছনের দিকে পিছিয়ে গেছে।

এরপর বোয়াল রাজার রাজত্বকালে পঞ্চবটী রাজ্যে, বাস্তবিক অন্ধকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা দেশের নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন— আঁধার মানিকপুর, রাজা তাঁর প্রজাদের জানিয়েছেন : ' ইহজগতে কষ্ট সাধন করে আমরা আঁধারে থাকলে স্বর্গে গিয়ে মানিক হয়ে জ্বলব।' শোষণের নামে জাঁতাকলে প্রজারা নিঃস্ব ও রিক্ত হয়ে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই আলো-আঁধারিতে ভরা বাস্তব-নির্ভর রূপকথা হল 'রাজার অসুখ' উপন্যাসটি।

৩.

উপন্যাসে শুক পাখি অনেকগুলি গল্প বলেছে। (ক) প্রথম গল্প—সিংহ রাজার কাহিনী। পঞ্চবটী রাজ্যের কাহিনী। সিংহ হল রাজামশাই। তাঁর ইচ্ছা, মনুষ্য সমাজের রীতি-নীতি বনের পশু সমাজে প্রচলিত হোক—

'হ্যাঁ পঞ্চবটী রাজ্যের রাজাধিরাজ সিংহ তার কেশর ফুলিয়ে হাঁক দিলেন—'খুব হয়েছে, আর নয়। বনের সমস্ত পশুকে আমি মানুষ করতে চাই। সেটা না-হলে নিদেনপক্ষে মনুষ্য সমাজের রীতি-নীতি চালু করতে চাই।' (পৃষ্ঠা-৯)

রাজসভায় মহারাজের সামনে বসে আছেন মন্ত্রী-সান্ত্রী—পাত্র-মিত্র-সভাসদরা। মহারাজ তার সিদ্ধান্ত সকলকে জানালেন :

'আমি একজনকে মানবরাজ্যে পাঠাতে চাই। কে যাবেন বলুন?' (পৃষ্ঠা-৯)

প্রধান অমাত্য প্রস্তাব করেছেন, বগা-বগীকে পাঠানো হোক। বককে পাঠানোর ক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি—'ওদের গতাগতি সর্বত্র।' আলোচনার পর স্থির হয়েছে, খরগোস বা শিয়াল নয়, মানবরাজ্যে পাঠানো হবে বগা-বগীকে।

পঞ্চবটী নগরে বগা-বগীর যথেষ্ট সম্মান। এর কারণ প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন :

'আসলে বনরাজ্যে সুনীতিরাজ জারির ক্ষেত্রে তাদের যুগান্তকারী গবেষণাই তাদের এহেন সম্মান ও রাজানুকূল্য এনে দিয়েছে।' (পৃষ্ঠা-১০)

মহারাজ তাদের ডেকেছেন। মহামন্ত্রী তাদের রাজাদেশ শুনিয়েছেন :

'কতো উন্নত মানুষের জীবন। পশুপুরের আমরা আর পিছিয়ে থাকতে চাই না। আপনারা যান। গিয়ে মানুষের আদব-কায়দা সভ্যতা-সংস্কৃতির চালচিত্র সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করুন।'

বগা-বগী চলে গেছে পৃথিবীতে মানুষের সমাজে। দুই মহাগবেষক দেশের বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের কাছাকাছি অবস্থান করেছেন। কিন্তু তাদের মানবরাজ্যে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ভালো হয় নি। নেতাদের ব্যঙ্গোক্তিতে তারা অপমানিত বোধ করেছে। তারা পশুরাজ সিংহের কাছে ফিরে গিয়ে জানিয়েছে :



'মহারাজ' মানুষেরা বড়ো চালাক, তারা অতো সহজে তাদের সভ্যতার চাবিকাঠি জানাবে না।' (পৃ ১১)

মহারাজ পশুরাজ্যে মানুষের সভ্যতা আনতে চেয়েছেন। মানব সভ্যতার রহস্য, তিনি জানতে চেয়েছেন। মহারাজের প্রশ্ন : 'কী করলে ঐ সভ্যতার শুলুক জানা যাবে?' উপায় জানিয়েছে বগা-বগী। তারা বলেছে :

'মানবজন্ম গ্রহণ করে! আপনি বর নি! আমরা মানুষের ঘরে জন্মাই.' (পৃষ্ঠা ১১)

রাজার রবে উপকথার বগা, মর্ত্যে লোকেশ রূপধর নাম নিয়ে জন্ম নিয়েছে। তার সঙ্গিনী হয়েছে বগী, পক্ষিণী রূপে। বগার নবজন্ম লাভের কাহিনী শুনিয়েছে কথক শুকপাখী—

'তারপর বলতে শুরু করে—ক্রমশ সিঁড়ি ভাঙতে-ভাঙতে বগা ওরফে লোকেশ রূপধর আজ তাঁর রাজনৈতিক দলের সকলে বড়ো পদটিতে নির্বাচিত হলেন। এক-আধ দিনের নয়, এক-আধ বছরের নয়, প্রায় পঞ্চাশ বছর সততা ও পরিশ্রমের সঙ্গে রাজনীতি করার পুরস্কার পেলেন তিনি।' (পৃষ্ঠা১২)

লোকেশ মানবরাজ্যের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতা পদে উন্নীত হয়েছে। জীবনের কর্মব্যস্ততা বেড়েছে। এতদিন তিনি যা জানতেন না, এবার সেইসব কথা জেনেছেন লোকেশ। দলের ভাবমূর্তির প্রয়োজনে, দলের কর্মীরা তাকে পোশাকের ব্যাপারে সচেতন হতে বলেছে।

কর্মীরা তাকে নিয়ে গেছে পোশাকঘরে। কাজের ধরণ অনুযায়ী, পোশাক বদলাবে। সমাজ সেবামূলক প্রকল্পের উদ্বোধনের সময়, এক ধরনের পোশাক। দলের একটি সংগঠন সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়, এক ধরনের পোশাক। নিজের পরিশ্রমের ক্লান্তি কাটাতে আমোদ-আহ্লাদের সময় আর এক ধরনের পোশাক।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেই জাতীয় পোশাক। সরকার রাখবার বা ফেলে দেবার ষড়যন্ত্রে বসবার সময়, আর এক ধরনের পোশাক। দলের তহবিল বাড়ানোর জন্য দেশি-বিদেশি ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে ঘুষ নেবার সময়, আর এক ধরনের পোশাক।

এসেব শুনে, লোকেশ বিপর্যস্ত। মানবজন্ম পেয়ে, লোকেশ ব্যথিত ও যন্ত্রণাকাতর। তার জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সিদ্ধান্ত :

'আসলে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।.....অ্যাতো দিন যা আঁকড়ে বেড়ে উঠলাম সব তো বাতিল করে দিলো দল। নতুন করে, নতুন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, তো সব লিখতে হচ্ছে!' (পৃষ্ঠা ১৫)

লোকেশ তার দিনলিপির পাতার, ছড়ার মাধ্যমে নিজের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা লিখেছেন। বেশীদিন মানবরাজ্যে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মানবসমাজে এত কুঅভ্যাস ও সততা-নৈতিকতার অভাব, তা গ্রহণ করলে পশুরাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। লোকেশ বলেছে :

'মনুষ্যজন্মে আমার খুব কষ্ট।' (পৃষ্ঠা ১৬)

লোকেশ তার রূপ বদলে বগা হয়ে গেছে। তারা পশুরাজ্যে ফিরে এসেছে। রাজা তাদের বন্দী করেছেন। পশুরাজ্যের সঙ্গে তাদের কথোপকথন নিম্নরূপ :

'—মানে আপনারা পশুরাজ্যে মানবসভ্যতা প্রচলনের বিরোধিতা করেছেন। এটা অন্যায়!

—ক্যানো অন্যায়? মানুষের সভ্যটাই তো নেগেটিভ মহারাজ!

—না হতে পারে না। আপনাদের গবেষণা মিথ্যে!

—না মিথ্যে নয়! সত্যি! (পৃষ্ঠা ১৭)

রাজার মনের মতো 'রিপোর্ট' দিতে তারা রাজী হয় নি। রাজা বগীকে মুক্তি দিয়েছেন। রাজার নির্দেশে, বগা বন্দী হয়েছে।

বগীর মুখে সব শুনে, পঞ্চবটীর পশু-পাখিরা পরামর্শে বসেছেন। অন্যায়ের বিহিত করবার ভার পড়েছে খরগোসের উপর। খরগোস রাজবাড়ির দিকে যাত্রা করেছে—

'মহাকৌশলী খরগোস—দলপতির মহা-কারসাজিতে, তারপর, চৌবাচ্চায় সিংহকে জব্দ করবার জন্য মহারাজ সিংহ তার মধ্যে দিলেন লাফ। অমনি জলে ডুবে নাকানি-চোবানি খেয়ে রাজার অকালমৃত্যু ঘটলো।' (পৃষ্ঠা-১৮)

**(খ) শেয়াল রাজার গল্প**—

শুকপাখি এরপর শুরু করেছে নতুন রাজার গল্প। পঞ্চবটীর সিংহ মহারাজ চৌবাচ্চার জলে পড়ে মৃত্যুর পর, বনের পশুরা একত্র হয়েছে রাজা নির্বাচনের জন্য। পন্ডিত প্রবর মহিষ প্রস্তাব রেখেছেন :

'বংশ পরম্পরায় রাজা হবার দিন আর ফিরিয়ে আনার দরকার নেই। চলুন আমরা রাজতন্ত্র ভেঙে গণতন্ত্রে যাই। অন্য কোনো বংশ থেকে রাজা নির্বাচন করি।' (পৃষ্ঠা ১৮)

বাঘ-হাতি-মহিষ-ভাল্লুক-হায়না-প্যাঁচা সকলে আলোচনায় বসেছে—

'সর্বসম্মতভাবে পঞ্চবটী রাজ্যের প্রথম গণতান্ত্রিক রাজা হয়ে গেলেন শেয়াল।' (পৃষ্ঠা১৯)

শেয়াল রাজা হওয়ার, প্রজারা নানা কারণে খুহী হয়েছে। সুবিধাবাদীরা বলেছে :

'আর আমাদের ভয়ে-ভয়ে থাকবে হবে না। আমরা সময় বুঝে রাজদরদী আর সময় বুঝে রাজবিদ্রোহী হতে পারবে'। (পৃষ্ঠা ২০)

পাশাপাশি দুটি দেশ-পঞ্চবটী জঙ্গল আর পাঁচ-অশথী জঙ্গল। নতুন শেয়ালরাজা জানিয়েছেন :

'আমার প্রথম কাজ হবে পাঁচ-অশথীর সঙ্গে টেক্কা দেওয়া' (পৃষ্ঠা ২১)

মহারাজ শেয়াল মন্ত্রণায় বসেছেন। হঠাৎ নিজের গায়ে হাত দিয়ে তিনি চমকে উঠেছেন :

'একী, তার দেহ তো অ্যামন ছিলো না। গলায়, লেজে তলপেটে বড়ো বড়ো সব লোম এলো কোত্থেকে?..... ফের একবার মহারাজ নিজের গলায় হাত বোলালেন। ফের তিনি চমকে উঠলেন—না কোনও ভুল নয়, তার গলায় পূর্বতন পশুরাজ্যের মতোই কেশর।' (পৃষ্ঠা ২১)



শেয়ালরাজা বিস্মিত। তিনি তাঁর মহাসেনাপতিকে বলেছেন :

'আমার দেহটাকে ঠিক য্যানো আমার বলে মনে হচ্ছে না!....পূর্বতন সিংহের মতোন মনে হচ্ছে।' (পৃ. ২১)

মহাসেনাপতি বলেছেন, এটা মহারাজের কোনো বিভ্রম নয়। এটাই বাস্তব—

'এটাই রাজপ্রথা মহারাজ, পূর্বতন রাজার ধরণ হ্যাং-ওভারের মতোন পরবর্তীতে বর্তায়। (পৃষ্ঠা ২১)

মন্ত্রণাকক্ষে মহারাজ নিজের দৈহিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। তাঁর গলায়, লেজে, পেটে বড় বড় লোম বেরিয়েছে। পূর্বতন পশুরাজের মতো। শেয়ালরাজা তাঁর মহাসেনাপতিকে বলেছেন :

বলেছি পাঁচ-অশথী নিয়ে, তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য পরমাণু বোমা নিয়ে, ফের শত্রুদেশের আভ্যন্তর-কলহে উস্কানি দেওয়া নিয়ে, আলোচনায় বসলে রাজ-ব্যক্তিদের কাঁধে-পেটে-লেজে অ্যামন কেশর জন্মায়। (পষ্ঠা ২২)

মহারাজ দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উপায় আলোচনা করেছেন। সামরিক খাতে ব্যয় দশ গুণ বৃদ্ধি করেছেন।

**(গ) শেয়াল রাজার প্রজার কাহিনী**—

শুকপাখির কাছে টুনটুনিরা শেয়ালরাজার প্রজার কাহিনী শুনতে চেয়েছে। টুনটুনি শুরু করেছে এক নতুন কাহিনী। দর্পহারী নামে এক টুনটুনির কাহিনী।

দর্পহারী এক তরুণ টুনটুনি। তো রাজাকে দর্শন করতে চায়। তার উদ্দেশ্য রাজা-দর্শন করে একটি চাকরী জোগাড় করা।

রাজার দর্শন পেতে গিয়ে, তাঁকে অসংখ্য বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সে নগরপানের দরবারে গেছে রাজ-দর্শনের ছাড়পত্র পেতে। নগরপাল জানিয়েছেন, আগে তাকে মহল্লা-নেতার ছাত্রপত্র আনতে হবে। টুনটুনি চিন্তিত হয়ে পড়েছে—

'মহল্লা নেতা মহারাজনীতিক—দুঁদে রাজনীতিক। তার কাছে ঘেঁসাই দায়, অনুমতি তো দূরের কথা। যদিও বা তার মন কখনও-কখনও সদয় হয় তো তাঁর চ্যালা—চামুণ্ডারা তৈরি করেন মহা-ব্যারিকেড। তাদের হাজারো খাঁই! লাখো বায়নাক্কা।' (পৃষ্ঠা ২৫)

মহল্লা-নেতার ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের সঙ্গে দর্পহারী মেলামেশা শুরু করেছে। তবু তার সাক্ষাতের প্রস্তাব, মহল্লা-নেতার সাকরেদদের অনুমোদন পাচ্ছে না। এক বছর কেটে গেছে। মহল্লা-নেতার প্রধান সাকরেদ একদিন তাকে মহল্লা-নেতার সামনে হাজির করেছে। মহল্লা-নেতা বলেছে—

'আমারও নীচে আছে 'পাড়া মণ্ডল'। ওই করবে ছাড়পত্র মঞ্জুর।..... এটাই দলের রীতি।' (পৃষ্ঠা ২৭)

প্রধান সাকরেদ দর্পহারিকে বুঝিয়েছে যে, তাদের দলের নিয়ম বড় কড়া—

'একেবারে নীচের থেকে 'সিলমোহর' চাই। গ্রাম সংসদের প্রধান গ্রামমণ্ডল যদি দলীয় প্যাডে লিখে দ্যান যে তুমি আমাদের দলকর্মী তবেই মিলবে সুবিধা।'

প্রধান সাকরেদের কথা শুনে, টুনটুনি হতাশ। তার পিতার সঙ্গে সর্দারের সম্পর্ক ভালো নয়। সর্দার খুব অহংকারী—

'বিশেষ করে বর্তমান রাজা ক্ষমতায় বসার পর থেকে সর্দারের দেমাক হয়েছে আকাশবিহারী।'

প্রধান সাকরেদ টুনটুনিকে পরামর্শ দিয়েছে। সর্দারের সঙ্গে তাকে ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি করতে হবে। প্রধান সাকরেদ বলেছে—

'যাও, ব্যক্তি-সম্পর্ক গড়ে তোলো। অতীত কেউ করবে না যাচাই।'

সর্দারের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা শুরু করেছে দর্পহারী। কিছুদিনের মধ্যে তার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে—

মাস-কতক সর্দারের পিছন-পিছন ঘুরে শুধু তার স্তুতি গেয়ে বেড়িয়েছিল।.... সদার তার গায়ে দল—পরিচয়ের সিলমোহর মেরে দিয়েছিলো। আর সে সিলমোহর-বলেই জাদু হয়েছিল। সর্দারের সিলমোহর দেখেই মহল্লা নেতা সরসর লিখে দিয়েছিলেন তাঁর ছাড়পত্র।

দর্পহারী ছাড়পত্র নিয়ে নগরপালের কাছে গেছে। নগরপাল এটি দেখে, লিখে দিয়েছেন অন্তিম ছাড়পত্র।

রাজ-দর্শনের স্বপ্ন পূরণ করতে, রাজবাড়ীতে পৌঁছে গেছে দর্পহারী। ছাড়পত্র দেখে, রাজপ্রহরীরা তাকে ঢুকতে দিয়েছে। তখনও রাজ-দরবারে আসেন নি। মহারাজ—

বেরোন নি তাঁর দেহ, তখনও পুরোপুরি শিয়াল—রাজাতে পরিণতি হয় নি বলে। মাঝে মাঝে তাঁর দেহে যে সিংহরাজ্যের কেশর ও অতিরিক্ত লোমরাজি দ্যাখা যায় তখন যে-পর্ব চলছিলে।....তাঁর দেহের রূপ চেহারা পুরোপুরি তাঁর মতো না—হলে তিনি দরবারে আসেন নি।

মহারাজ রাজ দরবারে বসেন নি।

রাজ-দর্শনের সুযোগ পেতে ব্যাকুল দর্পহারী প্রধান সেনাপতির পায়ে পড়ে ক্রন্দন শুরু করেছে। কোলাহল শুনে, মহারাজ দরবারে উপস্থিত হয়েছেন দর্পহারী বিস্মিত—

'রাজারূপী কাকে দেখছে যে? পুরানো ও নতুন রাজার মিশেল য্যানো।'

মহারাজের দ্বৈত রূপে দেখে ফেলেছে দর্পহারী। ক্ষুব্ধ মহারাজ মন্ত্রণাকক্ষে মহামন্ত্রীকে ডেকে প্রশ্ন করেছেন—

—রাজদরবারে সাধারণ প্রজা ঢুকলো কীভাবে? কার নির্দেশে?

—দলের মহারাজ!—মহামন্ত্রী সবিনয়ে জানিয়েছিলেন।

—কিন্তু আমি তো কোনও দলের নই। আমি তো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মনোনীত রাজা।

—গদিতে বসলেই রাজব্যক্তিরা দলের হয়ে যান মহারাজ।'



মহামন্ত্রী মহারাজকে বোঝালেন, দর্পহারীকে তাড়ালে দলের নির্দেশ লঙ্ঘন করা হবে। তাছাড়া, দর্পহারী ফিরে গেলে, রাজার দ্বৈত রূপের কথা সবাই জেনে যাবে। মহারাজ দর্পহারীকে রাজঘোষকের চাকরীতে নিযুক্ত করেছেন।

মহামন্ত্রী দর্পহারীকে বলেছেন, কৌশলে প্রজাদের কাছে রাজার দ্বৈতরূপের কথা ঘোষণা করতে হবে। দর্পহারী প্রজাদের বলেছে—

'ঘোষণা হলো, আমাদের রাজ্যে এবার থেকে দ্বৈতরাজ ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।..... এবার থেকে রাজ্যে মোদের দু'জন রাজা হবে। একই রাজার দুটো রূপ দেখতে বড়ো জবর।..... তবে কখনো রাজাকে অ্যাখনকার মতোন দ্যাখাচ্ছে কখনও পুরনো রাজার মতোন।

রাজায় দুই রূপের অর্থ প্রদানের বোধগম্য হয় নি। রাজার দুই রূপের অর্থ বোঝাতে, দর্পহারী একটি গল্প বলতে শুরু করেছে।

মহামন্ত্রীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল প্রজারা বলেছে, এসব কথা অপপ্রচার, তারা রাজঘোষককে আক্রমণ করেছে। দর্পহারীর মৃত্যু ঘটেছে। দর্পহারীর মৃত্যুতে মহামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া—

'শেয়ালরাজার দেহে সিংহরাজার কেশর জন্মানোর খবরটা আপাতত চাপা পড়বে।' (পৃ ৪২)

শুকপাখী শেষ করেছে দর্পহারীর গল্প। এরপর শুকপাখী শুরু করেছে। রাজা পরিবর্তন কাহিনী।

**(ঘ) পুতুলপুরের কাহিনী**—

শুকপাখী এবার একটি নতুন কাহিনী শুরু করেছে। পঞ্চবটী রাজ্যের পুতুলপুরের কাহিনী। একটি পুতুল পরিবার—বাবা খাজা, মা গজা, ছেলে মজা।

মজা রাজ-দর্শন করতে চেয়েছে। মজার বাবা-মা তাকে বুঝিয়েছে যে, রাজদর্শন বিপদের—

রাজা ভয়ানক রাগী, আর তার ভয়ানক খিদে। সামনে যাকে পায় তাকে খায়.....। (পৃ ৪৩)

রাজাকে বাবা-মা বোঝায়, সামনে ভোট। রাগী রাজার বদল হবে। তখন সে যেন নতুন রাজার কাছে যায়। মজা বাবা-মাকে বলেছে, সে রাজার বদল ঘটাবে—

"পুতুল নাচিয়ে রাজার বদল করবো।' (পৃ. ৪৫)

দর্পহারীর মৃত্যুর পর, টুনটুনিরা ঠিক করেছে—এই শেয়ালরাজার পরিবর্তে অন্য কোন শেয়ালকে সিংহাসনে বসাবে। মজার উদ্যোগকে, তারা স্বাগত জানিয়েছে। টুনটুনিরা মজাকে উৎসাহিত করেছে—

আগামী ভোটে আসছে দিন।

পুরনো রাজা পাল্টে নিন।। (পৃ. ৪৭)

রাজার নিন্দা করে বিপদে পড়েছে মজা। কতগুলি গুণ্ডা পুতুল তাকে গভীর খাদে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। কোনক্রমে সে প্রাণে বেঁচেছে।

মজার উপর আক্রমণের ঘটনা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পুতুলরা গাইতে শুরু করেছে—

'শোনো শোনো নগরবাসী।

রাজা মোদের সর্বনাশী।।

সাজবো ভীষণ সাজা।

পাল্টে নেবো রাজা।" (পৃ. ৪৭)

প্রজাদের রাজা পরিবর্তনের আলোচনা রাজার কাছেও পৌঁছে গেছে। রাজা কম্প্যুটারের কাছে এর উপায় জানতে চেয়েছেন। তিন নম্বর কম্প্যুটার রাজাকে পন্থা নির্দেশ করেছে—

'আগামী মাসে ভোট ডেকে দিন—রাজা। নির্বাচনের ভোট। ভোট হলেই ব্যাটারা থামতে বাধ্য।' (পৃষ্ঠা ৪৮)

রাজার আশঙ্কা, নির্বাচন হলে তিনি পরাজিত হতে পারেন। বিপক্ষ প্রার্থী জিতে যেতে পারে। তখন তিন নম্বর কম্প্যুটার রাজাকে ভোট-যুদ্ধে কৌশলে জয়ী হবার পথ জানিয়েছেন—

'আমার প্ল্যান এই যে, রাজা নির্বাচনের নামে একটা নাটক করা।....মানে মহারাজ দাবার দান হেঁকে যুবরাজকে বিদ্রোহীদের সমর্থক করে দিন। যুবরাজই হোক নির্বাচনে আপনার কড়া প্রতিদ্বন্দ্বী।.... সেই জিতুক তাতে ক্ষতি কিছু নেই। অথচ দেশের বিদ্রোহ থামবে!' (পৃষ্ঠা ৪৮)

রাজা নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। যুবরাজ চলে গেছেন বিরোধীদের দলে। ভোটে জিতে গেছেন যুবরাজ—

'বড়ো—শেয়ালের পরিবর্তে গদিতে বসেন নতুন শেয়াল। ....সুদিন আসছে ভেবে রাজ্যব্যাপী আনন্দের স্রোত বয়ে গ্যালো।' (পৃষ্ঠা-৪৯)

নতুন রাজা সিংহাসনে বসেছেন। পঞ্চবটী রাজ্যের প্রজারা খুশি। রাজ-দর্শনের আশায় মজা রাজপ্রসাদে যায়। মন্ত্রী বলেছেন :

'রাজা আমাদের নতুন। অ্যাখনও শক্তপোক্ত হয় নিকো। ক'দিন যেতে দাও।' (পৃষ্ঠা ৫১)

রাজপ্রাসাদে যাতায়াত করতে করতে বছর কেটে যায়। একদিন মন্ত্রী মজাকে রাজ-দর্শনের সুযোগ দিয়েছেন। মজা গান শুনিয়েছে রাজাকে। রাজা বলেছেন : 'যদি আর একটু কাছে এসে গাও, তো তৃপ্তি পাই।'

মজা খুশি হয়ে রাজার কাছাকাছি গেছে। রাজা তাকে হাতের মুঠোয় ধরে বলেছেন—

'মুখের ইয়াব্বড়ো গর্ত।

প্রজায় খাবো কড়-মড়মড়, নেই যে কোনও শর্ত।'

রাজা মুখ বড় করেছেন। মজাকে ভক্ষন করেছেন রাজা। টুনটুনিরা সব দেখেছে



রাজবাড়ির কার্ণিসে বসে। রাজার মজা-ভক্ষণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। টুনটুনিরা প্রজাদের জানিয়েছে—

'মনেতে নেই সুখ।

রাজার সদাই লাখে ভুখ্।।

এ যে রাজতন্ত্রের যোগ।

এ যে মহারাজের যোগ।" (পৃষ্ঠা ৫৩)

দেশে প্রজা-বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। মহারাজ শেয়াল বলেছেন, তিনি বিক্ষোভ-দমনের জন্য প্রজাদের মনোভাব বুঝতে চান। তাই তিনি ছদ্মবেশে দেশ—ভ্রমণে বেরোবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

নতুন শেয়াল-রাজা দেশভ্রমণে বেরিয়েছেন। তার সঙ্গে শুধু কয়েকজন মন্ত্রী। রাজা পেট ভরে খেয়ে পথে নেমেছেন। কিছু সময় পরেই রাজার খিদে পেয়েছে। রাজা মহামন্ত্রীকে বলেছেন—

'যেখানে যতো অন্যায়কারী দেখবো তাদের খাবো আমি। তালে খিদেও মিটবে আরে দেশ দ্যাখাও হবে।' (পৃ. ৫৫)

পথে খোরগোসেরা রাজার 'গদি উল্টে দেবার পরামর্শ' করছিল। রাজার পরনে সাধারণ মানুষের পোশাক। খরগোসরা ছদ্মবেশীয় রাজাকে বলেছে—

দেশে 'রামরাজ্যি' আনবো বলে আমরা সিংহরাজকে হটিয়েছি, বুড়ো-রাজাকে হটিয়েছি। কিন্তু অ্যাখন দেখছি যে কে-সেই! দেশের শিক্ষা-দীক্ষা, রাস্তা-ঘাট, হাসপাতালে, অফিস-কাছারি, সবকিছুই রসাতলে যেতে বসেছে।' (পৃষ্ঠা ৫৬)

নতুন শেয়াল রাজার সমস্যা হ'ল রাজার পেটে খুব খিদে। তিনি খরগোসদের 'রাজদ্রোহী', 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মহারাজ খরগোসদের খেয়ে নিয়েছেন।

খরগোসদের খেয়ে, রাজারপেট ফুলে গেছে। পথে হরিণরা রাজার চেহারা দেখে রাজাকে 'পেটমোটা', 'পেট-বাহাদুর' বলেছে। ক্ষুব্ধ রাজা হরিণদের খেয়ে নিয়েছেন। রাজার পেট আরো ফুলে গেছে।

রাজার তবু খিদে কমছে না। রাজা মন্ত্রীকে বলেছেন—

'কী যে হলো আমার! খিদেটা কমার বদলে বাড়ছে।' (পৃষ্ঠা ৫৮)

নগর-পরিক্রমাকালে রাজা দেখেছেন, পথের ধারে প্যাঁচারা ধর্মের নিন্দা করছে। তারা শেয়াল-রাজার নিন্দা করছে। রাজার পেট দেখে তারা রাজাকে 'ভুঁড়ো ধার্মিক' বলেছে। ক্রোধে রাজা প্যাঁচাদের মুখে পুরে নিয়েছেন। ফলে মহারাজের পেট আরো ফুলে উঠেছে।

ফেরার পথে, যেখানে রাজা তাঁর নিন্দা শুনতে পেলেন, সবাইকে পেটে পুরে নিলেন। মহারাজ যখন রাজবাড়িতে ফিরে এলেন, তখন তাঁর পেটের মধ্যে হাজার-হাজার প্রজা। তিনি পেট নিয়ে চলতে পারছেন না। রাজার অবস্থা দেখে টুনটুনিরা গান গেয়েছে—

'পেটমোটা রাজারে।

মানুষ খাবার সাজা রে।। (পৃ. ৬০)

রাজ্যে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে যে রাজা অসুস্থ। শেয়াল রাজা কথা বলতে পারছেন না। তাঁর শ্বাসকষ্ট বাড়ছে—

'...রাজার পেট যতো মোটা হচ্ছে ততোই পেটের মধ্যে কীসের য্যানো অ্যাকটা সুরধ্বনি গুমরে-গুমরে-গুমরে উঠছে।.....অনেক মর্ত্য-মানুষের প্রতিবাদী মিছিলের মতো যৌথ কোরাস ব্যানো।' (পৃ. ৬১)

চিকিৎসকের এসেছেন। শল্য-চিকিৎসক বলেছেন, রাজার পেটে অস্ত্র করতেহবে—

'...আপনাদের দেশের নিয়মতন্ত্রের ফোঁকল গলে দেশের সমস্ত দুষ্ট লোকেরা রাজপেটে ঢুকে পড়েছে। তারা পেটে লাফালাফি করছে। কুশ্বাস ফেলছে।' (পৃ. ৬৩)

বিদেশ থেকে আসা শল্য চিকিৎসক রাজার পেটফোলা কমাতে উপায় নির্দেশ করেছেন। সেইসঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন—

'বিপদটী এই যে, ঐ সমস্ত লোককে একে একে বের করতে যতো সময় লাগবে ততো সময় ধরে অস্ত্র করলে রাজা অক্কা পেয়ে যেতে পারেন।' (পৃষ্ঠা ৬৩)

রাজবাড়িতে নেমেছে— শোকের ছায়া। টুনটুনিরা উড়ে যাবার সময় ছড়া বলেছে—

'গরিব পুরুত নেবেই নেবে সিংহাসনের দখল।'

টুনটুনিদের কথা শুনেছে 'গরিব পুরুত'। সে রাজবাড়িতে এসে জানিয়েছে, রাজাকে সুস্থ করে দেবে। পুরোহিত জানিয়েছে, দুটি শর্তে সে রাজাকে বাঁচাবে—

'.....শর্ত নম্বর এক, রাজার পেট যতোটা ফুলেছে ঠিক সেই মাপে আমার পেটের উপর মণিমাণিক্য বেঁধে ফুলিয়ে দিতে হবে। আর শর্ত নম্বর দুই, জ্ঞান ফেরার পর রাজামশাই আমাকে অ্যাকটা বর দিতে বাধ্য থাকবেন।' (পৃষ্ঠা ৬৪)

সকলে পুরোহিতের শর্তে রাজী হয়েছেন। পুরোহিতের পেটে, মণি-মাণিক্যের বোঝা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পুরোহিত বলেছেন—

'রাজার পেটে হল্লা কণা মানুষগুলোর প্রাণ-ভোমরা লুকিয়ে আছে বিশেষ-বিশেষ সম্প্রদায়ের পশু-পাখির দেহে।....ঐসব পশু-পাখিগুলোর মধ্যে কৌশলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া হোক।' (পৃ. ৬৫)

পুরোহিত জানিয়েছে, বাইরের পশুপাখির মৃত্যু হলে রাজার পেটের ভিতর মিছিল করা পশুপাখিগুলিরও মৃত্যু হবে। ওরা মারা গেলে, রাজার পেট থেকে পচে-গলে বেরিয়ে যাবে। তখন রাজার রোগমুক্তি ঘটবে।



রাজার পেট ফুলেই চলেছে। রাজাকে বাঁচাতে, প্রজাদের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দিয়েছেন সেনাপতি। লাখ-লাখ জীবজন্তু, পশুপাখীর মৃত্যু হয়েছে।

মহারাজের পেট কমে গেছে। পুরোহিত এরপর শেয়াল-রাজার কাছে একটি বর প্রার্থনা করেছে—

'এবার থেকে সেখানেই যতো রাজা সিংহাসনে বসবেন, তাদের নিয়ন্তা হবে পুরোহিতরা'. (পৃষ্ঠা ৬৫)

শেয়াল-রাজা, পুরোহিতের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। টুনটুনি পাখীরা এরপর গান ধরেছে—

'শেয়াল নামের পুরুত -ঠাকুর লম্বা-ভীষণ হাত...'। (পৃষ্ঠা ৬৭)

রাজা মহাঅসুখ থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। রাজবাড়িতে তাই উৎসব পালিত হচ্ছে। রাজার চিকিৎসায়, দেশের স্বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষিত। অর্থমন্ত্রক উৎসব বন্ধ রাখতে চেয়েছে। কিন্তু পুরোহিত রাজী হন নি। [.] মহাপুরোহিতের কথা মেনে নিয়ে, মহারাজ শেয়াল বলেছেন—

'দেশের শিক্ষাখাতে যে অর্থ মজুত আছে তা দিয়ে উৎসব চালানো হোক।' (পৃষ্ঠা ৬৭)

[শেয়ালশরণ ইতিমধ্যে পুরুত থেকে মহাপুরুত হয়ে গেছেন।] প্রজারা অখুশী। রাজ্যে নানান সমস্যা। শিক্ষাখাতের অর্থ উৎসবে ব্যয় হবে, দেশের অনেক প্রজা তা মেনে নিতে পারেন নি—

'স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রাজাদেশের বিরোধিতা করে বিবৃতি দিয়েছেন। পিছড়ে বর্গ বলে পরিচিত হস্তী সম্প্রদায় এর মধ্যেই লাগাতার ধর্মঘট ডেকে তীর ছুঁড়ছে...।' (পৃষ্ঠা ৬৭)

মহাপুরুত শেয়ালশরণ জানিয়ে দিয়েছেন—

'অ্যাখন থেকে দেশে ধর্মশিক্ষাই একমাত্র শিক্ষা হবে।'

শেয়াল-রাজা তা সমর্থন করেছেন।

প্রজাদের বিদ্রোহ দমনের উপায় আলোচনায় বসেছেন মহারাজা। মহাপুরোহিত পথ নির্দেশ করেছেন—

মহারাজ আপনার পেট থেকে অসুখের সময় যে সমস্ত মরা-পচা জীবজন্তু বের হয়েছে, সেই সব বিষাক্ত গলিত পুঁজ রাজদরবারের গুপ্ত কক্ষে রাখা আছে। দূষণ কক্ষে বসে-বসে ওরা বিদ্রোহের গান পাইছে...। এ ভয়ঙ্কর বিষ।' (পৃ. ৬৯)

গোপনে এই বিষ ছড়িয়ে দিতে হবে। মহাপুরোহিতের মন্ত্রণা শুনে, বিষাক্ত পুঁজ-রষের স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে। গলিত বিদ্রোহী পুঁজ রক্ত ছড়িয়ে পড়ে দেশের অবস্থা ভয়াবহ—

'একদিকে বিষাক্ত দুর্গন্ধ নিরীহ প্রজাদের জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে সেই অদ্ভুত সুর আরও-আরও প্রজাদের মনে উদ্দাম শক্তির সঞ্চার করছে। অ্যামন চললে সারা দেশে গণ-অভ্যুত্থান অনিবার্য।' (পৃষ্ঠা ৭০)

শেয়াল-রাজা গদি হারানোর ভয়ে অস্থির হয়েছেন, বিদ্রোহীদের পরাজিত করার উপায় বলেছেন মহাপুরোহিত—

'ঐ বিষ-সঙ্গীত মরবে মাত্র অ্যাকটাই বানে। তা হলো আমার উদয়। আমার নাম নাম বোয়ালশরণ। আমি ঐ বিষ শুষে নেবো।' (পৃষ্ঠা ৭০)

মহাপুরোহিত বিষ শুষে নিয়ে, দেশকে পবিত্র করবেন। তবে তার একটি শর্ত আছে—

'এর বিনিময়ে, হে মহারাজ' দেশের সেনাবাহিনীর ভার আমার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।' (পৃষ্ঠা ৭১)

বোয়ালশরণের কথা শুনে। বিরক্ত শেয়ালরাজা বলেছেন— 'সেনাপতির তবে কোন কাজ থাকবে?' বোয়ালশরণ জানিয়েছেন— 'সেনাপতি কেবলই আমার নির্দেশ পালন করবেন।' শেয়ালরাজা এই প্রস্তাব মানতে পারেন নি।

সারা দেশ থেকে উঠছে চিৎকার—হাহাকার, প্রজারা রাজবাড়ির দিকে ছুটে আসছে। প্রধান সেনাপতি মহারাজকে বলেছেন :

'আপনি মহা পুরোহিতের শর্ত মেনে নিন। নইলে আমি-আপনি কেউ বাঁচবো না। প্রজা-বিদ্রোহের সামনে সব শেষ হয়ে যাবে, মহারাজ!' (পৃষ্ঠা ৭১)

নিরুপায় হয়ে শেয়াল-রাজা সম্মতি দিয়েছেন। মহাপুরোহিত বোয়ালশরণ এরপর নিজের মুখের চোয়াল দুটি বিস্ফারিত করেছেন—

'একসময় তিনি চোয়াল চেপে ঢোক গিললেন। সঙ্গে-সঙ্গে সমস্ত দুর্গন্ধ ও সেই অদ্ভুত সঙ্গীত এক লহমায় কোথায় য্যানো মিলিয়ে গ্যালো। দূষিত পুজ-রক্তে মহাপুরুতের পেট ফুলে উঠল।' (পৃষ্ঠা ৭১)

এরপর মহাপুরোহিতের পোশাক খুলে, রাজ পোশাক পরোছে বোয়ালশরণ। তিনি রাজা সিংহাসন দখল করেছেন।

**(ঙ) রাজা বোয়ালশরনের গল্প**—শুকপাখি এরপর বলেছেন বোয়ালশরনের গল্প। সেনাপতিও সেনাবাহিনীর সাহায্যে গদি দখল করেছেন বোয়ালশরণ। পঞ্চবটী দেশের মহারাজ শেয়াল, রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্যদের নেতাদের বন্দী করে কারাগারে পাঠিয়েছেন বোয়ালশরণ—

'আজ মাঝরাতে এক নির্বিরোধ ও রাজপাতহীন অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাজক্ষমতা দখল করে নিজেই রাজাধিরাজের আসনে বসেছেন।' (পৃষ্ঠা ৭৩)

পরদিন ভোরে রাজ্যবাসী শুনেছেন যে, রাজ্য পরিবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয় শেয়ালরাজার অপশাসনে' সকলে ক্ষুব্ধ ছিল। নতুন রাজা পেয়ে তারা খুশি। রাজা বোয়ালশরণ জানিয়েছেন—

'অ্যাখন থেকে পঞ্চবটীতে একটিই ধর্ম চালু থাকবে। সে রাজধর্ম সকলকে পালন করতে হবে।... এদেশে এবার থেকে একটিমাত্র ভাষা থাকবে। রাজ ভাষায় সবাইকে কথা বলতে হবে.....।' (পৃষ্ঠা ৭৪)

পাত্রমিত্ররা সকলে বলেছেন, এই দেশ বহু ধর্মের বহু ভাষার দেশ। অন্য ধর্ম, অন্য ভাষার মানুষেরা এই আদেশ মানতে রাজী হবে না। রাজা বোয়ালশরণ বলেছেন, সব প্রজা



রাজার আদেশ মানতে বাধ্য। যারা বিধর্মী বা রাজবিদ্রোহী, তাদের কড়া হাতে দমন করা হবে বা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে নতুন রাজা বোয়ালশরণ তাঁর রাজ্যশাসনের নীতি সম্পর্কে বলেছেন—

'দেশের শিক্ষা-প্রযুক্তি—অর্থ ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ করা টাকার মোট অংশ অ্যাখন থেকে আধ্যাত্মখাতে ব্যয় করা হবে.....।' (পৃষ্ঠা ৭৫)

রাজা বোয়ালশরণ বলেছেন,দেশের উন্নয়ন নিয়ে প্রজাদের ভাবনার প্রয়োজন নেই। মৃত্যুর পর, প্রত্যেক প্রজা নিশ্চিতভাবে স্বর্গে যাবে—

'রাজা দেশের বিরোধিতা করলে গর্দান যাবে সবার। ভগবানের সঙ্গে আমার চুক্তি পাকা। এ দেশের সবাইয়ের জন্য স্বর্গের ব্যবস্থা করে দিয়েছি আমি। সবাই স্বর্গ পাবে।' (পৃষ্ঠা ৭৫)

নতুন রাজার রাজত্বে কেউ রাজভাষা, রাজধর্মের বিরোধিতা করতে পারবে না। শুদ্ধি উৎসব শুরু হবে। পনেরো দিন ধরে চলবে। রাজা বোয়ালশরণ বলেছেন—

'বিগত রাজ-পেটের পুঁজরক্ত খেয়ে আমার দেহ দুর্গন্ধ হয়েছে। দেশের সমস্ত মজুত অর্থের বিনিময়ে এ দেহ সুগন্ধ করার যজ্ঞ হবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে! (পৃষ্ঠা ৭৫)

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রজারা কিভাবে বাঁচবে? তারা কী খাবে? বোয়ালশরণ জানিয়েছেন—

'পরকালে তারা স্বর্গ পাচ্ছে, সেই আনন্দে একালে না-খেয়ে কষ্ট করবে!' (পৃষ্ঠা ৭৫)

যারা নানা প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের কারাগারে নির্বাসিত করা হয়েছে। শুদ্ধি উৎসবে আগত প্রজাদের কাছে মহারাজ রাজ্যের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন :

'আমি এবার থেকে পঞ্চবটীর নতুন নামকরণ করতে চাই। আমার সিদ্ধান্ত— অ্যাখন থেকে এ দেশের নাম হলো আঁধার মানিকপুর। (পৃষ্ঠা ৭৬)

মহারাজ প্রজাদের কাছে রাজ্যের 'আঁধার মানিকপুর' নামকরণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন—

'কারণ হিজগতে কষ্ট সাধন করে আমরা আঁধারে থাকলেও স্বর্গে নিয়ে মানিক হয়ে জ্বলবো! (পৃ. ৭৬)

আঁধারমানিকপুরে ছয় মাস থাকে অন্ধকার, ছয় মাস থাকে আলো। আলোর দিনগুলিতে প্রজারা উৎসব-অনুষ্ঠান, জরুরী কাজ সেরে রাখে। অন্ধকারের দিনগুলিতে তারা অপেক্ষা করে থাকে, কবে আলো আসবে।

এবারে ছয় মাস অন্ধকারের দিন কেটে গেছে। গণনামতো এবার সূর্যের আলো আসার কথা। কিন্তু দেশে আলো আসছে না। আঁধার মানিক পুরের প্রজারা গেছে মুরুব্বির কাছে। মুরুব্বি বলেছে, রাজার দোষে এই আঁধার কাটছে না—

'ভয়ানক অমঙ্গল আসছে দেশে।....দেখছো না দেশে এবার আলো আসছে না! ভয়ানক পাপ।....রাজার পাপ' (পৃষ্ঠা ৮১)

প্রজারা অন্ধকারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। দেশে অনাচার বেড়েছে। মহিলাদের অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুন করা হচ্ছে। কিশোরী তরুণী বা মাঝবয়সী মহিলা—কোন বাছবিচার নেই। দেশে মহিলাদের নিরাপত্তা বিপন্ন—

'বিশেষ করে গত এক সপ্তাহে আঁধার মানিকপুর থেকে সাতজন মহিলাকে কে বা কারা অন্ধকারে তুলে নিয়ে গেছে। পরে অপহৃতা মহিলারা ফিরে আসছে বটে তবে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে নয়—লাশ হয়ে।' (পৃষ্ঠা ৮৩)

প্রজাদের মুখে একটিই কথা, দেশ থেকে অন্ধকার দূর করতে হবে। প্রজারা শুনেছে, অন্ধকার দূর করার উপায় জানেন রাজকবি। কিন্তু রাজকবিকে পাওয়া যাচ্ছেন।

প্রজারা গেছে রাজার কাছে। মহারাজ তাদের আর কিছুদিন অপেক্ষা করার কথা বলেছেন—

'আপনারা আর সামান্য কটি দিন অন্ধকারে থাকুন। তারপর আমি সূর্যের আলোকে আঁধারমানিকপুরে আনার ব্যবস্থা করবো।' (পৃষ্ঠা ৮০)

প্রজারা রাজকবির সন্ধান করেছে। রাজকবি প্রসঙ্গে মহারাজ বোয়ালশরণ বলেছেন—

'দেশে যে পাপের প্রবাহ চলছে তা গায়ে মাখবেন না বলে তিনি অজ্ঞাতবাসে চলে গিয়েছেন। আর কোনদিন প্রকাশ পাবেন না।' (পৃষ্ঠা ৮৪)

প্রজারা পড়েছে মহাসঙ্কটে। একদিন প্রজারা দেখেছে, পশ্চিম দিক থেকে দৌড়ে আসছেন রাজকবি। তাঁর সর্বাঙ্গে রক্তের স্রোত। প্রজাদের রাজকবি জানিয়েছেন—

'সামনে ঘোর বিপদ। দেখেছেন তো আমি আক্রান্ত।

আমাকে মহারাজ বন্দি করে রেখেছিলেন।' (পৃষ্ঠা ৮৫)

মহাকবি প্রজাদের জানিয়েছেন, দেশের এই অনাসৃষ্টির কারণ স্বয়ং মহারাজা—

'রাজার ওপর অভিশাপ আছে, এবার দেশে আলোক ঢুকলেই তাঁর গদি চলে যাবে। তাই মহারাজ ঐ শয়তানকে পাঠিয়ে সূর্যকে আটকে রেখেছেন পাহাড়ের গায়ে।' (পৃষ্ঠা ৮৬)

মহারাজের নির্দেশে শয়তান আটকে রেখেছে আলো। মহারাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য শয়তানের নারীভোগের লালসা পূরণ করেছেন—

'..শর্ত হলো, ঐ শয়তানের লালসা মেটানোর জন্য রাজা প্রতিদিন একজন করে রমণীকে ওর কাছে পাঠাবেন। বিনিময়ে ও আলোকে আটকে রাখবে।' (পৃষ্ঠা ৮৬)

অন্ধকার থেকে মুক্তির উপায় আছে। তবে তা খুব কঠিন এবং বিপদের। প্রজাদের সেই পথ জানিয়েছেন মহাকবি—

কোনও যুবতী যদি সাহস করে ঐ সূর্যটাকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সূর্য এসে আলো করে দেবে সব। (পৃষ্ঠ ৮৬)

সূর্যের আলো পেতে, সেখানে যেতে হবে দুইজন সাহসিনী নারীকে। মহাকবি প্রজাদের জানিয়েছেন—



দুজনের মধ্যে যে কোনও একজনকে ঐ দানা-পাতির মস্তানটা খাদ্য করবে। যতোক্ষণ সে বলাৎকারে ব্যস্ত থাকবে, সেই ফাঁকে অন্যজন গিয়ে সূর্যটাকে ছুঁয়ে দিতে হবে...। আর ঐ যুবতীর স্পর্শ পাওয়ামাত্রই সব আলো হবে। সূর্য উঠবে লাফিয়ে। (পৃষ্ঠা ৮৬)

বিদেশে লেখাপড়া শেখা দুই তরুণী এই বিপদপূর্ণ কাজে অগ্রসর হয়েছে। তাদের চোখে-মুখে দৃঢ়তার ছাপ। দুই কন্যা স্থির করেছে কৌশলে বুদ্ধিবলে তারা কার্যসিদ্ধি করবে—

সিংহের খোরাক হতে যখন কোনও পশুই রাজি হচ্ছিলো না তখন খরগোস রাজি হয়েছিলো। আর বুদ্ধি করে সিংহরাজকে খরগোস যেরকমভাবে চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে মেরেছিলো নারীখোরটাকেও সেভাবে আমরা মারবো।' (পৃষ্ঠা ৮৭)

দুই নারী পূবের পাহাড়ে পৌঁছেছে। সেখানে ছিল দুইজন মৃত্যুদানব। দুজনেই নারীদের ভোগ করতে চেয়েছে। এই নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

রাজবাড়ি থেকে নিজস্ব ইন্টারনেটে সব খবর পেয়েছেন রাজা। তিনি দুই নারীখাদককে নির্দেশ দিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে কোনমতেই যুদ্ধ করা যাবে না। দুই নারীখাদক শক্তিক্ষয় না করে মীমাংসা করে নিয়েছে—

' আঁধারমানিকপুরের অর্ধেকের ওপর তোমার দখল থাক বাকি অর্ধেকে থাক আমার।' (পৃষ্ঠা ৯০)

আঁধারমানিকপুরের অন্ধকার দূর করতে প্রজারা মিছিল করে রাজবাড়িতে গেছে। রাজবাড়ি ঘিরে ফেলেছে। তাদের বক্তব্য—

'ফের দেশে নির্বাচন চাই।....আমরা নতুন রাজা চাই।' (পৃষ্ঠা ৯২)

মহারাজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুই নরখাদককে বিশ্রামে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন—

'দুই মহাবীর পাহাড় থেকে মরে যেতেই দেশে আলোক রেখা দেখা দিল'। (পৃষ্ঠা ৯২)

মহারাজ বোয়ালশরণ পঞ্চবটী রাজ্যে একটি নতুন দপ্তর খুলেছিলেন— প্রযুক্তি রূপায়ন দপ্তর। সেখানে মহারাজ মন্ত্রনায় বসেছেন সেনাপতি, মন্ত্রীদের সঙ্গে। প্রজাদের মধ্যে অসন্তোষ। তারা নির্বাচন চাইছে—

'মহারাজ এমনিতে হাতি, শেয়াল, খরগোস, হরিণ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে আছে। নির্বাচন না করলে সর্বসাধারণের মধ্যে সেই অসন্তোষ দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে। (পৃষ্ঠা ৯৮)

মহারাজ জানালেন, নির্বাচন তিনি করাবেন। তবে এই নির্বাচন হবে অন্যরকম। এই নির্বাচনে এমন এমন কৌশল গ্রহণ করবেন যাতে পদচ্যুত না হন—

'ঐ গণতন্ত্রের দোহাই পেড়ে আমি যুদ্ধ বাধাতে চাই। যে সমস্ত পশু-মহল্লায় সামান্য বে-নিয়ম দেখবো সেখানেই যাবে আমার সেনা।' (পৃষ্ঠা ৯৮)

মহারাজ তার সেনাপতি, মন্ত্রীদের নিজের রণ-কৌশল সবিস্তারে জানিয়েছেন—

ধরুণ, পার্শ্ববর্তী দেশ পাঁচ-অশথীর কথা ধরুন। ওরা আমাদের দীর্ঘদিনের শত্রু। ওদের দিয়েই শুরু হবে। ওদের কোনও অসন্তোষ, কোনও ধর্ম-উৎসবকে হাতিয়ার করে যুদ্ধ বাধাবো। (পৃষ্ঠা ৯৯)

প্রতিবেশী দেশে গণতন্ত্র বিপন্ন, এই অজুহাতে পাঁচ-অশথী আক্রমণ এবং দখল করবেন মহারাজ—

'মানে ওদের দ্বন্দ্বের ওজরে ওখানে আধিপত্য কায়েম করবো। ওখানে গণতন্ত্র বিপন্ন। ওখানে সেনা পাঠিয়ে কর্তৃত্ব লাগু করতে হবে।' (পৃ. ১০৩)

মহারাজ নির্বাচনে জয়ী হবার কৌশল জানালেন। পাঁচ-অশথী দখলের পর, নিজের দেশে নির্বাচন ডাকবেন। তখন কেউ আর রাজার বিরুদ্ধাচারণ করবে না। রাজার বিশ্বাস—'নির্বিরোধ জয় পাবো।'

নিজের যুদ্ধ পরিকল্পনা জানিয়ে। মহারাজ ঘুমিয়ে পড়েছেন। পাত্র-মিত্ররা বিদায় নিয়েছে। মহাজ্ঞানী শুকপক্ষী এখানেই গল্প বলা সমাপ্ত করেছে।

বর্তমানে রাজনীতির অভ্যন্তরীণ গলদ, দলগত কৌশল, নির্বাচনে জয়লাভের প্রয়োজনে নীতিহীন কার্যকলাপ, যে কোন পন্থায় পদ দখলের পরিকল্পনা ইত্যাদি সাহিত্যিক সোহারাব হোসেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁর শক্তিশালী লেখনীর মাধ্যমে সোহারাব তা 'রাজার অসুখ' গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। রাজনৈতিক নেতাদের ক্রিয়াকাণ্ড, তাদের মৌখিক বক্তব্য ও কার্যকলাপের বিস্তর অসঙ্গতি, তাদের বাহ্যিক রূপ ও আভ্যন্তরীণ প্রকৃত স্বরূপের তফাৎ, তাদের চারিত্রিক ত্রুটি, লোভ, স্বার্থসিদ্ধির মানসিকতা, সততার অভাব ইত্যাদি লেখক রূপকথার মোড়কের সহায়তায় তুলে ধরেছেন।

দেশের রাজনীতিকদের বাগাড়ম্বর, ক্ষমতালাভের জন্য মিথ্যা প্রতিশ্রুতিদান, জনগণের সেবা করার মহান উদ্দেশ্যের অন্তরালে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সম্পদবৃদ্ধি, ক্ষমতার অহংকারে স্ফীত হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচারবুদ্ধি লোপ পাওয়া, জনগণের প্রতিনিধি হয়ে সরকারী অর্থে ব্যয়বহুল জীবনযাপন করা প্রভৃতি বিষয়েকে ব্যঙ্গ ও কটাক্ষ করেছেন। লেখকের রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বগা ওরফে লোকেশ রূপধর একটি রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বড় পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির অভ্যন্তরীণ স্বরূপ উন্মোচন করেছেন লেখক। অফিস-কর্মীরা এসে তাঁকে বলেছেন—'হুজুর পোশাক ছাড়বেন চলুন।...আপনি দলের কাণ্ডারী। আপনার পরিধানের ওপরই তো দলের ভাবমূর্তি গড়ে উঠবে।' (পৃষ্ঠা ২২)

কর্মীরা লোকেশকে পোশাকঘরে নিয়ে গেছে। পাঁচটি ঘরে নানাবিধ পোশাক। দ্বিতীয় ঘরটিতে রয়েছে উগ্রবর্ণের পাশ্চাত্য ধরনের পোশাক। এই ঘরের পোশাক সম্পর্কে কর্মীটি লোকেশকে বলেছে :

"এগুলো পরে আপনি দলের প্যারালাল সংগঠন সমাজবিরোধীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। কাউকে চুমু খাবেন, কাউকে ছুঁড়ে ফেলবেন। দরকার হলে পৃথিবী থেকে 'ফরসা' করে দেবার হুকুম দেবেন।' (পৃষ্ঠা ২২)

রূপকথা সহজ ও সজীব। সাহিত্যরস পিপাসু পাঠকের কাছে রূপকথা বিশেষ আকর্ষণীয়।



রূপকথার প্রতি আকর্ষণের অন্যতম কারণ হল বর্তমানের জটিল পরিস্থিতি থেকে পলায়নের পথ খোঁজা।

সাধারণভাবে রূপকথার মধ্যে বাস্তবজগৎ বহির্ভূত কল্পলোকের কাহিনী বিধৃত হয়। বাস্তবে আমরা যে আদর্শ সন্ধান করি, রূপকথার রাজ্যে সেই শাশ্বত নীতির আধিপত্য রয়েছে। মানব-জীবনের বাস্তব দিকগুলি কিছুটা অতিরঞ্জিত বা রূপান্তরিত হয়ে রূপকথাতে রূপায়িত হয়। রূপকথার আবেদন, সব মানুষের কল্পনাপ্রবন হৃদয়ের মধ্যে প্রসারিত।

রূপকথার মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির বিভিন্ন সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। ক্ষমতার দম্ভ, সুবিধাবাদ, ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, অনৈতিকতা, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, ক্ষমতার লোভ, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি বিষয় সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'রাজার অসুখ'-এ এইসব বিষয়ের বর্ণনায় সোহারাবের অন্তর্দৃষ্টি, পর্যবেক্ষণ শক্তি ও জটিল বিষয়কে সহজ করে তোলার ক্ষমতা, পাঠককে মুগ্ধ করে।

রূপকথা কল্পনার রঙে-রসে পরিপূর্ণ। জীবনের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ ক্ষোভের কথা বাস্তবে সবসময় স্পষ্টভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় না। রূপকথাকে কেন্দ্র করে 'রাজার অসুখ' গ্রন্থে সোহারাব তাঁর সৃষ্টি-ক্ষমতার উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

'রাজার অসুখ' উপন্যাসে কাহিনীর আবহে সোহারাব রূপকথার মেজাজ নিয়েছেন। তিনি রূপকথার মোড়কে একালের রাজনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব রূপচিত্র এঁকেছেন। বর্তমান সময়ের সামাজিক-অর্থনৈতিক অসুখটিকে লেখক 'রাজার অসুখ' উপন্যাসে জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসে সোহারাবের দুটি সত্তা প্রকাশিত। এক, তাঁর বালক-কিশোর সত্তা, যা রূপকথা ভালোবাসে। এই সত্তা রূপকথার কাহিনী শুনে বিস্মিত-মুগ্ধ হয়। দুই, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তির অধিকারী তাঁর লেখক সত্তা। সোহারাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেছেন চতুর্দিকের সামাজিক —রাজনৈতিক পরিবেশ—পরিস্থিতি।

'রাজার অসুখ' গ্রন্থে বর্তমান সময়-সমাজ জীবনের অসুখকে সার্থক শিল্পে রূপান্তরিত করেছেন সোহারাব। 'রাজার অসুখ'-র কাহিনী লেখক ইঙ্গিতপূর্ণভাবে সেখানে সমাপ্ত করেছেন, ব্যঞ্জনার রেশ রয়ে যায় পাঠকের অন্তরে। রূপকথার স্বাদে বর্তমান সমাজ-জীবনের আখ্যান হল 'রাজার অসুখ'। এই গ্রন্থটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট নতুন ধরনের সংযোজন।

**সহায়ক গ্রন্থ ঃ**

১. 'রাজার অসুখ' সোহারাব হোসেন, প্রথম প্রকাশ ২০০৮, করুণা প্রকাশনী', কলকাতা।
২. 'সোহারাবের কথা সাহিত্য : আততায়ী সময়ের রূপশিল্প' তৌহিদ হোসেন, প্রথম প্রকাশ ২০১৬, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

হা বি ব আ র র হ মা ন

# ‘মহারণ’ : দুই বস্তুবাদী দর্শনের মিল-প্রয়াস

সাংখ্যিক সমষ্টি নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে একটি বৃহৎ ও গভীর ঐক্যের ধারণা উপলব্ধি করেছিলেন। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্যের বিনষ্টি ঘটে তখন, তিনি লিখেছেন, যখন আমরা নিজেকে ‘... টাকায় দেখি, খ্যাতিতে দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়ে তো মানুষের যত বিবাদ, যত কান্না। মানুষের মানবসত্তা সম্পর্কে এ ধরনের বিকৃত বোধই জাতিতে জাতিতে শত্রুতা, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘাত, শোষণ অত্যাচার ইত্যাদি যাবতীয় জাগতিক সমস্যার মূলে।’

নিষ্করুণ বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবনের এই যে প্রজ্ঞাদৃষ্টি, তাকে অস্বীকার করা ও তা নিয়ে তর্ক তোলার কোনো অবকাশ নেই। মানুষে-মানুষে যত রকমের বিভেদ রয়েছে তার মূলাভূত কারণ দুটি—লোভ ও কর্তৃত্বপরায়ণতা। ব্যক্তির ক্ষুদ্র পরিসর থেকে পরিবার, সমাজ, দেশ ও বিশ্বের ক্রমবৃহৎ পরিসরের যাবতীয় বিরোধ-বিসংবাদ-সংঘাতের কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে ওই দুটি মূল কারণের কোনো-না-কোনো রূপের দেখা পাওয়া যাবেই। বহু মণীষী কারণ দুটি নিরসনের মাধ্যমে জীবনে ও জগতে শান্তি-স্বস্তি প্রতিষ্ঠার উপায় অন্বেষণ করেছেন। প্রায় পুরো বিশ শতক জুড়ে, বিশেষ করে ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়পর্বে ওই লোভ ও কর্তৃত্বপরায়ণতার নিরসনে যে-মতটি প্রাধান্য লাভ করেছিল তার নাম মার্কসীয় দর্শন। এই দর্শনে বা মতবাদে ব্যাপক সংখ্যক সমষ্টি-মানুষের জীবনে সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক মুক্তির কথা বলা হয়।

অন্যদিকে প্রাচীন কাল থেকে লোকায়ত জীবনে ওই লোভ ও কর্তৃত্বপরায়ণতার তামসিকতা থেকে আত্মমুক্তির এক গোপন-গূঢ় সাধনা প্রচলিত রয়েছে। সেটি অবশ্য জগত জুড়ে নয়, তার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষের প্রধানত বাংলা ও সন্নিহিত অঞ্চলে। এখানকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক-জীবনের এক ক্ষুদ্রাংশে লোভ- লালসা-কামপরায়ণতা-মাৎসর্য ইত্যাদি তামসিকতা থেকে মুক্ত মানুষ হওয়ার সেই সাধকদের দেখা মেলে। তাদের সাধনা একান্তভাবে নিজের দেহের ও মনের নিয়ন্ত্রণের সাধনা। মতাদর্শগতভাবে তাদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। প্রধান ভিন্নতা এককতায় ও যৌথতায়। দ্বিতীয় মতের সাধকদের প্রয়োজন একজন সঙ্গীর এবং তারা হবেন বিপরীত লিঙ্গের। এদের মধ্যেও মত-পথের কিছু পার্থক্য আছে। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক-মুক্তমানুষ হওয়া।

এবার প্রশ্ন তুলতে হবে মার্কসীয় দর্শনের মূল লক্ষ্যও যদি হয় মানুষকে মুক্ত মানুষ অর্থাৎ নির্লোভ মানুষের রূপান্তর, তাহলে কি বাংলার নিম্নবর্গীয় কিছু মানুষের দেহকেন্দ্রিক সাধনার যে-তত্ত্ব বা দর্শন, তার সঙ্গে মেলানো যাবে? যাবে কি না সে-বিচার আপাতত





মুলতবি রেখে এই তথ্য জানাই যে বাংলা কথাসাহিত্যে নতুনত্বের পথসন্ধানী সোহারাব হোসেন তাঁর প্রথম উপন্যাস মহারণ-এ সেই প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজতন্ত্রে প্রতিষ্ঠাকামী একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত গ্রামের এক হতদরিদ্র যুবক কেয়ামত চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিকের সেই প্রয়াস আবর্তিত হয়েছে। এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনব।

কাহিনির সূত্রপাত যুগিপোতা মাঠে। এই মাঠের পশ্চিম জুড়ে তিনটি গ্রাম—আঁধারমানিক, মড়ারকো ও শিয়ালডাঙা; পুবদিকেও তিনটি গ্রাম—হাতিপোতা, ঘুঘুডাঙা আর শোলমারী; দক্ষিণে হাতিপোতা হাটখোলা আর উত্তরে বিস্তীর্ণ উত্তর বিল। এই মানচিত্রের মাঝখানে যুগিপোতা মাঠ। এরই মধ্য দিয়ে আড়াআড়ি পশ্চিম থেকে পুবে একটি কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে আঁধারমানিক গ্রামের সাথে ঘুঘুডাঙা গ্রামপঞ্চায়েত।

আসন্ন পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে ভোটের মিটিং ও প্রচার শেষে মাঘের মধ্যরাত্রিতে আঁধার মাণিকে নিজের বাড়িতে সাইকেলে ফিরছিল বিড়িশ্রমিক কেয়ামত—আঁধারমানিক গ্রামসভার সদস্য কমরেড কেয়ামত। তালপুকুরের কাছে পৌঁছতেই সে আকস্মিক আক্রমণের শিকার হয়। মনে হয় অন্ধকার ফুঁড়ে জনা কয়েক ভূত রূপকথার গল্পের মতো হঠাৎ উদয় হয়। আসলেও ঔপন্যাসিক তাদের উদয় ও অদ্ভুত মুদ্রায় বৃত্তাকার হয়ে আক্রমণের বর্ণনা রূপকথার গল্পের আদলেই দিয়েছেন। এই আদলটি প্রায় সারা উপন্যাস জুড়েই প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে। উপন্যাসের প্রারম্ভিক অংশে লেখক তা জানিয়েও দিয়েছেন পাঠককে। আলোচনার সুবিধার্থে অংশটুকু উদ্ধৃত করা দরকার :

> ‘কাল কেটে যায় মন্থর গতিতে। মনে করো এক এক গ্রামের রূপকথা। রূপকথার মিহিন চাতালে বসে এই গ্রাম্য রূপকথার শরিফ হয় কেয়ামত, ছপুরা, খাজান সাঁই দরবেশ কিংবা সামছুল আলম, হাসমতউল্লাহ প্রমুখ রূপকুমার-রূপকুমারীরা। তারা কিলবিলিয়ে হাসে। তারা ফরফরিয়ে রাগে। তারা পরি হয়। মীনকুমারী হয়। দানো হয়। দত্যি হয়। মানুষ-মানুষ খেলাঘরের বাসিন্দা হয়। মনে করো সেই গ্রাম্য রূপকথার ক্ষেত্রভূমি হল আঁধারমানিক গ্রাম। শুধু আঁধার মানিকই বা হতে যাবে কেন, এ রূপকথার রাজপুত্তুর কোটালপুত্তুর- সুয়োরানি-দুয়োরানিরা আঁধারমানিক সমেত মড়ারকো- শিয়ালডাঙা- হাতিপোতা- ঘুঘুডাঙা- শোলমারী গ্রামের প্রতিটি প্রান্তে উবুদশ-কুড়ি করে নিজেদের জড়িয়ে নিতে পারে। যখন তখন। তখন রূপকথার অবাক দর্শক সাজা ছাড়া লেখকের আর কিছু করার থাকে না।’

সত্যিই লেখকের কিছু করার থাকে না। তিনি যখন কেবলই ব্যক্তি-সত্তা তখন তো নয়ই, আর যখন লেখক তখনো নয়। লেখক যেটুকু পারেন তা শুধু ঘটমানের কিছু রদবদল করতে। নিজের সৃষ্টির স্বার্থে সেটুকু তাঁকে করতেও হয়। যা ঘটমান তা থেকে কিছু বর্জন করেন, কিছু গ্রহণ করেন, আবার কিছু সংযোজন করেন। রঙের কাজও তাঁকে করতে হয়। কিন্তু তাতে ঘটমানের অর্থাৎ বাস্তবে যা ঘটে অথবা ঘটছে, তাতে গুরুতর হেরফের ঘটে

না। তাই যুগিপোতার মাঠে মাঘের মধ্যরাত্রিতে ক'জন ভূত-মানুষের দ্বারা কেয়ামতের আক্রান্ত হওয়া ইচ্ছে থাকলেও রোধ করার উপায় লেখকের থাকে না।

সারা পশ্চিমবঙ্গে যখন লাল পরিদের অর্থাৎ সিপিএম-এর নিশোন উড়ছে তখনো বিগত দু-দুটো পঞ্চায়েত নির্বাচনে আঁধারমানিক-ঘুঘুডাঙা পঞ্চায়েতে বিজয়ী হয়েছে নীল পরিদের দল কংগ্রেস। এবার তৃতীয় নির্বাচন। এবারকার নির্বাচন লাল পরিদের কাছে তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চায়েত এবার দখল করতেই হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল স্থানীয় পার্টি সেক্রেটারি হোসমত উল্লাহকে নিয়ে। দলের গঠনতন্ত্র, নিয়ম-কানুনের কোনো তোয়াক্কা না করে সে নীল পরিদের পাণ্ডা তমিজদ্দিনের সঙ্গে আপোষ করে তাকে দলে নিয়ে নিল। দলের প্রভাবশালী প্রবীণ সদস্য রহিমবক্স ও তরুণ সদস্য কেয়ামতের প্রতিবাদে কোনো কাজ হলো না। হাসমতউল্লার যুক্তি দলের স্বার্থে, ভোটে জেতার স্বার্থে সে তমিজউদ্দিন গাকে লাল দলে নিচ্ছে। এটা একটা রাজনৈতিক কৌশল। কিন্তু তার আসল উদ্দেশ্য নিজের স্বার্থসাধন।

সরল ও নির্বুদ্ধি জনসাধারণ হাসমতউল্লাহর চক্রান্ত ধরতে পারে না। সেজন্য তার যুক্তিকে বেশির ভাগ লোক মান্যতা দেয়। হাসমতের ষড়যন্ত্র আরও স্পষ্ট হয় প্রার্থী-তালিকা প্রকাশ করার পর। শোলমারী ও আঁধারমানিক বাদে অন্য গ্রামগুলোতে প্রার্থী অপরিবর্তিত থাকে। শোলমারীতে প্রার্থী করা হয় বরাবরের নীল দলের, কিন্তু বর্তমানে লাল দলীয় তমিজউদ্দিনের ছেলে সামছুল আলমকে, আর আঁধারমানিকে কেয়ামতকে বাদ দিয়ে স্বয়ং সেক্রেটারি।

কেয়ামতের কিছুই করার থাকে না। কিন্তু রহিমবক্স দলের সেক্রেটারির এই স্বেচ্ছাচারিতা মানতে পারে না। কেয়ামতকে পাল্টা প্যানেল দেওয়ার পরামর্শ দেয়। কেয়ামত প্রার্থী হয়—দলের নয়, নির্দলীয়। ঘুঘুডাঙা গ্রামে নির্বাচনী প্রচার শেষে বাড়ি ফেরার পথে সে আক্রান্ত হয়। পুরো অঞ্চলে পরিস্থিতি তখন ভিন্ন রং ধারণ করেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়—

> লালে-নীলে, লালে-সাদায়, নীলে-সাদায় সে এক ঘোলাটে অস্তিত্ব। এক ঘোলাটে রাজনৈতিক বাতাবরণে আঁধারমানিক মড়ারকো- শিয়ালডাঙা-হাতিপোতা- ঘুঘুডাঙা-শোলমারী গ্রাম সমূহের আকাশ ধূসরবর্ণ ধারণ করে যেন রহস্যে ভর করেছে। এখন পরিস্থিতিতে ক্ষেত্র রক্তাক্ত হল। তালপুকুরের ঝোপ-জঙ্গলের গালিচায় কেয়ামত মাথায় প্রাণঘাতী বাড়ি খেল। বাড়ি খেল এবং রক্তাক্ত হল। রক্তাক্ত হল এবং জ্ঞান হারাল।

এই রাজনৈতিক ঘটনাধারার পাশাপাশি উপন্যাসে আছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার আরেক ধারা। সেটি লোকায়ত জীবনের এক ক্ষুদ্র ও দরিদ্র শ্রেণির গোপন দেহ-সাধনার ধারা। কমরেড কেয়ামতের জীবনের সঙ্গে এই ধারাটিরও সম্পর্কসূত্রে দুই ধারার যোগসৃষ্টি। আঁধারমানিক গ্রামপ্রান্তে পির মহম্মদ আলি সাঁই দরবেশের আস্তানার বর্তমান খাদেম ফকির খাজান সাঁই। অদূরে আলাদা হোত্বজরায় থাকে আর মেয়ে ছপুরা। সেও সাধিকা। খোদ্-এ-খোদাসন্ধান উভয়ের লক্ষ্য হলেও বাপ-মেয়ের পথ আলাদা। ছপুরা সাধক-সাধিকার



জৈবিক কামের ভেতর দিয়ে তাকে অতিক্রম করে প্রেমের ফুল ফোটানোর তত্ত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু খাজান সাঁইয়ের কাছে এই তত্ত্ব কামতত্ত্বেরই নামান্তর।

কেয়ামত ছপুরাকে আশ্রয় করে অমর সাধক হতে চায়। সেই সাধক হওয়ার যা-কিছু গুপ্ত তত্ত্ব ও প্রায়োগিক শিক্ষা, ছপুরা কেয়ামতকে তা দিয়েছে। উপন্যাসে তার মোটামুটি বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এই আলোচনার পক্ষে সে-সবের তেমন গুরুত্ব নেই। কেবল গুরুত্ব আছে এই খানটায় যে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কেয়ামত না হয় বস্তু বা বীর্য রক্ষা করতে শিখল, নির্লোভ-নিরাসক্ত-নির্ভারও হতে পারল কিন্তু তার রাজনীতি? শোষিত নির্যাতিত দরিদ্র-সর্বহারা মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়? মার্কসের দেখানো পথে সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন?

কেয়ামতের এ সব জিজ্ঞাসার সূত্রে উপন্যাসে সংযোজিত হয় এক ভিন্ন মাত্রা। উপনিবেশ-ভারতের প্রথম কৃষক সংগ্রাম ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছপুরা বোঝায় যে দরবেশ হওয়ার সাধনার সঙ্গে রাজনীতির বিরোধ নেই। বরং গভীর সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছপুরা বলেছে দরবেশ হওয়ার সাধনার মূল লক্ষ্য বস্তুরক্ষার সাধনার মাধ্যমে লোভ-লালসা-মোহ জয় করে আত্মরক্ষায় সক্ষম হওয়া। রাজনীতিবিদেরও সেটাই সাধনা। তা না হলে অর্থ সক্ষম হওয়া। রাজনীতিবিদেরও সেটাই সাধনা। তা না হলে অর্থ সম্পদের 'ঘরের খোলে' হারিয়ে যেতে হয়। ছপুরা তাই যুক্তি দেখায় : 'তোমার রাজনীতিতে তুমি গরিপির এই জগতের মুক্তি খোঁজ, আর আমার ফকিরিতে আমি খোঁজ, আর আমার ফকিরিতে আমি গরিপির দেহডারে মুক্তি দিই। ফারাক নিকো।'

এই ফারাক না-থাকাতে ইতিহাসের তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে ছপুরা। সে-কারণেই উপন্যাসে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে। অবশ্য পরিপ্রেক্ষিতের বিচারে ফকিরদের বিদ্রোহের প্রসঙ্গ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। মজনু শা, মুসা শা, চেরাগ আলি শা প্রমুখরা তো আসলে দরবেশই। ইংরেজের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার তথা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের লড়াইয়ে নামতে হয়েছে, হাতের একতারাকে পরিণত করতে হয়েছে বন্দুকে। কেয়ামতকেও তাই করতে হবে।

ছপুরার এই যুক্তি বা ব্যাখ্যা কেয়ামত অস্বীকার করতে পারেনি। ছপুরার যুক্তি-ব্যাখ্যা তাই হয়ে উঠেছে। কেয়ামতেরও। সংসদীয় পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অবিশ্বাসী বিপ্লবী মার্কসবাদী রাসেককে কেয়ামত সে-কথাই বুঝিয়েছে। বলেছে মার্কসবাদ যে-দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের সাহায্যে জগৎ ব্যাখ্যা করে, মানুষের মুক্তির কথা বলে, পুঁজিবাদী ভোগবিলাসের বিরুদ্ধাচরণ করে সাম্যের কথা বলে, ফকিরিবাদের বস্তুরক্ষার সাধনায়ও সে-কথায় বলা হয়। কেয়ামত তারপর সেই সাধনার পদ্ধতি বোঝায় রাসেককে। কিন্তু রাসেক বুঝতে না পারায় কেয়ামত বলে,

> —বোঝো। বুঝতে শেখো। তোমার বস্তুবাদ চরিত্র গড়ার কথা বলে। শ্রেণি লড়াইয়ের সুকঠিন দিনে চরিত্র রক্ষার কথা বলে। কাম-কামনা থেকে

মুক্ত থাকতে বলে। ফকিরিবাদ ও ওইরকম এক সাধনা। বস্তুরক্ষের সাধনা। বস্তু কি জান? বস্তু হল তোমার-আমার শুক্ররস। কাম এসে যদি শুক্রের পতন ঘটায় তবে সব শেষ। সে তোমার মার্কসবাদে হোক আর আমার ফকিরিতে হোক। মানো?

—তা মানি।

—তালেই দেখ। দুটো পথেরই কারবার বস্তু নিয়ে। মানুষের লোভ-লালসার মুক্তি নিয়ে। সেজন্যই আমার এই পথে আসা। আগে বস্তুরক্ষার সাধনায় মানুষকে মুক্ত করতে হবে। পরে তোমার বড়ো বস্তুবাদের পথে মানুষকে ঠেলতে হবে।.....

কেয়ামতের লড়াই তাই দুই ধারায়—একদিকে আত্মমুক্তির, অন্যদিকে পার্টির নীতি-আদর্শ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমষ্টির মুক্তির রাজনৈতিক লড়াই। রাজনৈতিক লড়াইয়ে তার প্রাণ-সংশয় হয়েছে, কিন্তু কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলেও রহিম বক্স ও তার সমর্থকদের প্রেরণায় সে নিজেরই দলের শক্তিশালী প্রতিপক্ষের নীতিহীনতার বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে নেমেছে। নেমে বুঝেছে অন্তর না রাঙিয়ে কেবল বসন রাঙানো। পার্টি-নেতা ভেকধারী কমিউনিস্ট হাসমত উল্লাহ নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কতটা নিচে নামতে পারে। গুণ্ডা লেলিয়ে কেয়ামতকে ঘায়েল করতে চেয়েছে। ব্যর্থ হয়ে এলাকায় হানাফি-ফকিরি দ্বন্দ্ব উশকে দিয়ে দাঙ্গা বাঝিয়েছে, ছপুরার সঙ্গে কেয়ামতের সম্পর্ক নিয়ে কুৎসা রটিয়েছে, টাকা দিয়ে বিপক্ষীয় ভোট কিনেছে। তা সত্ত্বেও কেয়ামতকে হারাতে পারেনি হাসমত, হেরেছে বরং সে-ই কিন্তু সে-হার ভোটের হার মাত্র, নীতি ও আদর্শহীনতার হার নয়। চূড়ান্ত বিজয় হাসমত উল্লাহদের পক্ষেই যায়। আর কেয়ামতরা হারিয়ে যায় দৃশ্যপট থেকে।

নির্বাচনে আঁধারমানিক ঘুঘুডাঙা পঞ্চায়েতের পনেরোটি আসনের মধ্যে নীল দল পেয়েছিল ছটি আসন, লাল দল পাঁচটি। আর লাল দলের বিদ্রোহীরা চারটি। ফলে বিদ্রোহী বিজয়ীদের গুরুত্ব বেড়েছিল সর্বাধিক। তারা যে-দলকে সমর্থন দেবে সেই দল থেকে প্রধান-উপপ্রধান নির্বাচিত হবে। সুযোগ পেয়ে রহিম বক্স প্রস্তাব দিয়েছিল কেয়ামতকে প্রধানের পদ দিতে হবে। লাল দলের মহকুমা-গোলকের নেতা লোকেশ মুখার্জি, বিধায়ক রবেন বোস অগত্যা কেয়ামতের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন একটা মীমাংসায় পৌছনোর জন্য। প্রধান না হলেও উপপ্রধানের পদ পাওয়া কেয়ামতের পক্ষে ছিল খুবই সহজ। কিন্তু মোহমুক্ত আদর্শবাদী পার্টিকর্মী কেয়ামতের প্রস্তাব ছিল অভাবনীয়। কেবল প্রস্তাব নয়, চার দাবি ছিল উত্তর বিল দখল করতে হবে এবং তাতে নেতৃত্ব নিতে হবে পার্টিকে।

দু-হাজার বিঘের উত্তর বিলের মালিকানার একটা ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাস রূপকথার আলৌকিকতায় মণ্ডিত। কেয়ামতের প্রপিতামহ মৎস্যজীবী খাদেম উত্তর বিলে মাঝ ধরতে গিয়ে সোনার একটা মৎস্যখণ্ড পেয়েছিল। সেটা খাঁটি সোনা কিনা জানবার জন্য সরল খাদেম গিয়েছিল আঁধারমানিক গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তি তসলিমউদ্দিনের কাছে। তার বড়



ছেলে তমিজউদ্দিন তখন কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করে। বাপ-ছেলে পরামর্শ করে প্রথমে সোনাকে পেতলে পরিণত করে, তারপর হারিয়ে ফেলার গল্প ফাঁদে। খাদেম এই প্রতারণা ধরতে পারলেও তার কিছু করার থাকে না, বাড়ি ফিরে পুত্রবধূ নূরুন্নেছাকে ঘটনা বিবৃত করা ছাড়া। ওদিকে তসলিমউদ্দিন কোন্নগরের জমিদারের কাছ থেকে কিনে নেয় উত্তর বিলের দু-হাজার বিঘের এস্টেট।

খাদেমের পুত্রবধূ আর ঘটমান বর্তমানের নায়ক কেয়ামতের পিতামহী নুরুন্নেছা, উপন্যাসে যে নূর বুড়ি নামে বহুবার উল্লেখিত এবং যার ভূমিকা সূত্রধরের মতো কিংবা তার চেয়েও বেশি, সেই থেকে তার গর্ভে ধারণ করে আছে এই কাহিনি। জীর্ণ-শীর্ণ বৃদ্ধা নূর বুড়ি দাওয়ায় বসে থাকে আর যাকে পায় তাকে এই কাহিনি শোনায়। আর থেকে থেকে হাজারো ধাঁধা 'সমুস্যে' বলে। তাতে সৃষ্টি হয় ভিন্ন কথা ভিন্ন কাহন।

নূর বুড়ি আর 'ঘুণ-লাগা' গলায় বলে আর শ্বশুর খাদেমের পাওয়া সোনার মৎস্যখণ্ড বেচে তসলিমউদ্দিন উত্তরবিল কিনেছিল। মৎস্যখণ্ড তার শ্বশুরের ছিল বলে ওই বিলও তাদেরই পাওয়া হয়। খাদমের মৃত্যুর পর স্বামীকে আর পিতার বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে-মানুষটা ঝুটঝামেলা পছন্দ করত না। ছেলে হেকমত ফকির ছিল বাপের বিপরীত। কলজেয় তাকতও ছিল মারাত্মক। সে লড়াই দিতে শুরু করেছিল তমিউদ্দিনের সঙ্গে, নেতা-হোতাদের সঙ্গে। সে-লড়াইয়ে তাকে বলি হতে হয়েছিল। শোক সইতে না পেয়ে তার স্ত্রী অকালে বিদায় নিয়েছিল পৃথিবী থেকে। কেয়ামত তখন কিশোর। বাপ-মা-হারিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল তার স্কুলের পাঠ। দাদি নূর বুড়ি তাকে নিজের মতো করে গড়ে তোলা শুরু করেছিল। রূপকথার ইতিহাসকে, তার প্রতিটি প্রান্ত আর বঞ্চনার প্রতিটি টুকরো কেয়ামতকে শুনিয়ে বলত—'ও টাকা তোর। ও বিল তোর। লে, পিতিকের কর।'

এ কাহিনির মূলে যে-অলৌকিক ঘটনাটি বয়ন করেছেন ঔপন্যাসিক, আর একটি বাস্তবসঙ্গত ব্যাখ্যা পাঠকের ন্যায্য দাবির মধ্যে পড়ে। সে-দাবি লেখক স্বয়ং মিটিয়েছেন। আমাদের পক্ষে শুধু এটুকু বলবার যে সে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থের ব্যাপকতা ও গভীরতা উপলব্ধির দায় পাঠকের। তাহলে বোঝা যাবে এ কাহিনি একা খাদেব, নূর বুড়ি বা কেয়ামতের নয়, একটা বিশেষ শ্রেণির। ঔপন্যাসিক লিখেছেন,

> নূরবুড়ির কাহিনির পিছনে ওই সোনার মৎস্যখণ্ডের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করে নিলে নূরবুড়ি কথিত রূপকথার সহজ এক অর্থ পাওয়া যায়, এক ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়, এ-ইতিহাস পৃথিবীর চিরকালীন বঞ্চনা ও ভোগবাদের ইতিহাস। সেখানে নীল পরি তমিজউদ্দিন মিয়াদের বিস্তৃত হাত ক্রম-প্রসারিত হয়। আরও প্রসারিত হয়।

পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান কোনো পদ নয়, কেয়ামতের যে একমাত্র দাবি ছিল উত্তর বিলের তখল নেওয়া, তার কারণ রয়েছে ওই ইতিহাসের মধ্যে। এ ছাড়া আর

পার্টি-নীতিও একটি কারণ। পার্টির উচ্চতর স্তর তার দাবিই মেনে নেয়। সিদ্ধান্ত হয় কেবল উত্তর বিল নয়, এলাকার আরও চারটি জলকর দখলে নিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে পরিচালনা করবে। প্রতিরোধ সত্ত্বেও জলকরগুলো যখন দখলে এল তখন সমস্যা সৃষ্টি হল এগুলোর পরিচালন-পদ্ধতি নিয়ে। সমস্যা সৃষ্টি করল কেয়ামতই। তার দৃঢ় বিশ্বাস পার্টি-নিয়ন্ত্রণে থাকলে জলকর গুলোয় লোকসান হবেই। তখন জটিলতা সৃষ্টি হবে। বরং ভালো হবে লিজ-সিস্টেমে যাওয়া। লোকেশ মুখার্জি, হাসমত উল্লাহ কেয়ামতের প্রস্তাব মানতে রাজি নয়। এই পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় উত্তর বিল বাদে অন্য চারটি জলকর পার্টি-পরিচালনায় সমবায় পদ্ধতিতে চলবে, আর উত্তর বিল পরিচালিত হবে কেয়ামতের প্রস্তাব অনুযায়ী।

সকলের মত নিয়ে কেয়ামতের ব্যবস্থাপনায় উত্তর বিলে দু-হাজার বিঘে জমি দু-হাজার নিঃস্ব-দরিদ্র পরিবারপিছু এক বিঘে বাট্টা করে দেওয়া হল। দারিদ্র্যের কারণে এই জমি ক-জনা ধরে রাখতে পারবে তা নিয়ে রহিম বক্স সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। কিন্তু কেয়ামতদের বিশ্বাস হয়নি। যা হোক, প্রথম বছরে অন্যগুলোতে লোকসান হলেও উত্তর বিলে আশাব্যঞ্জক লাভ হয়। কিন্তু তার পরই রহিম বক্সের সন্দেহ ফলতে শুরু করে। অধিক টাকার লোভে কেউ কেউ জমি বেচে দিতে লাগল আর সেগুলো কিনল তমিজউদ্দিন, সামছুল আলম ও হাসমত উল্লাহরা। দ্বিতীয় বছরে অজ্ঞাত কারণে লোকসান হল। অর্থ তছরূপের অভিযোগ উঠল কেয়ামতের বিরুদ্ধে। জমির মালিকানা পাওয়ায় বিরোধীরা ততদিনে পরিচালন-কমিটিতে এসে গেছে। তারা সভা করে কমিটি থেকে কেয়ামতকে সরিয়ে দিল। রহিমবক্স-সাদিকরা আপত্তি জানিয়েছিল। বিরোধীরা যুক্তি দেখিয়েছিল তাদের তো সরানো হচ্ছে না, কেয়ামত ব্যর্থ বলে তাকে একা সরানো হচ্ছে। নীরবে, মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল কেয়ামত। মনে মনে বলেছিল—'হে পরমগুরু তবু আমি বাঁদিকেই চলব।'

উপন্যাসে এর পরের অংশে, অন্তত সোয়া শো পৃষ্ঠার পরিসরে কেয়ামতকে আমরা দেখি হতাশা আর নিঃসঙ্গতায় বিধ্বস্ত একজন মানুষ হিসেবে। যাকে কখনো বিড়ি টানতে দেখা যায়নি, সে এখন গাঁজায় বুঁদ হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে কেবল তার দুই কাঁধে বসে—থাকা বকরূপী মজনু শা আর মার্কসকে আশার বাণী শোনাতে দেখা যায়। কিন্তু ওই পর্যন্ত উজ্জীবিত হয়ে কেয়ামতকে সক্রিয় হতে দেখা যায় না। উপন্যাসের শেষে দেখি উত্তর বিল দখল করার দিন প্রতিপক্ষের গুলি-খাওয়া পঙ্গু হয়াতের সঙ্গে, যে এখন হুইল চেয়ারে ভিক্ষে করে বেড়ায়, ভূ-ভারত দেখতে ফকির বেশে বেরিয়ে পড়েছে কেয়ামত। মজনু শা আর মার্কসের অনুরোধে তার হাতের একতারা বেজে ওঠে আর 'রাত্রির আকাশ চিরে, ভোরের গর্ভ চিরে ভূমিষ্ঠ হয় এক আদি গান—'এমন উলটো দেশ গুরু কোন্ জায়গায় আছে/ ঊর্ধ্বপদে হেঁটমুণ্ডে সেই দেশে লোক বাস করতেছে।' এক কলি গেয়ে কেয়ামত একটু থামতেই হয়াত দোহারে দিয়ে ওঠে—'এমন উলটো দেশ গুরু কোন্ জায়গায় আছে—এ-এ।"



হেঁটমুণ্ডকে ঊর্ধ্বমস্তক করার সাধনা বাউল-ফকিরের নয়, সে-সাধনা মার্কসীয় দর্শনের। কেননা মার্কসবাদের লক্ষ্য শ্রেণিবিভক্ত সমাজের আমূল রূপান্তর, সর্বহারার নিজস্ব রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। সেজন্য অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সর্বহারাকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই হয়। তার মানে এ নয় যে হেঁটমুণ্ড হয়ে থাকা বাউলের ধর্ম। বলতে চাইছি বাউলের সাধনা একান্তভাবে আত্মগত, আত্মকে কুপ্রবৃত্তিমুক্ত করা। তবুও ইতিহাসে খপিরদের যে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল কিংবা (লোকশ্রুতি অনুযায়ী) লালন সাইকে শিষ্য-সাগরেদ নিয়ে জমিদারের লেঠেল বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা লাঠি ধরতে হয়েছিল, তা কেবলই সাময়িক পরিস্থিতির কারণে। শাসক-শোষক-নিপীড়কের বিরুদ্ধে লড়াই তাদের লক্ষ্য নয়। উপন্যাসে এই আত্ম ও সমষ্টি নিয়ে সেজন্য বকরূপী মজনু ও মার্কসকে তর্ক করতে দেখা যায়।

তবে বস্তুবাদী দর্শনের দিক থেকে দুয়ের মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য মিল এখাঁজা যেতে পারে। দুদ্দু শাহ তাঁর একটা গানে বলেছেন : 'বস্তুকেই আত্মা বলা যায়। আত্মা কোনো অলৌকিক কিছু নয়।/বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে/আত্মার বিকাশ হয়ে/ জীবন রূপ সে পেয়ে জীবনেতে বয়।' আত্মাকে যদি চৈতন্য অর্থে ধরি তাহলে বলা যাবে দর্শনশাস্ত্রের বস্তুবাদও একই কথা বলে। অর্থাৎ এই দুই দর্শনেই চৈতন্য কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নয়, উপজাত। মিল এই পর্যন্তই। বাউল-ফকির নির্লোভ হওয়ার সাধনার কথা বলে। অন্যদিকে মার্কস-প্রকল্পিত সমাজে লোভ থাকবে না। কেননা সেখানে লোভের চরিতার্থ হওয়ার সুযোগ নেই। তাছাড়া বাউলের মতো মার্কসপন্থী জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত হতে পারে না। হলে সমাজ-পরিবর্তনের লড়াইয়ে তার পক্ষে সক্রিয় হওয়া সম্ভব হয় না।

এ আলোচনা এখানে শেষ করতে পারলে ভালো হতো। তাতে একটা অনিবার্য কিন্তু দুঃসমাধেয় প্রশ্নের হাত থেকে নিস্তার মিলত। প্রশ্নটা এই যে মানুষের মধ্যে অর্থ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বপরায়ণতা এই যে তিনটি প্রধান লিপ্সা এবং সেগুলোর সঙ্গে সম্পৃক্ত তামসিক প্রবণতাসমূহ, শ্রমজীবী প্রলেতারিয়েতের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই কি সেগুলোর অবসান ঘটবে? বাস্তবতা থেকে সদর্থক উত্তর মেলে না। মিললে সত্তর বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ত না, 'মহারণ'-এর পশ্চিমবঙ্গে সি. পি. এম রাজনীতি প্রায় অস্তিত্বশূন্য হয়ে যেত না। সুতরাং বাউলের 'রতন মানুষ' হওয়ার যে-তাৎপর্য, তার গুরুত্ব অস্বীকারের উপায় নেই। শুভ-অশুভ ও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে জর্জরিত কবি জীবনানন্দের 'সুচেতনা' তো ওই মানুষ-রতনেরই আরেক ভাকি পরিচয়। ওই সুচেতনার পথে আলো জ্বেলেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হওয়া সম্ভব। এর বিকল্প আছে বলে মনে হয় না।

সোহারাব হোসেন তাঁর 'মহারণ' উপন্যাসের মাধ্যমে এ সব ভাবনা ভাবিয়েছেন। মনে হয় উপন্যাসটির একটা বড় কৃতিত্ব এইখানে।

'খুলনা, আগষ্ট' ২০১৮

সা খা ও য়া ৎ হো সে ন

## মাঠ জাদু জানে ঃ জীবনের রস-সৃজন

'মাঠের নাম মাঝের দাঁড়ি'। ইয়াব্বড় মাঠ। যেদিকে নজর ফেলনা কেন চাদ্দিকে সবুজে সবুজ। তিন-ফসলি সোনাফলা মাঠ। পয়মন্ত। তোমার দুঃখ হয়েছে? মাঝের দাঁড়ির যে কোনো বদের বুকের ওপর বসে পড় সব দুঃখ মাঠ-মা শুষে নেবে। মনে অশান্ত? ফসলময় মাঝের দাঁড়ির যে কোনো প্রান্তে শুয়ে গড়াগড়ি খাও তৃপ্তি পাবে। জীবনে বৈরাগ্য এসেছে? মাঝের দাঁড়ির সোনাগড্ড ধানের গাছে ক' বার হাত বোলাও নতুন করে বাঁচার তাগিদ পাবে। দেহমনে যৌবন আসার গন্ধ—তার রি রি উত্তাপ? একটাবার যুবতী মাঝের দাঁড়ির যে কোনো পটল ক্ষেতের মদ্দাফুলের সঙ্গে নিয়ে ফুলের মিল-মেলাও ঘটিয়ে দাও মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাবে। তাই আদিকাল থেকে মাঝের দাঁড়ির মাঠ শুধু কওছারদের সাংবাড়িয়া গ্রামের নয়, মাঠ-লাগোয়া শ্রীনগর, পূর্ব সাংবাড়িয়া, মাটিয়া ইত্যাদি সব গ্রামের মানুষ-মণিষ্যিদের কাছে একটা রূপকথার রাজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ মাঠ যাদু জানে।' সোহারাব হোসেনের 'মাঠ যাদু জানে' উপন্যাসের মূল ভাষ্যই হল লেখক-কৃত উক্ত প্রেক্ষাপটটি। এখানে মাঠ-ফসলের গন্ধটি, মাঠের অনুরণনটি (পাল্‌স্) প্রকৃতই প্রতিবিম্বিত। মাঠ-লাগোয়া মানুষেরাই এই গল্পের মধুর স্বাদ পাবার অধিকারী। সর্বোপরি মাঠ-মাটি কে নিয়ে যাঁরা কাহিনী রচনা করেন তাঁদেরকে মাটিতে পা দিয়ে চলতে হয়। সোহারাব হোসেন সেই মাঠ-ঘেঁষা মানুষ, মাটির সন্তান। মাঠ-মাটি, মাটির মানুষকে নিয়ে তাই তিনি অবলীলায় বুনতে পেরেছেন ননা কাহিনী সমৃদ্ধ এই নক্‌শী কাঁথার মাঠ। লোক সমাজের গ্রামীণ জান্তব ভাষায় অপূর্ব স্বাদু সিনেমাটিক বয়ানে এই উপন্যাসের অন্তর্লোক গড়ে উঠেছে। 'পদ্মানদীর মাঝি' বা 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের মতই আঞ্চলিক আধারে গড়ে উঠেছে 'মাঠ যাদু জানে'র শারীরিক কাঠামো। বাস্তবতার ফসল সামাজিক মানুষকে নিয়ে কখনও অন্তর্বাস্তবের, কখনও না-বাস্তবের, কখনও জাদু বাস্তবের পথ হেঁটেছেন লেখক। কওছার, সাত্তার, আমির আলি, জমির আলি, সাবেরা সেই সব হাঁটতে হাঁটতে জীবনধারাকে বহমান করে রেখেছে। তখন তে-ভাগা আন্দোলন চলছে। কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বাসন্তী, চন্দনপিঁড়ি, কুমিরমারি, পাথরপ্রতিমা, সাজজেলে, মোল্লাখালি, সন্দেশখালি, তুষাখালি, ধামাখালি, ভাণ্ডার খালি, হাটগাছা প্রভৃতি অঞ্চলে। এ লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে বছর পঞ্চাশ-পঞ্চান্নর ভাগচাষী জমির আলি। তাদের নেতা বসিরহাট-হাসনাবাদের হেমন্ত ঘোষাল। ফসলের ভাগ নিয়ে মালিকের সাথে চাষার লড়াই। ফসলের এক ভাগ হবে মালিকের, দুভাগ হবে চাষীর, মাঠে মাঠে তখন প্রাণ জুড়ানো ধান-হালকা সবুজ ও সাদার মিশ্রণে কচি ধানের শোভা। মালিকের সঙ্গে চাষাদের চোরাগোপ্তা মারামারি। জোতদার, পুলিশ জোটবদ্ধ চাষাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে নেড়া হেমন্ত ঘোষাল। এইসব অতীতের কথায় রচিত হয়েছে এই উপন্যাসের





বীজতলা। নেতাকে বাঁচাতে জমির আলিরা গা ঢাকা দেয়। নরখাদক পুলিশেরা পিছু ধাওয়া করে। সেই রাতে দলছুট একটাকে সাবড়ে দেয় জামির আলি। হেমন্তদার নির্ভয় নির্দেশে গ্রাম ছাড়ে সবাই। শুধু জামির আলি বাদে। তার বৌ ছমিরোন যে আটমাসের পোয়াতি।

বউ ছমিরোন তাকে পালিয়ে যেতে বলে। একটা গাদার তলায় ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে জমির। সব দেখে। পুলিশ এসে মেয়েদের গায়ে হাত দেয়। ছমিরোন বঁটি তুলে এক নরখাদকের হাত কেটে নেয়। পুলিশ ছমিরোনের পেটে বুলেট ঢুকিয়ে দেয়। খুঁচিয়ে বার করে শিশুর ভ্রূণ। জামির আলি গাদার তলা থেকে সব দেখে বোবা ও বধির হয়ে যায়। কোনো চিকিৎসায় আর কাজ হয়নি। তেভাগায় পরাজিত হয়ে নিজের গ্রাম ধুচনি খালিতে আর ফিরে যায়নি জামির। নেতা হেমন্ত ঘোষাল তাকে বসিরহাটের উপকণ্ঠে সাংবাড়িয়া গ্রামে নিয়ে এসেছে। সেখানে ছেলেকে মানুষ করেছে বোবা-বধির জামির। ছেলে আমির আলি ভাগে-ঠিকে চাষ শুরু করেছে। পঞ্চাশ বছর পর সেই ভিটেতেই নাতি কওছারের বিয়ের তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

উপন্যাসের নবযুবক কওছার। অনেকটা হাঁসুলী বাঁকের উপন্যাসের করালীর মত। শক্তিশালী গ্রাম্য যুবক। ইঁট ভাটায় জন খাটে। কিন্তু সেই ছেলের ইচ্ছা চাষ শিখবে। তাই সোজা মাঠে গিয়ে বাপের হাত থেকে লাঙলের মুঠি কেড়ে নিয়ে বলে—

—সরোদিনি, আজ আমি চাষি

—মানে? ছেলের এমনধারা ব্যবহারে বাপ হকচকিয়ে গেছিল।

—মানে আবার কী হবে? শেখপো ভাল করো। ব্যস!

—শিখে কী করবি?

—শিখে আবার কী করবো, চাষ করব। চেরকাল তো আর তুমি পারবানা!

তারপর দেঁয়াশ মাটিতে জোঁয়ালে বাঁধা বলদ দুটোকে নিয়ে জোরালো চাষ দেয়। যুবতী মাটির সাথে রমনের স্বাদ পায় কওছার। নিজেই লজ্জিত হয়ে বলে—'অকোমান নিয়োনা মাটি, অকোমান নিয়োনা খোদা।' তারপর পাশের গ্রাম শ্রীনগরের কচি পেয়ারার মত নবযুবতী সাবেরার সাথে তার বিয়ের কথাবার্তা হয়। তাকে দেখেই কওছারের সর্বঅঙ্গ কেঁপে ওঠে। ঝলক দিয়ে বিয়ের পাত্রী একটা কথাই বলেছিল—

'—বলি লাঙল চষতি জানা তো মদ্দ? জমি চষতি পারো তো ঠিকঠাক? না পারলি আমারে পাবানা এই শুনে রাখো।' তারপর থেকে আরও গভীরভাবে লাঙল চষার কথা ঘনিয়ে আসে কওছারের। মাঝের দাঁড়ির মাঠে লাঙলের মুঠিতে আরও চাপ দেয় সে। ফলা পুঁতে যায় গভীরে। বুঝতে পারে এমন বয়সেই বুঝি মাটি গর্ভবতী হয়।

মাঠ-চাষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দিয়ে কাহিনী গড়ে তোলে সোহারাব। কখনও মনে হয়না ড্রয়িং রুমে বসে কৃত্রিমতার জালে জড়িয়ে তোলা এ কাহিনী।

বিয়ের রাতেই ডাগর সাবেরা কওছারকে পাগল করে দেয়। কতটা নাঙুলে হয়েছে তার প্রমাণ নিয়ে জানতে চায় ক' বিঘে জমি আছে তার। কৃষক পরিবারের মেয়ে সাবেরার

D/Saharab Hossan Sahitya Angn February 20119/51

জমি-অন্ত-প্রাণ। জমি চাই তার। এসব ভাগে ঠিকরে জমি নয়—নিজের নামে জমি। নারী আর জমি সমান। তার কথায়—'জমির ওপরই তো আংগা সোংসারডা পা সোদা করে দাঁড়াবে।'

জমি বরগা-রেকর্ড করতে বলে সাবেরা। নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে কওছার এগোতে পারেনা। বাপ-দাদার মতাদর্শ, ধর্মের সংস্কারে সে আটকে পড়ে। সবেরা পালায়। জমিহীন মানুষের সঙ্গে তার ঘর করার ইচ্ছা হয়না। সে বলে 'আমার দেহডা আতোডা ফাউ না। আগে বলো মদ্দা মানুষের মতন বাঁচপা লড়বা। তেবে এ গতরে হাত দেবো। নালি না।' কাওছার দেখে, কেঁদে যাচ্ছে সেই নারী।

পরে কওছার ভাগ্‌রা নিয়ে ধর্মের ব্যাখ্যা পায়। পরে সরকারও আইন পাশ করে—বর্গা আইন। সেই আইনের বলে দু বিঘে জমি পায় সে। এই নিয়ে বাপ আমির আলির সঙ্গেও চোটপাট হয় কওছারের। রক্ষণশীল বাপ এ অন্যায় কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। কিন্তু বুড়ো বোবা, কালা জামির আলি হাত তুলে পতাকা ওড়ানোর ভঙ্গি করে, যেন জিত হয়েছে তার।

সেই জমিতে এখন ধান হয়, পটল হয়। ফসলবতী মাঠকে দেখলে মন ভাল হয়ে যায় কওছারের। সাবেরা বাপের বাড়ি থেকে ফিরে এসে ফসল ফলানোতে মন দেয়। অথর্ব জামির দাদার নির্জীব পায়ে আবার বল ফিরে আসে। জোতদার নুয়ো মিঞারা পিছিয়ে পড়ে। কৃষক চাষাবাসা মানুষের নতুন জীবনে ইতিহাস রচিত হয়।

বাপ আমির আলি ছেলের বর্গা আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেনি। ছেলেকে পেটাতে চেয়েছিল। আর তখনি দাদা জামির আলি ছেলে আমির আলিকে পিটিয়ে মেরেছিল।

এরপর উপন্যাস জুড়ে জোতদার, জমিদারদের জমি ফেরত পাবার ষড়যন্ত্র। তারা ভাবে। এসবই ছোটলোকদের বাড়। এখনি তাদের মাথায় মুগুর মারতে হবে।

জমি জিরেত পেয়ে বউ সাবেরা আরও যৌবনবর্তী হয়। ভোররাতে সুরেলা গলায় কওছারকে ডাকে—সোনার মদ্দা পটল ফুল বলে। একসাথে জমিতে গিয়ে মদ্দা পটল ফুলের সঙ্গে মেয়ে ফুলের মিল-মিশ ঘটিয়ে দেয়। কচি পটলে খেত ভরে উঠতে দেখতে তার খুব ভাল লাগে। আনন্দভরা চাষার বউ সাবেরার গোলগাল মুখ দেখে খুশীতে দাদা জামিরও মাটি বাজাতে শুরু করে। সারা উপন্যাস জুড়ে মাটিকে কেন্দ্র করে শুধু মাটি বাজানোর খেলা। সারা অঙ্গ অথর্ব হয়ে যাওয়া মানুষটি কোন অলৌকিক জাদুতে সর্ব অঙ্গে অনেকটাই সাড়া ফিরে পায়। মাঝে মাঝে হাঁটতে ইচ্ছে করে। সারা মাঠ ঘাট দাপিয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে। 'তার প্রবল ইচ্ছা হয় লড়াই করে অর্জন করা কওছার ছাত্তারের জমির ওপর দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একবুক তাজা বাতাস নিতে।'

শরীরের এই পরিবর্তন মানুষ যাতে জানতে না পারে তাই সে গহীন গহন রাতে মাঝের দাঁড়ির মাঠে যাবে ঠিক করল। পরেএসে দাওয়ায় নিশ্চুপ বসে থাকবে পঙ্গু সেজে।

শুরু হল জমির আলির রাত-অভিসার। নেশার খেলা। কেউ কেউ জানতে পারল এই



অশরীরি চলাচল। পাড়াপড়শি জানাল—"গেরামে মাঠপরীর ভর হয়েছে।' গ্রামে গঞ্জে অকল্যাণ হবে। সাবেরা, কওছারও জানতে পারে এসব কথা। মাঠ পরীকে দেখার ইচ্ছা দেখার ইচ্ছাও হয় তাদের। বড় লোকদের লাগানো আমগাছের ছায়া পড়েছে তাদের জমিতে, পটলের বাড় বাড়ন্ত হচ্ছে না। চারিদিকেই অশুভ খবর। মেম্বার, প্রধান ও কিছু করছেনা।

মন খারাপ নিয়ে সে স্বামী কওছারের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে। তার সন্তান নেই। চাষী পরিবারের বংশ রক্ষা করতে সে কত মানত করে। উদাসীন তিন প্রহরে উঠোনে তাকিয়ে দেখে সবেরা—কে যেন তার শাড়ি নিচ্ছে, উঠোনে নাচানাচি করছে। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে দাদা জামির আলির কীর্তি। অবাক মনে তার প্রশ্ন—'তুই হাঁটতে পারিস? কথাও বলতে পারিস? কওছারকে সে ডাকতে চায়—দাদা বাধা দেয়। কাপুরুষ নাতির চেয়ে সাহসিনী সাবেরাই তার বেশি প্রিয়। মাতাল ঘূর্ণির মত সাবেরা দাদার কাঁধে চেপে পাক খায়। সন্তান-মাতাল হয়ে ওঠে সে। তার তলপেটে দাদার তেজের সোঁত চায়। দাদা ককিয়ে ওঠে—'নারে নাতবউ। এডা পাপ।'

—না, তেজের বংশ গভ্‌ভে ধরায় কোন পাপ নিকো দাদা।'

তারপর সাবেরা শরীরে দাদার সব তেজ ঢেলে নেয়। নইলে যে চাষাবাসার বংশ নির্বংশ হবে। চাষাবাসার লড়াই থেমে যাবে। দেহের ইজ্জত ঢেকে দেবার পর দাদা জামির আলি গাছ কাটা দা এনে দেয় তার হাতে। পটলখেতের পাশে সব আমগাছ ঝুড়ে দিতে হবে। মাঠপরী হয়ে সাবেরা সাবোর দাঁড়ি গিয়ে উথাল পাথাল সব আম গাছের ডাল কেটে দেয়। পেছনে দৌড়তে দৌড়তে কওছার বউয়ের কাছে গিয়ে বলে—'তুই উচিত কাজ করিছিল মাঠপরী। পালা, বউ পালা। সাবেরা আবার পালায়। প্রত্যেকবার যেন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই পলায়ন। জমি আর জায়গা। বাপের বাড়ি ছাড়া। 'পরদিন সকাল হতে না হতেই সারা তল্লাটে দুটো খবর একই সঙ্গে রাষ্ট্র হয়ে যায়—এক, মাঝের দাঁড়ির মাঠের সমস্ত আমগাছ কে বা কারা কেটে তছনছ করে দিয়েছে। দুই, দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকা জমির অলি জাদু-বলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।'

এইভাবে উপন্যাস শেষ হয়েছে। ঔপন্যাসিক নিজেই জানিয়েছেন—"উপন্যাস বহুকৌণিক আয়না সজ্জিত প্রাকোষ্ঠ। বাস্তবতার ফসল যে সামাজিক মানুষ, তাদের আমি ওই প্রকোষ্ঠে এনে জড়ো করি। আর সে প্রকোষ্ঠের বহু কৌণিক আয়নার মুখ দেখতে দেখতেই কেমন করে যেন, কিছু মানুষ, দু এক জন মানুষ, নিজেরাই বাস্তবতা সৃজন করে নেয়। এর মেম্বর প্রধান, পুরনো প্রধান, বড় মেম্বার, কওছার সাত্তার। আমির আলিরা হয়তোবা সামাজিক বাস্তবতার ফসল আর জামির আলি ও সাবেরা ওই বহু কৌণিক আয়না হয়ে মনে হয় বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে সৃজন করে নিয়েছে।"

সোহারাব হোসেন তাঁর অন্যান্য উপন্যাসেও বেছে নিয়েছেন গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষ। আসলে মানুষের মন, বিবেক, প্রেম সব জায়গার এক। অশিক্ষিত, গ্রাম্য হত দরিদ্র

মানুষের পাশে দাঁড়ানোই শ্রেয়, তাদের পাশে তেমন কেউ দাঁড়ায়না বলে। সেই খেটে খাওয়া শ্রমিক, কৃষকেরাই সভ্যতার অগ্রগতিতে অংশ গ্রহণ করে। বলা যেতে পারে তারাই সভ্যতার বনিয়াদ। আমাদের পূর্ব পুরুষরা তাদের শ্রম, কর্মকুশলতা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্ম কে এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্রকৃতি-লগ্ন সেই মানুষের জীবনকথা রচনা করে লেখক তাঁর রক্ত ঋণ শোধ করেছেন, বলা যায়। কুলি কামিন, মুটে-মজুর, জেলে, চাষী—সভ্যতার ধারকেরা তাঁর লেখায় উজ্জ্বল ভাবে চিত্রিত ও সম্মানিত হয়েছে।

এই উপন্যাসের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল—এর (ক) সুরমিশ্রিত গদ্য শৈলী (খ) আঞ্চলিক ব্যবহারিক ভাষা (গ) সময় ও জীবনের অকপট বর্ণনা (ঘ) অস্থির জীবনের চিরন্তন প্রকাশ (ঙ) প্রকৃতি ও জীবনের সৌন্দর্য্যময়তা। (চ) সামাজিক অনুশাসন ভেঙে সামনের দিকে পা বাড়ানো (ছ) বিপ্লবাত্মক মনোভাব।

কওছার-সাবেরার দুটি চরিত্র উপন্যাসের নায়ক নায়িকা হয়ে ওঠে। তাদের দ্বিধা দ্বন্দ্ব। ঝগড়া বিবাদ, প্রেম-মিথুন সব মহাকাব্যিকতায় উত্তীর্ণ। জীবন, মাঠ, মাটি, শরীর, ফসল, নেশা সব একাকার করে দেয় তারা। বিশেষ করে সাবেরা ফলন্ত শস্যের দেশে উন্মত্তের মতো। পরীর মতন রূপ হয় তার। কওছার ঘুম জড়ানো ভোরে বউয়ের দিকে তাকিয়ে বলে—'বেহেস্তের হুবীর মতোন তুই। সামান্য প্রাপ্তিতেই তারা সুখী দম্পতি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে নিরালা মাঝের দাঁড়ির মাঠে সাপের মতন তাদের শঙ্খ লাগে। নাজুক পটল খেতের মতন সাবেরা কলাবতী হয়। জীবনের শুষ্কতা, রুক্ষতার মাঝে এই জীবন মগ্নতার চরিতার্থ করার দর্শনই পাঠকের পরম প্রাপ্তি।

সাদামাঠ, সাধারণ জীবন নিয়ে কওছার এ উপন্যাসের এক সরল বাস্তবতা। তার হৃদয়ে অসীম কল্পনা নেই। আছে জীবনকে তুলে ধরার এক নির্ভীক নিরাসক্তি। উপন্যাসে প্রথম থাকা চাই জীবন, জীবন-বাস্তবতা, তারপর তার শিল্প-রূপ। এই উপন্যাসে জীবনের প্রাচুর্য্যই প্রথম শর্ত পূরণ করেছে। প্রতিটি গ্রামীণ মানুষই এই উপন্যাসে জীবনের লড়াই শিখিয়েছে। ঘটনা, আখ্যান, চরিত্র, কথোপকথন, সমাজ-প্রতিবেশ, রচনাশৈলী—সবকিছুর মধ্যে দিয়ে জীবনের এক সামগ্রিক বোধ ফুটে উঠেছে। যা ঔপন্যাসিকের অন্বিষ্ট। উপন্যাসের সব চরিত্রগুলি সমগ্রতার ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে।

সাবেরাও এই উপন্যাসে জীবন-প্রেমের উদাহরণ। জগৎ ও জীবনের প্রতি ছোট্ট একটি ভালবাসাতেই সাবেরা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। লেখক এই চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের মায়া সৃজন করেছেন। এখানেই উপন্যাসের শিল্পরূপের আদর্শ প্রতিফলন ঘটেছে। উপন্যাসের যবনিকায় জীবনের সমগ্রতা বিম্বিত হয়েছে। উপন্যাস শিল্পীর এখানেই রসসাধনার পরিণতি।

বিষয়বস্তু হিসাবে যে জনসমাজ এখানে নির্বাচিত হয়েছে, তা একেবারেই নতুন নয়। আবহমান কাল ধরে চাষা বাসা, কৃষক সমাজের জীবন। কৃষক আন্দোলনের কয়েকটা হাতে গোনা প্রেক্ষাপট। এখানে সেই বক্তব্য কয়েকটা পৃষ্ঠাতেই সীমায়িত থাকতে পারত। কিন্তু লেখক নিরন্তর জীবন ধারার মাঝে প্রকৃত জীবন-বিষয়ক-বক্তব্য খুঁজে পান। যা অভিনবত্বের



স্বাক্ষর বহন করে। যেমন সঙ্গীতের মাত্র সাত সুরের মাঝেই সঙ্গীতকারের নতুন নতুন সুর খোঁজার প্রয়াস। প্রকৃত সঙ্গীত শিল্পী এই সাত সুর নিয়েই, মন-ছোঁয়া সুর লাগিয়ে দেন। সোহারাব হোসেন 'মাঠ জাদু জানে' তে সেই অভিনব সুরটি লাগিয়ে দিয়েছেন বা বলা যেতে পারে সঠিক সুর ও জীবনের মায়াজালে সেই সুরটি লেগে গেছে।

উপন্যাসের গদ্য রীতিটিও জীবন-ঘনিষ্ঠ, স্রোতশীল, হৃদয়-গ্রাহী। নির্দিষ্ট একটি সমাজ ও সত্যে তা দ্রুত পৌঁছে দেয়। এখানে ভাষাব্যবহারে অতি যত্নশীলতা নেই, যা শিল্প রীতির বিচারে একটি ত্রুটি হিসাবে গণ্য হত। বরং বলা যায় উপন্যাসটি এই নিরাবরণ, স্বতস্ফূর্ত কথ্য চলনটি এই উপন্যাসটিকে স্বাদুতা ও সার্থকতা দান করেছে।

এই উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে বলা যায়—স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসের পরিধি বর্ধিত হয়েছে। অতি সাধারণ মানুষ ও তার সাদামাঠা জীবনকে নিয়ে এক শক্তিশালী লেখক বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি উপহার দিয়েছেন। এ উপন্যাস কালজয়ী হবে কিনা পরবর্তী যুগের পাঠকই তা বিচার করবেন। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল, প্রান্তিক জনসমাজ, তাদের আঞ্চলিক ভাষা-ছাঁদ উপন্যাসে উল্লেখিত হলেও, একে বোধ হয় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। উপন্যাসের পাত্র পাত্রী গ্রাম, শহর সর্বত্র থেকেই আহরিত হয়। সামান্য ভাষা প্রয়োগের হেরফের ঘটলেও জীবনের মৌলিক দিকগুলিই এখানে ভাস্বর। গ্রাম ঘেরা, মাঠ-ঘেঁষা সমাজবদ্ধ মানুষগুলির জীবনের নানা রঙ নিয়ে এটি একটি সামাজিক উপন্যাসে বিন্যস্ত। পরিবার, জন্ম, মৃত্যু, লড়াই। জীবন-সত্যের অনুরণন সামাজিক উপন্যাসের অপরিহার্য দিক। সবুজ মাঠকে ঘিরে জীবনের চির শাশ্বত ইন্দ্রজাল এখানে মায়াবী রঙে উদ্ভাসিত। সার্থক এই উপন্যাসের রোমাঞ্চকর উপস্থাপনা। জীবন রসের অনন্য উচ্ছলতায় মাঠ জাদু জানেয় ষোলকল পূর্ণ। লাঞ্ছিত, রিক্ত, অদম্য জনজীবনের বিজয় গৌরবের ইতিহাস এই উপন্যাসটি। কাদা-মাটি মাখা, মৃত্তিকাজীবি মানুষের চিরন্তন দলিল ড. সোহারাব হোসেনের 'মাঠ জাদু জানে'। সকল যুগের পাঠকই এর চিরন্তন জীবন রসে সিক্ত হবে আশা করা যায়।

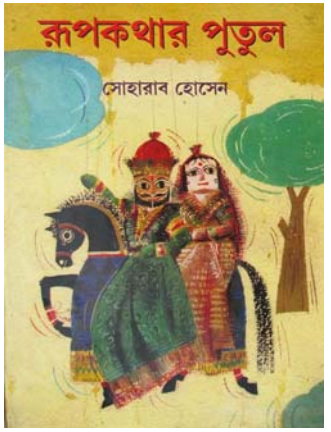

নবনীতা বসু

## ‘সহবাস পরবাস’ : ভোগ-স্বার্থমগ্ন প্রেমহীন জীবন

(১)

দৃশ্য এক : বহুতল আবাসনের এক ফ্ল্যাটে অশীতিপর নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের দুই দিন পর দেহ-উদ্ধার। এক মাত্র সন্তান বিদেশে কর্মরত।

দৃশ্য দুই : শহরের রাস্তার ধারে এক যুবতীর ক্ষত-বিক্ষত দেহ। গতরাত্রে সে ধর্ষণের শিকার।

দৃশ্য তিন : বহু পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের সন্দেহে স্ত্রীকে নৃশংস খুন স্বামীর।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই ঘটনাগুলির নিত্য যাতায়াত। রোজকার এহেন দৈনন্দিন সংবাদে আমরা অভ্যস্ত। আজ আমরা অবাক হই না, বুঝতে অসুবিধা হয় না এর পিছনের কারণগুলো কী—

কারণ এক. চরম আত্মসর্বস্বতা, কারণ দুই. ভোগসর্বস্ব জীবন, কারণ তিন. মানুষে-মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন।

বিশ্বায়নের যুগে এই ত্রিকৌণিক সমস্যার সমাধান হতে পারে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার চকমকি পাথরের ছোঁয়া কিংবা ঈশ্বর নির্ভর শাস্ত্র-আখ্যানের তত্ত্ব-ব্যাখ্যান বা যুক্তির রঙিন মোড়ক। যুগের হাওয়ায় এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এক বুক শূন্যতা, একাকীত্ব আর নিঃসীম ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। আসলে বিনোদনের মায়াবী আলোয় আমরা হারিয়ে যাচ্ছি ক্রমাগত। বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেহ-মন। নিজেদেরকে নিয়ে এক অদৃশ্য খেলায় মেতে উঠেছি আমরা। কখনো সেই খেলায় আমরা নিজেরাও পুতুলে পরিণত হচ্ছি। সব জেনে বুঝেও ফাঁদ পাতা ভুবনে নিজেদের দেহ-মনকে বিকিয়ে দিতে কুণ্ঠা নেই আমাদের। ভোগে-স্বার্থপরতায়-হিসেবি মনের চুলচেরা বিশ্লেষণে আমাদের একান্ত সহাবস্থানও মুচড়ে ভেঙে পড়ছে। একই মানুষের মধ্যে বহুত্বের সন্ধান কিংবা অবস্থান আমাদেরকে বিভ্রান্ত করছে।

এই পরিবর্তনশীল মানুষ ও নষ্ট সময়কে সঙ্গী করে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে যিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে নতুন সংজ্ঞার আধারে নব নির্মাণ করেছেন তিনি সোহারাব হোসেন, ‘মহামরণ’, ‘সর আলির ভুবন’,‘বায়ু তরঙ্গের বাজনা’র স্রষ্টা, নতুন পথের যাত্রী। আন্তর্জাল দুনিয়াতে যে সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্যকে ভেঙে দিয়ে, বাজার নিয়ন্ত্রিত মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দেয়, সোহারাব হোসেন সেই ভাঙনের, সেই দুঃস্বপ্নের বার্তা দেয় গল্পে-উপন্যাসে-কবিতায়। তাঁর লেখায় কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে সমকালীন সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি। এর অনুকল্প হিসাবে আসে উগ্র আধুনিকতা, ভোগবাদ, যৌনতা, সন্ত্রাসবাদ ও পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন। তিনি নিজেই বলেন, ‘আমার কেবলই মনে হয়, আমার সময় পোকালাগা সময়। কত বিচিত্র সব পোকা-কাম-ক্রোধ-লালসা-বাসনা-দ্বেষযুক্ত প্রবৃত্তির পোকা,





সাম্প্রদায়িকতার পোকা, ভোগসর্বস্ব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পোকা, সমাজবিরোধী ও সন্ত্রাসবাদীর দাপটের পোকা, রাজনীতির ভগবানরূপ সুবিধাবাদের পোকা, যন্ত্র-প্রযুক্তির কামড়বিদ্ধ স্বার্থ-সর্বস্ব মানবত্ব ও মনুষ্যত্বহীনতার পোকা।.....এই পোকা লাগা সময় দ্রুত, অতিদ্রুত আমার চারপাশের সমাজকে ও মানুষকে পালটে দিচ্ছে।”

—ভাবনার এই বিশেষ ধরণ আমাদের স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় কতখানি সময়-সচেতন এই ঔপন্যাসিক। লেখা তাঁর কাছে এক বিশেষ দার্শনিক ও নান্দনিক প্রজ্ঞার উদ্ভাস। আসলে গ্রামীণ পরিবেশে বড়ো হওয়া এবং সাহিত্যে অধ্যাপনা বলেই হয়তো তিনি এতো নিখুঁতভাবে, এতো যত্নের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষকে, মানুষের লোকায়ত জীবনকে—সমাজ, সম-সময়কে প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তারই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে।

‘সহবাস পরবাস’ উপন্যাসে ঔপন্যাসিক জীবন, মনন-সময়সম্পর্কিত প্রতীতি বিচিত্র রঙে-রূপে-রেখায় ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের প্রবেশক বয়ানে তিনি লিখেছেন :

“লেখায়, শিল্পে, আমার অভিভাবক অস্তিত্বের অতিথি দুই বক ‘বগাবগী’ বেশ কিছুকাল ধরে এই সঙ্কেত দিয়ে যাচ্ছিলো যে—যুগটা সহাবস্থানের নয়, সহবাসেরও নয়। তীব্র ভোগবাদি, চরম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আর হিসেবের ম্যাজিক—সিঁড়ি, এখন আমাদের নৈমিত্তিক সহাবস্থানকে ভেঙে দিচ্ছে। দিয়ে সহবাসকে করছে পরবাসে পরিণত।—তো অস্তিত্বের অতিথির এই সঙ্কেতেই জন্ম হলো সহবাস পরবাসের।”

—কথাগুলি পড়তে পড়তে আমরা পাঠক সমাজ বুঝতে পারি, ঘুণধরা এই সমাজে, ‘পোকা খাওয়া সময়ের নানা ধরনের দ্বৈত অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ এই জীবনের প্রত্যেক রূপের মধ্যে ঔপন্যাসিক মানুষের অদেখা-অচেনা—অনাবিস্কৃত স্বরূপকে তাঁর আখ্যানের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বীতশোক-কোলাম মাওলা-ঋষিণ-বিয়াস-রূপসা-মনীষা-আফ্রোজা-চন্দ্রাবতী এরা কোনো বিচ্ছিন্ন একক সত্তা নয়। এরা প্রত্যেকে মিলে যেন জীবন সম্পর্কিত একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছে।

২

সহবাস পরবাস :

“নদী শুকালে সভ্যতায় খরা নামে। নদীখাত স্রোতহীন, প্রবাহহীন হলে সভ্যতার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায়।”

“সব মানুষের ভিতর নদী থাকে। পুণ্যতোয়া এক নদী। সেই নদীর প্রবাহই জীবনকে ধারণ করে।”

“সভ্যতার ওপর দস্যুতা করলে নদীরা হারিয়ে যায়। যায়ই। য্যামন বল্লুকা গেছে। কোথায় যে গ্যালো নদীটা। খুঁজে বের করতেই হবে।”

প্রাচীন নদী বল্লুকা। হারিয়ে যাওয়া এই নদীকে অন্বেষণের সূত্র ধরেই এগিয়ে যাওয়া সময়, নদীর গহ্বরে—নদীর অববাহিকায় ডুবে যাওয়া—ভেসে থাকা মানুষের মুখ ও মুখোশের আখ্যান ‘সহবাস পরবাস’, ২০০৬ সালের ‘উদার আকাশ’ পত্রিকার শারদ সংখ্যায় ‘সহবাসের মানুষ’ নামে প্রকাশিত। এই উপন্যাস সময়-সমাজ-সভ্যতা-মানুষের আশ্চর্য দর্পণ। এই

দর্পণে উন্নতি বনাম উন্নয়ন, মানুষ বনাম রাজনীতি, ভালোবাসা বনাম সম্ভোগ, নদী বনাম বাঁধ, সভ্যতা বনাম সভ্যের এক সুদীর্ঘ প্রতিবিম্ব—নদীর রূপকে মানুষের বোধ—বোধহীনতার, প্রেম-অপ্রেমের সংহত, পরিণত বিস্তার। বল্লুকা নদীর বয়ে চলা জীবনকে খোঁজার অনুষঙ্গে আমরা পাই বৌদ্ধ মিথের নতুন ব্যবহার। এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছেন রাজনীতির উত্থান-পতন, রাজনীতি-ব্যবসায়ীদের লাভ-লোকসানের খোলা বাজার। এই সমাবেশে আছেন বীতশোক, আফ্রোজা, ঋষিণ, রূপসা, গোলাম, মাওলা প্রমুখ। ছয়টি পরিচ্ছেদের এই উপন্যাসে কথাকার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন ভোগবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের মিথ্যা ভণ্ডামি, হিংস্রতা, আত্মরতির নগ্নতাকে এবং হিসেবি মনের ইচ্ছাপূরণের আয়োজনকে।

বীতশোক, শ্রী বীতশোক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁকে লেখক 'ঝানু কমরেড' বলেছেন, তিনি হঠাৎই একদিন সকাল দশটায় গৌতম বুদ্ধ হলেন। শুধু বুদ্ধদেব নন, 'বীতশোক-বুদ্ধদেব'। আমরা উপন্যাসে বীতশোকের অতীত ইতিহাস না জানলেও উপন্যাস পড়তে পড়তে আমরা অনুমান করতে পারি তিনি প্রথম জীবনে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতা ছিলেন। তিনি অকৃতদার, সত্তর বছর বয়স্ক অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। সারাদিন তিনি বই পড়েন। তাঁর আচরণে, ভাবনার স্বাতন্ত্র্যে পরিবারের সদস্যেরা তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তবে রাজনীতির জগতে তিনি একজন দাপুটে নেতা। সবাই তাঁকে সম্মান দেয় তাঁর আদর্শের জন্য। তিনি বিদগ্ধ, জ্ঞানী মানুষও বটে।

প্রাচীন নদী বল্লুকা অন্বেষণের দীর্ঘ সাধনায় তিনি বুদ্ধে রূপান্তরিত। বোধিলাভ তাঁর সম্পন্ন। এই বোধির পথ ধরে তিনি দেখতে পান বালান্দা পরগণার চারশ বছর আগেকার ম্যাপ, যেখানে বল্লুকা ছিল, ছিল ঘেউল্লাপেট্টা রহুড়াপট্টি, শ্রীনগ্গা শহর, মউল্যাপুরী, যশুয়াখটি, বাদুড়্যা কিংবা বেলিয়াধন্যা। আর এইসব জনপদের মধ্যে মঠ্টা-বন্দর (মেটে) রাজ-নন্দিনী, ইতিহাসের স্থানিক সভ্যতার সঙ্গে কথাকার এখানে বীতশোকের নদীভাবনার সঙ্গে ভোট ভাবনাকে মিশিয়ে দিলেন—

"—নদীর পরিবর্তে ভোট খুঁজুন!

—আমি তো তাই করছি!

—মানে!

—নদী খুঁজলেই ভোট খোঁজা হয়!.....

—নদীর ধারা বইলে জীবন বাঁচে। ভোট ফোটে খইখই!

—ফের?

—ফের নদী শুকালো তো সব শেষ। জীবন শেষ। জনপদ শেষ। ভোটও শেষ।"

—বীতশোক বোঝেন নদীভিত্তিক সভ্যতার কথা, মানুষের কথা। কিন্তু রাজনীতি তো তা বোঝে না। শুধু বোঝে ভোটের কথা, ভাগ-বাঁটোয়ারার কথা, বিশেষ স্বার্থ চরিতার্থতার কথা। বীতশোক ব্যতিক্রমী। তিনি চান না ঐতিহ্যের ব্যত্যয় ঘটিয়ে উন্নয়ন সম্পন্ন হোক। তাই মহেশপুর পঞ্চায়েত বিরোধী পক্ষের হলেও ঐতিহ্যের শর্ত মেনে ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি বদ্ধপরিকর। কথাকার গ্রামের মানুষ তাই গ্রাম—রাজনীতি



তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। এই চিরন্তন সত্যকে তিনি আঁকলেন পুরাণ, ইতিহাস, জয়-পরাজয়, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের রঙতুলিতে।

বীতশোক বল্লুকাকে খোঁজার পথ ধরে চলতে চলতে দেখতে পান নদীর তীরে-তীরে, জনপদের পথে পথে মোক্ষ-অভিলাষী দেহমুক্তির সাধকদের। তাদের কণ্ঠে 'আপণা মাংসে হরিণা বৈরী' গান। বীতশোকও সেই গানের অনুরণন শুনতে পান অন্তরাত্মায়। বোধে জেগে ওঠে এক গভীর জীবনদর্শন— 'নিজ সমৃদ্ধির কারণেই মানুষের পতন ঘটে। সমৃদ্ধি যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তা একদিন অঙ্গশোভার বিনয় ছেড়ে প্রবৃত্তির আকারে কিংবা অহঙ্কারে ও প্রবৃত্তি থেকে বাজতে থাকে পতনের স্বরাগম'। বীতশোকও অনুভব করলেন রাজনীতির পরতে পরতে এই গানের চমৎকারিত্ব। বিধায়ক—সাংসদ—রাজনীতিপুষ্ট প্রত্যেক মানুষই গোলকধাঁধার মধ্যে পথ ভুলেছে, তাদেরও যে কালের নিয়মে পতন অনিবার্য।

এই উপন্যাসের কাহিনি—কায়ায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে বুদ্ধ-আখ্যানকে সংযুক্ত করেছেন কথাকার। আমাদের অবাক লাগে বুদ্ধ-মিথের আশ্রয়ে লেখক কীভাবে সম্পর্কের ফাঁক-ফোঁকরকে উন্মোচিত করেছেন। গোলাম মাওলা তিনি বীতশোকের মধ্যে প্রাচীন ইতিহাস অন্বেষণের খিদে তৈরি করে দিয়েছেন, তিনি বলেন, 'বৌদ্ধদের ছিলো দুই মহামহ, মহাবিশ্ববিদ্যালয়। নালান্দা ও বালান্দা। বালান্দার, মানে আজকের হাড়োয়ার লাল মসজিদের তোরণ হিসেবে যেটা আজও দাঁড়িয়ে আছে ওটা বালান্দা মহামঠের প্রবেশদ্বার—বৈ-ভিন্ন-কিছু নয়।' আর বীতশোক মানশ্চক্ষুতে দেখেন দীক্ষাদানের শেষে রূপধর, প্রথা মেনে বলছে—'শোনো বাতুল.....'

বুদ্ধদেব-সুজাতা আখ্যান অমৃতসমান। পুণ্যতোয়া নিরঞ্জনা নদীর তীরে কঙ্কালসার গৌতম বুদ্ধকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক সুজাতা। এ কোন দেবতা বটবৃক্ষের নিম্নাংশ যেন দেবতা হয়ে গেছে। শিকড়ের সঙ্গে এই দেবতার দেহ একাত্ম। আর গৌতম বুদ্ধ কঠোর তপশ্চর্যায় যখন সাধনার যথাযথ পথ খুঁজে পাচ্ছেন না, মুক্তি অন্বেষণে দিশেহারা হচ্ছেন বারবার; ঠিক তখনই সুজাতার সঙ্গে সাক্ষাতে, পরমান্ন ভোজনে তৃপ্ত হলেন। সিদ্ধিলাভও করলেন। তাঁর কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হল মহামন্ত্র ধ্বনি— 'অতি ভোগ বা সমৃদ্ধি পতনের কারণ—আপণা মাংসে হরিণা বৈরী!'

কিন্তু আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কথাকার কেন এই কাহিনিকে সংযুক্ত করে দিলেন? আসলে নদী তো দর্পণ, এই দর্পণেই উদ্ভাসিত হয় নানা চেনা মুখ। স্রোতের আঘাতে চেনা মুখও অচেনা হয়। এক মুখ ভেঙে যায়, তৈরি হয় নানা মুখ; নদীর মতোই বয়ে চলে প্রাত্যহিক জীবন। এই জীবনেও নানা বাধা-বিপত্তি প্রতিবন্ধকতার স্রোত আছড়ে পড়ে। ঘাতে-প্রতিঘাতে জর্জরিত মানুষের মুখগুলি দুমড়ে মুচড়ে যায়। মুখোশগুলি ভেঙে যায় বারবার। জীবন-স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোন্ দূর দেশে। যে দু-একটা মুখ উদ্ভাসিত হয়, স্থির হয়ে জ্বলে ওঠে কোনো কুৎসা, কোনো রটনা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। গৌতমবুদ্ধ-সুজাতার আখ্যানে তো কোনো রটনা নেই। অথচ গ্রামীণ রাজনীতি, ক্ষুদ্র স্বার্থ বীতশোককে নিক্ষেপ করে নদীর কৃষ্ণগহ্বরে। আফ্রোজাকে জড়িয়ে উঠে আসে নানা কথা।

তবুও নদীর খোঁজে নিমগ্ন হয়ে বীতশোক-আফ্রোজারা। কারণ নদীই তো পারে সহবাসে সহবাসে মানুষের গর্ভে নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটাতে।

সময়ও বহতা নদীর মতো। সময়ের ধাপে ধাপে মানুষ আজ আধুনিক। মানুষ যতই আধুনিক হয়ে উঠছে ততই ভোগবাদের বিশাল মুখ তাকে গিল ফেলছে। উপন্যাসে ঋষিণ ভোগবাদী পুরুষ। কমার্সের ছাত্র হয়েও ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ তীব্র। কিন্তু এ আকর্ষণ তার নিজের তৈরি করা কৃত্রিম। মনে এক ব্যবসায়ী স্বার্থের গগনচুম্বী ইমারত গড়ে তুলে সে বীতশোকের কাছে শুনতে চায় নদীর কথা, নারীর কথা, নদী ও নারীর এক হয়ে যাওয়ার কথা—

"নদী মানে নারী, নদী মানে সভ্যতা। নদী মানে জীবনের টিকটিক গতি। নদী না-হলে জীবন শুকিয়ে যায়। জীবন হয় আনন্দহীন।"

কিন্তু ঋষিণের স্থূল হিসেবি মন বুঝতে চায় না বৌদ্ধ দেহতত্ত্বের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শনকথা। তার চোখে তখন মাটিয়ায় ভবিষ্যৎ হোটেল কিংবা পিকনিক স্পটের মালিকানার স্বপ্ন।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী ঋষিণের আদল বদলে যায় রাতারাতি। যে ঋষিণ ছাত্রাবস্থায় প্রেমের উদ্দামপথ পরিক্রম করে রূপসাকে বিয়ে করেছিলেন, একমাত্র পুত্র ঋতমকে নিয়ে সুস্থিত হয়েছিল জীবনের ক্ষেত্রে, সেই ঋষিণ আজ ব্যবসায়ী হিসেব-নিকেশের 'সিঁড়িটাকে ঠিক ঠিক জায়গায় সেট' করতে উদ্যত হয়। আর ঠিক এই মুহূর্ত থেকে রূপসার সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্ক হিসেবি স্রোতের ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে। শুধু রূপসা কেন, আফ্রোজার মতো বন্ধুকে সে আঘাত করে, বীতশোক-আফ্রোজাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে। কিন্তু আফ্রোজা ঋষিণের মধ্যেও নদীর প্রবহমানতাকে জাগিয়ে তুলতে চায়, ঋষিণকে দেখাতে চায় নদী ও নারী একই, একখাতে বয়ে চলা সৃষ্টির জীয়নকাঠি।

ঋষিণের স্ত্রী রূপসা। ইতিহাসের ছাত্রী সে। স্বামী, পুত্র নিয়ে স্বচ্ছল পরিবারের সুখী মানুষ হয়েও ক্রমশ শুকিয়ে যেতে থাকে সে ও তার নদীখাত। বল্লুকার সভ্যতা যেদিন বাণিজের বীর্যে দোলায়িত হয়েছিল সেইদিন থেকে একটু একটু করে শুকাতে শুরু করে বল্লুকার নদীপথ। আর অন্যদিকে ঋষিণের চোখে-মনে রূপসা যখন থেকেই ভোগের বস্তু, তখন থেকেই রূপসার শরীর-মন বিশুষ্ক নদীখাতের মতো খটখটে। কী অসামান্য নিপুণতায় কথাকার নদী-শরীরে নদী-মনকে প্রতিষ্ঠিত করে দিলেন। কখনও মনে হচ্ছে মনই 'নদী-পুরুষ'। যে নদী গ্রীষ্মে শুকায়, বর্ষায় স্ফীত হয়, দোলায়িত হয়, ছন্দ-তরঙ্গে নেচে ওঠে, সেই নদীই বলে বসে—'তোমার সঙ্গে নিস্ফল সম্ভোগ আমি চাই নে।' নদীতো এইভাবে বয়ে চলে, সমৃদ্ধ হয়ে, মজে যায়, হারিয়েও যায়।

আসলে রূপসা, আফ্রোজা এরা প্রত্যেকেই এক-একটি বল্লুকা, এক-একটি নদী, একদিন বল্লুকা হয়েই যেন রূপসা ঋষিণকে বলেছিল— 'ঢাকা-শহর নারীর গোপনাঙ্গ—নদীখাত। একদিকে ইছামতি আর একদিকে বিদ্যাধরী ললনা—রসনা য্যানো। তার মাঝখানে অবধূতিকা বল্লিক। আমার গোপনাঙ্গ—সে-নদীর ঘাট। শুদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষ না হলে এ নদীকে জীবন্ত করা যায় না।' আর আফ্রোজা নদী-অন্বেষণের পথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে



বীতশোক—'নদী-পুরুষ'-এর সঙ্গে, শুনতে চেয়েছে প্রকৃত সাধকের মন্থনে 'মহাপদ্ম' কীভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে—'পদ্ম হলো বালান্দা মঠ। কুলিকা তথা বজ্র হলো মঠটা মঠ। এরাই মিলনের ললনা-রসনা দুই নাড়ি। দুই নাড়ির নাম বিদ্যাধরী আর ইছামতি। এদের মাঝখানে ছিলো অবধূতিকা স্বরূপ বল্লিক। জঘন চেপে বিদ্যাধরী ইছামতি যে রতিক্রিয়া করতো তাতে মহাসুখ-রূপ বল্লুকা গতিপ্রাপ্ত হতো-খরতোয়া হতো।'—কী চমৎকারভাবে বল্লুকা মিশে যায় সিদ্ধাচার্য সুন্দরীপা ও কাহ্ন পা-এর দেহতত্ত্বের গানের সঙ্গে, আফ্রোজার সত্তার সঙ্গে।

সময় ও নদী—পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একে অপরের অভাবেই বিপনন হয় দেশকাল-সভ্যতা, নিশ্চিহ্ন হয় সংস্কৃতি, ধ্বংস হয় নদীর সৃষ্টি রহস্য। তাই যেদিন ক্রোধ ও পরাজয়ের বশে ঋষিণ ক্ষুধার্ত কুমির হয়ে শুকনো নদীখাতকে চষে ফেলেছিল, মাটির চাঙড় তুলেছিল সেদিন যে আমরা শুনতে পেয়েছিলাম গোলাপ মাওলা স্যারের কথা—'এটা তোমার দোষ নয়, ঋষিন্ত সভ্যতার দোষ!...নদী আর নারী একই। দুটোই বয়ে চলে কলকল। দুটোই সৃষ্টি করে, জন্ম দেয়, সভ্যতার পর সভ্যতা। তারে তোমরা নিস্ফলা করছো। সভ্যতারও ওপর বসাচ্ছো বাণিজ্যকে। বিলাস আর ভোগকে'। এই বিলাস ও ভোগই নদীকে খুন করে। নদী বিলীন হয়ে যায় চিরকালের জন্য। শুধু নদীইবা কেন। নদী-অববাহিকতার মানুষগুলোও যেন হারিয়ে যায়। আর আমরা আফ্রোজা-গোলাম মাওলার মতো নিশ্চুপ হয়ে দেখি—'কলকল করে বয়ে-যাওয়া পুণ্যতোয়া নদীটি শেষবারের মতোই হারিয়ে যাচ্ছে য্যানো!'

আসলে বীতশোক। আফ্রোজা, গোলাম মাওলা, রূপসার মতোই প্রত্যেক মানুষ নদী খোঁজে, নদীকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়, থাকতে চায় নদী হয়েই, নদীকে ধারণ করে দেহ-মনে নদী হতে চায়। নদী তো হারায় না। দম্ভে, আদিম প্রবৃত্তির তাড়নায় আমরাই নদীকে হারিয়ে ফেলি। একথা বুঝেছিল বীতশোকরা। আর তাই উপন্যাসের শেষে লেখকের চাপা দীর্ঘশ্বাস থাকলেও বল্লুকাকে, নদীকে আমাদের দেহ-মনের খাতে প্রাণবন্ত, জীবন্ত করে প্রবাহিত করে দিতে চান। আমরা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ও অন্বেষী মানে নিয়ে নদী খুঁজে ফিরি বারবার নানা পথে, নানাভাবে.....।

৩

জন্মজুয়া ঃ

"পাশা, এ খ্যালায় জীবনের দান উল্টে যায়। ওপরের চাকা নীচে নামে। নদীর দুধজল কালো।"

"তোমার শরীরী প্রেমের বিষে আমার শরীর পচে গেছে। নষ্ট হচ্ছে এ যৌবন-আবাসন।"

"জীবনটা সাপ-লুডো খ্যালার রহস্য ছাড়া কিছু নয়।"

বস্তু-বিশ্বের স্বরূপকে বহমান কালের মাত্রায় প্রতিফলিত করে সোহারাব হোসেন বাংলা-সাহিত্যে প্রতিস্রোতের বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছেন। তাঁর 'জন্মজুয়া' উপন্যাস কেবলমাত্র ঔপন্যাসিক বৃত্তান্ত নয়। এ আসলে নতুন সাংকেতিকতায় ঋদ্ধ এক কাহিনি।

রামায়ণ-মহাভারত যুগ থেকে চলে আসা সম্পর্ক বিনাসের চলচ্ছবি, নারীর অবমাননাকর

অবস্থানকে কথাকার আধুনিকতার নিরিখে নির্মাণ করেছেন। মানবিক সম্পর্কের বিচিত্র দ্বান্দ্বিকতা থেকে তৈরি হয়েছে এ কাহিনির যাত্রাপথ। এ পথের বিন্যাসে রয়েছে শূন্যতা ও দহনের নানা মাত্রা। এ কাহিনি সময়-সমাজের স্খলন ও পচনের আমোঘ বৃত্তান্ত। যেখানে পুরুষের প্রভুত্বে ও নারীর ইন্ধনে এক নারী জুয়া খেলার গুটিতে পরিণত হয়। সোহারাব একেই ঝলাসানো বাস্তবের আধারে পরিবেশন করেছেন পাঠকের সামনে। 'জন্মজুয়া' উপন্যাস 'জুয়া' নামে 'আরম্ভ' পত্রিকায় ১৪১২ সালের ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের শুরুতে আমরা দেখি দশবছরের মৃত্তিক ইতিহাস—মহাভারতের ইতিকাহন পড়ছে। সন্ধ্যের জেলা-শহরের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই মৃত্তিকের সমবয়স্করাও সেই কাহিনি পড়ছে এক যোগে এক সুরে। যে কাহিনিতে রয়েছে এক নারীর আত্মমর্যাদা রক্ষার লড়াই। সেখানে যুধিষ্ঠির শকুনির চক্রান্তের শিকার হয়ে দ্রৌপদীকে জুয়া (পাশা)র দান হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু মৃত্তিক এই পরিচিত প্রচলিত ধারণার বহির্ভূত নতুন কথোপকথনের প্রস্তাবনায় উপস্থিত। সেখানে দেখি—

"—তবে এ খ্যালার নাম কী?

—পাশা। এ খ্যালায় জীবনের দান উল্টে যায়। ওপরের চাকা নীচে নামে। নদীর দুধজল কালো হয়।

—আর, আর কী হয়?

—ফর্সা রাজা কালো হয়। কালো রাজা ধলো হয়।"

আমরা লক্ষ্য করি কথাকার মৃত্তিকের মাধ্যমে যেন ঐতিহ্যের চিরায়ত থেকে সময় বাহিত নতুন প্রজন্মের কাছে মহাভারতকে, মহাভারতযুগীয় নারীকে এবং সেই সঙ্গে বর্তমানের আধুনিক নারীকে নতুনভাবে আবিষ্কার করার সূত্র দিয়ে দিলেন।—এরপরই উপন্যাসের প্রধান তিন চরিত্র বিয়াস-মনীষা-চন্দ্রবতী মহাকাব্যীয় জগৎ থেকে বাস্তবের মাটিতে উপস্থিত হয়। কথাকার মনীষা-বিয়াসের মুখ দিয়ে ইঙ্গিতময় বাচনে নির্মম বাস্তবের একান্ত সত্যকে বলিয়ে নেন—

"—বালকেরা তো খেয়ালের ডানায় ভর করে আকাশে উড়বে, তেপান্তরের দেশে যাবে, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমির সঙ্গে গল্প করবে, পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চড়ে স্বর্গে যাবে।

—আর নরকেও যাবে!.....খেয়ালের ডানায় উড়ে-উড়ে বহুগামী হবে, তাইতো?"

মেধাবী ছাত্র মেডিক্যাল পাঠরত তিরিশ বছরের বিয়াস পনেরো বছরের মনীষাকে সরকারী নিয়মে খাতায়-কলমে বিবাহ করে। এই বিবাহ শুধুমাত্র কিছু বাবা-মা'র অত্যাধুনিক খেলায় জেতার চাবিকাঠি। যুগের স্রোতে মনীষার মা চন্দ্রাবতী মেয়েকে টোপ করে গৃহশিক্ষক বিয়াসকে জামাই করে ঘরে তুলেছে। 'কুসুমাঞ্জলি' অ্যাপার্টমেন্টের প্রায় প্রত্যেকে এই রকম আধুনিক খেলায় হার-জিতের নেশায় বুঁদ হয়ে আছে। টোপ মেয়েরা, আর চার হিসাবে ব্যবহার করেছে তাদের সদ্য ফোটা কামনাকে। এ খেলায় চন্দ্রাবতী বিজয়ীর হাসি হেসেছিল। টোপ গেলার পরপরই চন্দ্রবতী রিক্স না নিয়ে বিয়াসের সঙ্গে মনীষার গোপন রেজিষ্ট্রি বিয়ে



দেয়। মনীষাও প্রথম প্রথম কামের এই বিচিত্রখেলায় একটা একটা করে কৌশল দেখাতে দেখাতে ঢুকে পড়েছিল খেলার প্রধান মাঠে। কিন্তু এখানেই ঘটলো বিপদ। প্রথমদিকে কামের সেই টিটোফেনি বা সিম্ফোনি মেজাজ এখন আর নতুন সুরে গাইতে নারাজ ব্যস, ভেঙে পড়লো বিয়ে খেলার অসর। শুরু হল 'সম্পর্ক ভাঙা-গড়ার রোজনামচা।'

মনীষা আধুনিক বিশ্বের নারী, সে চেয়েছে অনিচ্ছুক সহবাস থেকে চিরতরে মুক্তি। সে এই মুক্তির ডানায় ভর করে যৌনজীবনে স্বাধীন হতে চেয়েছে, প্রয়োজনে বহুগামী হতেও তার আপত্তি নেই। চন্দ্রবতীকে সে জানায়—এ সবই 'বন্দী মনটাকে একটু মুক্তি দেবার লড়াই।' এই মনীষা সীতা, সাবিত্রী বা দ্রৌপদীর মতো দিন যাপন নয়, চেয়েছে ডায়না কিংবা তসলিমার মতো জীবনকে উপভোগ করতে—'পূর্ণ নারীত্বের আস্বাদ নিতে—'পূর্ণ নারী। আমি বুঝতে পারছিলাম আমার মধ্যে, নারীত্বের খোলা গেট দিয়ে, পরপর ঢুকে যাচ্ছে অবহেলিতা সীতা, অপমানিত দ্রৌপদী আর নিজের ওপর স্বেচ্ছা-সন্ত্রাস ডেকে নেওয়া নারী ডায়না!!'

বিশ্বায়নের যুগে মনীষা রতির আধুনিকীকরণ। যে রতি প্রবৃত্তিকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে কামনার সংরাগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, ভাসিয়ে নিয়ে যায় অদম্য সঙ্গমের স্রোতে, মনীষা এ রতি নয়। মনীষা পুরুষদেহে যেমন কামনার আগুন জ্বালাতে পারে, তেমনি সেই পুরুষকে বলেও দিতে জানে 'ছাড়ো, তোমার পরশে বিষ আছে, আমার গা জ্বালা করছে।' এক পুরুষ নয়, যাযাবর-মধুকরকেও সে ভোলায় কামনাদীপ্ত শরীরী বিভঙ্গে। আসলে মনীষা গতানুগতিকভাবে বয়ে চলা জীবনের পাল্টা স্রোত। সে গুরুত্ব দেয় মনকে। যে মন পরিবারের অন্যান্য হিসেবি মন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই মনের দাবি মেনেই জীবনকে সে হিসেবি—পঙ্‌ক্তিতে শৃঙ্খলিত করে রাখেনি, বরং এই মন নিয়ে চরম ও পরম স্বাধীনতা—যৌনতায় স্বাধীন হতে চেয়েছিল। সে বিয়াসের কাছে ডিভোর্স চেয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সহবাসকে তার অবৈধ ঠেকেছে, তার কাছে বিবাহ ধর্ষণের অধিকার বৈ কিছু নয়—

১. "—মনে রেখো তুমি সীতা-সাবিত্রীর দেশের নারী।

—বিশ্বায়নের যুগে এসব বস্তাপচা সেন্টিমেন্ট অচল।

—মানে?

—মানে আমি সীতা-সাবিত্রীর নয়, ডায়নার আদর্শে বিশ্বাস করি। চাই মুক্ত জীবন।'

২. "আমি জীবনটাকে জুয়া হিসেবেই মানি। আমাদের দিন-রাত্রির সমস্তটা সময়ে আমরা পাশাখেলার দুরি-তিরি-ছক্কা-পাঞ্জার মতোন গড়াগড়ি খাচ্ছি। দান হয়ে পড়ছি। সে-দানে এখন আমার ছক্কার যুগ চলছে। তুমি এখন ফক্কার ঘরে। তোমাকে নিয়ে আমার শতরঞ্জ খ্যালার দিন শেষ!"

৩. "জীবনটা সাপ-লুডো খ্যালার রহস্য ছাড়া কিছু নয়। বুঝলে? সাপের মুখে দাঁড়িয়ে ছক্কার চালই ফেলতে হয়। প-য়ের নয়।"

—সর্বব্যাপ্ত ভাঙন, ব্যধিগ্রস্ত সময়ের এ এক অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া!! বিয়াস মধ্যযুগীয়

প্রভুত্বকামী পুরুষ, নারীর উপর নিজের অধিকার কায়েম করতে বারবার কলের পুতুলের মতো মনীষার দেহের উপর ঝাঁপ দেয়, অক্টোপাসের মতো পেঁচিয়ে ধরে রসটুকু নিঙড়ে নিতে চায়—'ইভের মতো নিষিদ্ধ ফল খেতে আমি উদগ্রীব এখন।'

'বিয়াসের ডায়েরির জরুরি অংশ' পড়লে আমরা বিয়াসের মধ্যে বহুস্তরীয় কামনাদগ্ধ একজন মানুষকে খুঁজে পাই। অস্তিত্বের সংকটে, পড়া একজন মানুষ। যে নিজেকে ভাবে 'প্রেম পাগল বুড়ো কাম জ্বলুনি মরকুটে', 'ঘাটের মড়া'। নিজের চেহারাকে নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগে বিয়াস। আর এই হীনমন্যতা থেকে কখনো সে আত্মহত্যার কথা ভাবে আমার কখনো গায়ের জোরে মনীষাকে সম্ভোগ করে। খুব গভীর চরিত্র না হয়েও বিয়াস আমাদের পাঠকের মনে একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে।

উপন্যাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনির নতুন ব্যাখ্যা। মৃত্তিকের নিজস্ব ভাবনা-কল্পনার সূত্র ধরে কিংবা বিয়াসের গল্প লেখার ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করে কথাকার রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রকে, বিষয়কে নতুন মাত্রা দেন। মৃত্তিক নিজস্ব যুক্তিবোধ থেকে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের উত্তর লেখেনা। তার মনে হয় সাগরকে বেঁধে ফেলা যায় না। যে ভূগোলের অ-আ-ক-খ জানে সেও সেতুবন্ধনের প্রশ্ন মন থেকে মানতে পারবে না। রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের তার কাছে জুয়ারই নামান্তর। লেখন-মৃত্তিকের এই চিন্তার সূত্র ধরে বিয়াস লেখে রামায়ণের নতুন কাহিনী—'বাল্মীকি বনাম বাল্মীকির মল্লযুদ্ধ'। যেখানে বাল্মীকি—পুরুষের দুই সত্তা। এক সত্তায় তিনি মহামুনি রূপে ঋতুমতী পূর্ণ নারী দেহে প্রেম-সাধনা-মমতা-রহস্যের ধুপছায়ায় মঙ্গলময় কাব্যগাথা রচনা করেন, আরেক সত্তায় রত্নাকর রূপে কামনা-প্রবৃত্তির রৌদ্রতাপে প্রবৃত্তির সংলাপ সৃজন করেন। এ কাহিনিতেই বিভীষণ-রামচন্দ্র প্রত্যেকেই জুয়া খেলায় সামিল। ভোগ-আত্মসর্বস্বতার এ এক নিদারুণ প্রকাশ। যাপিত জীবনের বাস্তবতা থেকে অন্য এক বাস্তবতার সন্ধান দিলেন লেখক। যেখানে রয়েছে ভোগবাদ—বিশ্বায়ন—পণ্যায়নের প্রতিকারহীন সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিলেন রামচন্দ্রের সীতা, আর আধুনিক কালের মনীষাও। তবুও এর মধ্য থেকেই নারী জীবনের পাঠ গ্রহণ করে, যাপিত জীবনে যৌনতাকে মুক্তির পথ হিসাবে মেনে নেয় এবং নারী-পূর্ণনারী মহাকাব্য হয়ে ওঠে—

"বলতে চাইছি দুই রামায়ণই নারীকে, মানে সীতাকে, ঠকালো।....য্যামন তুমি আমাকে ঠকিয়েছ অ-প্রেমে আর যাযাবর-মধুকর প্রবৃত্তি এবং দুই দিকের ঠকাঠকির অপরিহার্যতার আমি নারী, মনীষা, মহাকাব্য হয়ে উঠছি।"

আর বিয়াসের মধ্য দিয়ে মহামুণি বাল্মীকি বলেন—

"কেউ বুঝলো না আমাকে। আমি চেয়েছিলাম। দৈবানুগ্রহে নয় প্রেমের সাধনবলে শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীকে উদ্ধার করুন। যে-কারণেই সেতুভঙ্গ-উপাখ্যান লিখেছিলাম! কিন্তু কেউ বুঝলো না।" —সময়ের ঘূর্ণিতে পাক-খাওয়া, পরিবর্তনের তালে—লয়ে বাঁধা মানুষের জীবনের অভাবনীয় জটিলতা ও আততির এরূপ নগ্ন প্রকাশ আমাদেরকে হতবাক করে।

বিয়াস-মনীষা-চন্দ্রাবতী—মনীষার বাবা প্রত্যেকেই প্রজন্মের রকমফেরে কোনো না



কোনো ভাবে জুয়ার অংশীভূত হয়ে পড়ে। কেউ 'জুয়ানারী'—নিজের শরীরকে- বিশ্বাসকে-সম্পর্ককে খেলার দান হিসাবে ব্যবহার করে, কেউ এই দান চালতেই বদ্ধপরিকর হয়, আবার কেউ এ খেলার নেপথ্যে দাঁড়িয়ে হার-জিতের বাজি ধরে বসে। উপন্যাসের উপসংহারে ঔপন্যাসিক পুরুষ-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ককে ভারত-পাকিস্তানের টেষ্ট ম্যাচের ভাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। বিশ্বায়নের দিনে ভোগের কোনো আব্রু, শালীনতা থাকে না। তাই মনীষা ও বিয়াসের মধ্যে স্থির হয়, ভারত জিতলে মনীষার উপর বিয়াস ঝাঁপিয়ে পড়বে পুরুষের সমস্ত দাবি নিয়ে। এই বাজিতে মনীষা হেরে যায়। যেমন হেরেছিল সীতা-দ্রৌপদীরা। চন্দ্রাবতী জামাইকে শিখিয়ে দেয় আদিম প্রবৃত্তি জাগানোর কলা-কৌশল। উপন্যাস-ভাষায় দ্যোতিত হয় ধর্ষণের, পাশবিকতার বার্তা। সে রাতে 'মনহীন দেহ সম্ভোগে'র এক অনিচ্ছাকৃত খেলায় মেতে ওঠে বিয়াস। নিশ্চিন্ত পৌরুষের পতাকা উড়ানের মধ্য দিয়ে জয়যাত্রা শুরু করে সে। কিন্তু এরপরই হোঁচট খাই আমরা, কথাকার লিখলেন ভারত-পাকিস্তানের সব খেলায় গড়াপেটার কথা। যুক্ত করলেন প্রতিবেদনের অংশ—'জুয়ায় লুটালো দেশের সম্মান'। বেরিয়ে পড়লো মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা ক্ষত-বিক্ষত, দগদগে মুখের ছবি, ক্ষোভে ফেটে পড়ে মনীষা বললো—"তোমার সকলে মিলে যে সম্পর্কের জাল পেতেছো তা বিষ! আর ওই বিষে আমার সারা দেহ নীল হয়ে গেছে।.....দাও এবার, ফেরত দাও আমার সেই অমলিন দেহখানি! আমার মনের সতীত্ব তুমিই নষ্ট করেছো।....."

—না, কথাকার উপন্যাসকে কোনো নেতিবাচক ভাবনায় শেষ করেন নি। বরং এক অতলান্ত জিজ্ঞাসার সামনে তিনি আমাদেরকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—

"গড়গড় করে পড়ছে মৃত্তিকা—'সাগরে সেতু বেঁধে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধার করেন!' পঙক্তিটি পড়ার পরই চকিত প্রশ্ন করে বালক —'সাগরে কি সত্যিই সেতু বাঁধা যায়, মা?'

৪

বাংলা কথাসাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন আকল্প থেকে নতুন নতুন শিল্পসম্ভাবনা নির্মাণের অন্যতম কাণ্ডারী ছিলেন সোহারাব হোসেন, সম্ভোগ ও অবিশ্বাসের বার্তা নিয়ে আসা বিশ্বায়ন কীভাবে ছড়িয়ে পড়ছে প্রতিটি জীবনে, জীবনের কোষে কোষে, কীভাবে বিষ-বাষ্পে অচ্ছল হচ্ছে আমাদের বোধ-চেতনা 'সহবাস পরবাস' তারই অসামান্য পাঠ্যকৃতি। এক মলাটের মধ্যে দুটি ক্ষুদ্র উপন্যাস—লেখক যতই বলুন 'বিষয়গত আন্তর পরম্পরাই দুটি নভলেটকে একত্রবাসে থাকতে বাধ্য করালো'—তা যে এক ভাঙন, ব্যাথি গ্রস্থ সময়-সমাজের নগ্ন প্রকাশ এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি। বিশ্বায়নের ভোগবাদের থাবা আমাদের অন্তরমহলকে তছনছ করে দিচ্ছে—সেই সমাজের, সেই সময়ের উপর লেখক যেমন আলোকসম্পাত করেছেন তার তুলনা বিরল। 'সহবাস পরবাস' কিংবা 'জন্মজুয়া'র সমস্ত কুশীলব আছে আমাদের প্রাত্যহিকে। সোহারাব যখন উপন্যাসের কাহিনিকায়ায় তাদের সাজিয়ে দেন, উপস্থাপনার সূক্ষ্মতায় তারা শিল্প হয়ে ওঠে, তখন তাদেরকে আলাদা করে

খুঁজে নিতে হয় না, বীক্ষার অন্তর্ভেদী আলোয় তারা জ্বলে ওঠে তাদের মতো করে প্রেম-অপ্রেম, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, অস্তিত্ব—অস্তিত্বহীনতার দ্যুতি নিয়ে। বিয়াস-মনীষাই হোক কিংবা বীতশোক-রূপসা-আফ্রোজাই হোক —এরা প্রত্যেকেই সময় দগ্ধ মানুষের দল। যারা কখনো ভাঙা-পোড়া-নষ্ট জীবনের ভেতর নদী খুঁজে পাওয়ার আনন্দে বিভোর হয়, আবার কখনো সেই নদী হারিয়ে যাওয়ার বিষাদে জীবনকেই জুয়ার দান করে। সোহারাবের উপন্যাসবিশ্ব এই জীবন-মননের স্মারক।

এক সৎ, আন্তরিক, পরিশীলিত মানুষ সোহারাব হোসেন। তাঁর সৃষ্টিও এইসব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে জায়মান। ভিন্ন সাহিত্যকৃতির নির্মাণে তিনি ক্লান্তিহীন পথিক যাঁর দীক্ষা ও বীক্ষা দগ্ধ সময়-সমাজ-মানুষের সৃজনী চেতনায় চিরজাগ্রত। সোহারাব হোসেন বড়ো অকালে জীবন-যুদ্ধে পরাস্ত হলেন, ছাত্রী হিসাবে, পাঠক হিসাবে এই বেদনার, এই আক্ষেপের কোনো প্রতিষেধক নেই।

**সহায়ক গ্রন্থ ঃ**

১। সহবাস পরবাস। সাহোরাব হোসেন। করুণা প্রকাশনী। প্রথম প্রকাশ। বইমেলা, ২০০৭।
২। আমার সময় আমার গল্প। সোহারাব হোসেন। পুনশ্চ, প্রথম প্রকাশ। বইমেলা, ২০০৮।

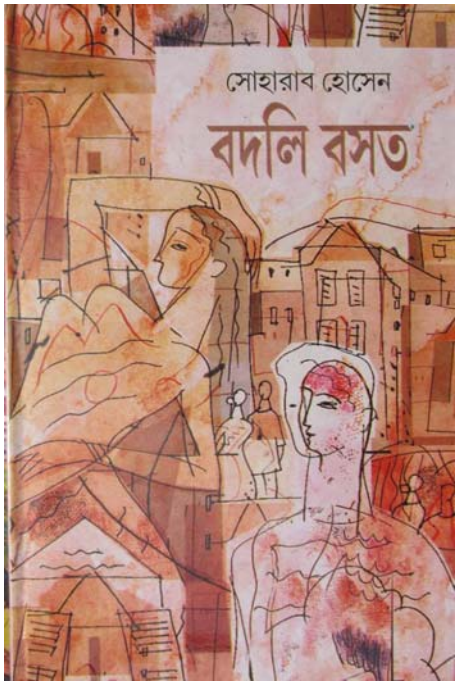


**পী যূ ষ কা ন্তি অ ধি কা রী**

## ‘দোজখের ফেরেশতা’ গল্পের আকর ও আকার

একমাত্র ভালোবাসাই পারে যে কোনো সমস্যার সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর সমাধান দিতে। সুগভীর ভালোবাসার গতি নিম্নমুখী, দুযোগ-দুর্ভোগে সব হারানোর ভয়ে সদা কম্পমান। আর গভীর ভালোবাসার এই নেতিবাচক গতি থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ মনোলোকে আগাম সাবধানতার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এই আপাত ভালো-মন্দ ঘটনাপ্রবাহের মূল চালিকাশক্তি ভালোবাসা, মঙ্গলচিন্তা, সুস্থ সমাজ দেখার গোপন সীমাহীন তাগিদ। আমাদের লেখক সোহারাব হোসেনের (১০৬৬-২০১৮) সৃষ্টির গোপন তাগিদ ছিল অসীম। বঙ্গ-জননীর তিনি সুপুত্র। তাই পুত্র হিসেবে **‘পুত নামক নরক’** থেকে বঙ্গ জননীকে উদ্ধারের জনয তিনি যেসব কর্মকাণ্ডে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন-তার মধ্যে অন্যতম হল অবিশ্রান্ত থেকে **‘ভোর ৩টে-৪টে পর্যন্ত’** জেগে জেগে-সাহিত্যসৃষ্টি, কথা সাহিত্য সৃষ্টি, ‘দোজেখের ফেরেশতা’র মতো অমূল্য ছোটগল্প সৃষ্টি।

সোহারাব হোসেন ছিলেন অতি দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান। তিনি তৌসিফ আহমেদের সঙ্গে জীবনের শেষ আলাপচারিতায় (০৯.১১.২০১৬) জানিয়েছেন ঃ **“আমার ব্যক্তি জীবনেও ভয়ঙ্কর দারিদ্র্য ছিল। মারাত্মক লড়াই করতে হয়েছে। খাওয়া প্রায় হতই না বললেই চলে। না খেয়ে সাইকেলে দীর্ঘপথ পেরিয়ে কলেজে যেতে হত। সেই জীবনটা বারবার ফিরে আসে যখন দেখি অসহায় ছাত্রটি, তাদের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে, বৃহৎ পথের যাত্রী-তারা পথিকের মতো গাছতলায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে আর আমি বড় গাছের ছায়া হয়ে তাদের সেই বিশ্রামের জায়গাটি তৈরি করে দিচ্ছি।.....আসলে গুটিয়ে থাকা জীবন না, মেলে ধরায় জীবন।”** এমন মানবিক লেখক সমাজের সমস্যা আবিষ্কার, সমস্যা সৃষ্টির কারণ এবং সমস্যা থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে কথা সাহিত্যকে হাতিয়ার করেছেন। সারাজীবন তিনি সাম্যবাদী সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর এই স্বপ্নের স্বর্ণফসল প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘দোজেখের ফেরেশতা’, প্রকাশ কাল ১৯৯৬ সাল। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৯ সালে। দ্বিতীয় সংস্করণে চারটি গল্প বৃদ্ধি পেয়ে মোট গল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় বারোটি। এ গল্পগ্রন্থের নাম গল্প হল ‘দোজেখের ফেরেশতা’। এটি মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প। কেন্দ্রীয় চরিত্র সাহেবালি। তাকে কেন্দ্র করে মাস্টার ও মোশারাফ দর্জি চরিত্র দুটি পূর্ণতা পেয়েছে। বস্তুত এই তিনটি চরিত্রকে ভর করে গল্প পরিণতির দিকে পা-পা করে এগিয়ে চলেছে। শুধুমাত্র অবিবেচক সমাজের নিষ্ঠুরতায় কীভাবে সাহেবালিদের মতো দরদী মানুষেরা কর্মের অভাবে, অর্থের অভাবে অপুষ্টির শিকার হয়, কীভাবে তার সাজানো সংসার-দাম্পত্য জীবন শেষ হয়ে যায়—তা দেখানোই গল্পের মূল অঙ্গীকার।

একাধারে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কবি প্রাবন্ধিক-গল্পকার-ঔপন্যাসিক সোহারাব

হোসেন উঠে এসেছেন গ্রামবাংলার আবহেলিত অনুন্নত মুসলিম পরিবার থেকে। দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়তে পড়তে বিভিন্ন পত্রিকায় কবিতা লেখা দিয়েই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির পথ চলা শুরু হয়। একেবারে নিজস্ব স্টাইলে নিজের দেখা অনুন্নত, পিছিয়ে পড়া, ছদ্মবেশে গুটিয়ে থাকা সমাজের কথা, মানুষের কথা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর গল্পের পাতায় পাতায়। কোথায় কোন আঘাটায় পড়ে থাকা **'দিন-আনা-দিন-খাওয়া মুটে-মজুর-খাটা'** রোগা-রক্তহীন চেহারার গোপন ভিক্ষার গলিতে লুকিয়ে থাকা, হাহাকারের গলিতে লুকিয়ে থাকা মানুষকে **'ভাই'** বলে সম্বোধন করে তিনি তাকে গল্পে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। গল্পে সাহেবালি লেখকের জীবন-দর্শনের যেন এক নতুন প্রবক্তা। আর নতুন কথা বলার জন্য গতানুগতিক সমাজ তাকে 'আধপাগলা প্যাংলা-হ্যাংলা সাহেবালি' বলেই চেনে, জানে। কিন্তু বর্তমানকালের জহুরী সোহারাব অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকা খাঁটি রত্নাটিকে চিনতে ভুল করেননি। ভুল করার কথা নয়। মাটির উপর উপুড় হয়ে কড়ারোদ গায়ে মেখে অতি সাধারণ পরিবারে পিতা-মাতার স্নেহছায়ায় বড় হয়েছেন বলেই গ্রাম, গ্রামের সাধারণ মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-হাহাকার জায়গা করে নিয়েছে, সমৃদ্ধ করেছে গল্পের ভুবন।

'দোজেখের ফেরেশতা' ছোটগল্পটি তিনটি পর্বে সমাপ্ত। মূল চরিত্র সাহেবালি। গল্পের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সাহেবালির জীবন সংসার, জীবন-সংগ্রাম। সমাজ-বন্ধু প্রকৃতি সাহেবের অস্তিত্ব সঙ্কটের ইতিহাস আছে ধারাবাহিক পর্বে পর্বে। গল্পের পথ চলা শুরু হয়েছে এভাবে ঃ **"মেটের হাটের বুক চিরে সোজা পুবমুখী চলে গেছে টাকিরোড, বারাসাত থেকে বসিরহাটের দিকে। লম্বালম্বি মেটের হাটটাকে দু'ভাগ করেই রাস্তাটা চলে গেছে। ফলে গঞ্জ-মাটিয়ার দোকান-পসারাগুলো এই টাকিরোডেকে সামনে রেখে উত্তর ও দক্ষিণমুখী অবস্থানে দ্বিধাবিভক্ত থেকে গেছে অনন্তকাল।"**—এই বাজারে মুরগিপটির গলির মোশারাফ দর্জির দোকানে সান্ধ্য-আড্ডায় যাবার পথে **'পাগল- প্যাংলা- সাহেবালি'**র সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তার অর্থনৈতিক দৈন্যের কথা, রক্তশূন্য কঙ্কালসার শরীরের কথা পাঠক জানতে পারেন। সাহেবালি কোনো রকমে **'কিলো-দেড়েক'** আটা সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেও আনুসঙ্গিক সামান্যতম 'গুড়টুকু এট্টুস' কিনতে পারেনি অর্থের অভাবে। তাই সে লেখক ওরফে মাষ্টারের কাছে **'দেড়ডা টাকা'** সাহায্যের জন্য পিছু নেয়। বলে—"দেড়ডা টাকা তো দিতি হয় মাষ্টার"। এরপর সংসার, বাচ্চা-কাচ্চাগুলো কেমন আছে জানতে চাইলে সাহেবালি জানায় ঃ **"—সংসারতা মুক থুবড়ে পড়তেছে। শালা সোংসারের শিরদাঁড়াখানা ভেঙে গেছে মাষ্টার।"** যে সাহেবালি একদা 'দেড়-দু'জনায় খাটনি একলা' খাটতে পারত; কিন্তু এখন শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাকেই বলতে শুনি ঃ **"রোগ শরিল। ফি-রোজ আর খাটতি পারিনিকো। লোকে জোন নেয় না।"** এমন সর্বহারা সাহেবালি এখন মাঝে মাঝে পেটে ভাতে করব খোঁড়ার কাজ ধরে। তার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে কে 'বেহেস্তো পাবে', কে 'দোজোখ পাবে'—এই তত্ত্ব শোনার পর মাষ্টারের প্রতিক্রিয়া ঃ **"সাহেবালি এখন**



**আমার কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ গ্রহের জীব। সর্বজ্ঞ দার্শনিক।"** আর এই দার্শনিক সাহেবালির চলে যাবার আগে শেষ যে আকুতির জন্য দুটি চকচকে কয়েন পায় তা হল ঃ **"দেড়ডা টাকা দিতি হয় মাষ্টার। নালি পরিবারডা না-খেয়ে মরে যে।"**

গল্পের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে এভাবে ঃ **"মুরগিহাটের গলিতে পা-দিয়েই বুঝতে পারি মোশারাফের....ঘরঘর-ঘরঘর করে সেলাই কলটা ঘুরেই চলেছে। আর সে দিকে অপলক চেয়ে ঘরের এককোণে বসে রয়েছে সাহেবালি। হ্যাংলা-বোকা সাহেবালি।.... সাহেবালি মরা-গরিব।"** চল্লিশ বছর বয়সের সাহেবালি সেলাইকলের চলমান চাকায় এখন জীবনের গতি দেখতে পায়; চাকার দড়ি ছেঁড়া তার কাছে নিজ সংসারের অটুট বাঁধন ছেঁড়ার প্রতীক মনে হয়। মনে হয় **"দেড় কিলো আটাও জোগান করতি পারিনে ফি-দিন। বউডা দড়ি ছিঁড়ে লেচ্ছে.....।"** সে শুধু অভাবের তাড়নায় **'বউ আর মরদে শঙ্খ-লাগা'** জানা সত্ত্বেও কাকে মোল্লাগা বাড়িতে কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়েছে! তাই তার কাছে এখন জগতটাই দোজেখময়।

তৃতীয় পর্বের শুরুতেই সাহেবালি লেখকের সমস্ত শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে সমর্থ হয়েছে। হলই বা প্যাংলা গরীব; কিন্তু ভাবনা-চিন্তা-কথায় দার্শনিকতা, মার্জিত রুচি-ব্যবহার প্রভৃতি অশেষ গুণের অধিকারী সাহেবালিকে এখন মাষ্টার ঈশ্বর প্রেরিত ফেরেশতা ভেবে নিতে শুরু করেছে। এদিকে **"সাহেবালির বউটা মোল্লেদের ছোটো ছেলের সাথে পালিয়েছে"**, খবর পেয়ে মাষ্টার তার সঙ্গে দেখা করতে সাংবেড়ে যায়। সাহেবালির সঙ্গে দেখাও হয়। জানতে পারেন শুধু বউ-ই চলে যায়নি, সত্যবাদী সাহেবালির শেষ সম্বল কবরখানার কাজটাও চলে গেছে। সবহারানো সাহেবালি বলে—**"আমার মরার সোময় ঘুনগে এয়েছে মাষ্টার। বউডা হুড়কে গ্যালো। জোন মজুরি জোটেনা।"** সাহেবালি নিজেকে দোজেখবাসী বলে মনে করে। এই দোজেখে থেকে থেকে তা তার কাছে অসহ্য লাগে। দোজেখ থেকে মুক্তি চায় সে। বলে ঃ **"বাড়ি যাও মাষ্টার। এই দোজোকে তুমি থেকো না।"** এরপর মাষ্টার, মোশারাফ দর্জি, বাচ্চাকাচ্চা সব মায়ার বাঁধন ছিন্ন করে, কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সাহেবালি অন্ধকারের মধ্য দিয়ে কোথায় যে চলে গেলো-তা কেউ জানতে পারলো না।

আলোচ্য গল্পটি সর্বহারা সাহেবালির অস্তিত্ব সংকটের ইতিহাস, হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। সাহেবালির নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, আন্তরিকতাকে সবাই সম্মান জানাতে পারেনি, সম্মান জানায়নি। সমাজের বাবু সম্প্রদায় তাকে ব্যবহার করেছে বিনা পারিশ্রমিকে। সে সমাজকে দিয়েছে অনেক। পায়নি কিছুই। এমন নিষ্ঠুর সমাজে কাজের বিনিময়ে পেয়েছে শুধু উপহাস। মাষ্টারের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে সমাজের প্রতি তার তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে **'শালা'** শব্দের পুনঃ প্রয়োগে। আন্তরিকতা, ইচ্ছা, অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও অকৃতজ্ঞ, ভণ্ড সামাজিকেরা তাকে এতটুকু সম্মান করেনি; ভালোবাসেনি। তাকে এখন **'দেড়ডা টাকা'**র জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, হচ্ছে। সন্তান-সন্ততির, বউয়ের অনাহারের কথা মনে রেখেও শুধু

একবেলা নিজের খাবারের বিনিময়ে কবরের কঠিনতম কাজটি করিয়ে নেওয়াকে সাহেবালি তার পৌরুষের অপমান বলে মনে করেছে। আর এ সামগ্রিক অপমানের জ্বালা সে মিটিয়েছে কথায় কথায় **'শালা'** শব্দ প্রয়োগের তীব্র কশাঘাতে। যেমন—

(ক) আর **শালার** মানুষজোন-গেরস্তরাও হয়েছে য্যানো আজরাহল।'

(খ) সব **শালা** বেইমান বিশ্বাসঘাতক।'

(গ) **'শালা** সোংসারের শিরদাঁড়াখানা ভেঙে গেছে মাষ্টার।'

(ঘ) 'মরণের পর কেডা বেহেস্তো পাবে, কেডা দোজোক পাবে তা আমি **শালা** এখন বুঝদি পারি!'

(ঙ) 'আর শালা যে-সব **লাশ** দোজোক পাবে কী দুর্গোন্দোরে শালা সে-সব **লাশ**।'

(চ) 'নাক-মুখ **শালা** ফেটে যাবার জোগাড়।'

(ছ) **শালা** য্যানো বছুরে পচা-ইঁদুরির দেহ।'

(জ) 'আমারে কোনো **শালা** ফাঁকি দিতে পারবে না মাষ্টার।'

(ঝ) 'দোজোক-বেহেস্তো কার নামে লেখা পড়তেছে সব আমি বুঝে লেবো **শালা**।'

(ঞ) **শালা** সব দড়িগুলো কোথায় এরাম ছিঁড়ে যায়!'

(ট) 'সব **শালার** লাশের গা দে পচা-দোজোকের গোন্দোই পাই।'

(ঠ) **'শালা** কবর-তে উঠলি সায়বালির কাছে কত খাতির।'

(ড) 'বউডা দড়ি ছিঁড়ে লেছে শালা।

(ঢ) **'শালা** বেহেস্তোর গোলাপফুলির সুবাস এত খুঁজি তেবু তারে আর দেখতি পাইনে।'

(ণ) **'শালা** আমারও কপালে দোজাক লেকা রয়েছে।'

(ত) **'শালা** লেকাপড়া শিকে তুমি মহামুখ্যু থেকে গেলে', প্রভৃতি।

সোহারাব হোসেনের প্রথম পরিচয় তিনি কবি, বাঙালি কবি; তারপর তিনি কথাসাহিত্যিক ছোটগল্পাকার। তাই তাঁর ছোটগল্পের বাক্যে বাক্যে কবির সৌন্দর্যানুভূতি দুলে উঠে ফুলে ওঠা স্বাভাবিক। সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য যদি হয় পাঠককে আকৃষ্ট করে তাঁদের হৃদয়ে চিরস্থায়ী আসন করে নেওয়া, তাহলে কথায় কথায় সৌন্দর্যের ফুল ফুটিয়ে তিনি সে ব্যবস্থা একেবারে পাকা করে ফেলেছেন। চরিত্রানুভূতি প্রকাশে তিনি আলঙ্কারিক-সুষমা প্রয়োগে বড়ই উদারতা দেখিয়েছেন। 'দোজেখের ফেরেশতা' ছোটগল্পে ছোটগল্পকার সোহারাব হোসেন অলঙ্কারযুক্ত শব্দ, বাক্য ব্যবহারে দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন, যা মূল বক্তব্যকে যেমন সাবলীল করেছে, তেমনি বিষয়ের জ্যোৎস্নাকে আরো বেশি অমলিন, স্নিগ্ধ করেছে, গভীরতা দিয়েছে ঃ

(ক) 'বুকের মধ্যে কীসের যেন শিরশির যাতায়াত প্রত্যক্ষ করি।'

(খ) 'পাশ দিয়ে মন্দাকান্তা ছন্দে চলে যায় কিছু মানুষ।'

(গ) 'একটু হাসির আঘাত ছুড়ে মারে।'



(ঘ) 'সিঁড়ির নীচের-ধাপে দাঁড়ানো সাহেবালির মুখ যেন অপরিচিত ঠেকে আমার কাছে।

(ঙ) 'যেন ভিন্ গ্রহের কোনো মানুষের রং ও রেখা সাহেবালির মুখে।

(চ) 'সাহেবালির পরিচিত মুখের আদলে যেন আজ অন্য পুরুষ এসে বাসা বাঁধছে।'

(ছ) 'পিছন-দিকে ঘরঘর-ঘরঘর করে সেলাই মেশিন চালায় মোহারাফ দর্জি। যেন আধিভৌতিক জগতের কোনো আর্তনাদ।'

(জ) 'পাগলা-সাহেবালির কথারা সেখানে যেন কারফিউজারি করেছে।'

(ঞ) 'কথাগুলো যেন সাহেবালির অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত গতি নিয়ে বেরিয়ে আসছে।'

(ট) 'আমার মাথার ঘিলুতে লাটু-পাক। হাজার-হাজার মৃত মানুষের হল্লা-আর্তনাদ।'

(ঠ) 'সাহেবালি হিসহিসানির মতন বলে—'দেড়ডা টাকা দিতি হয় মাষ্টার, নালি পরিবারডা না-খেয়ে মরে যে।'

(ড) 'দিন ও রাত্রির ক্রান্তিলগ্নে মেটের হাটটা আজ যেন ভরা সোমও যুবতির মতো ঐশ্বর্যময়ী।'

(ঢ) 'মোশারাফের সেলাই কলটা যেন রূপকথার দুয়োরানির মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে একঘেয়ে টানা-কান্নার বিলাপ করে চলেছে।'

(ণ) 'সাহেবালির মুখে দেখি যন্ত্রণার ছাপ। দুঃখের বলিরেখারা সেখানে তসবিমালা গাঁথে!'

(ত) 'ব্যথার যন্ত্রণারা আমাকে গ্রাস করে।'

(থ) 'দেখি দুঃখেরা সেখানে পাথর হয়ে সাহেবালির মুখের আদলটাকে শাক্তপোক্ত করে গড়ছে।'

(দ) 'ওদিকে থেমে গেছে সেলাই কলের ঘরঘর কান্না।'

(ধ) 'খাতি দিতি পারিনে। আল্লাদ দোবো কন্‌তে?'

(ন) '...এই চিন্তা বিশ্বাসের মতো প্রবেশ করেছে যে, সাহেবালি। তার ভেঙে নুয়ে-পড়া দেহটা ধনুকের ছিলার মতো টানটান হয়ে ওঠে।' প্রভৃতি।

কথা সাহিত্য, তথা ছোটগল্পের ইতিবাচক শক্তির মূল আধার হল ভাষা। ভাষা স্রোতে পল্লবিত হয় গল্পের ভাঁজে ভাঁজে শিল্পের যাদু। ভাষার পরিকল্পিত মোচড়ে সোহারাবের ছোটগল্পের স্বতন্ত্র ঘরাণার স্বাদুতা এসেছে। লেখক নিজেই বলেছেন ঃ "যে বিষয়, যে চরিত্র, আমার আখ্যানাংশে থাকে তারা ভাষার মিউজিকে নাচতে নাচতেই হয়ে ওঠে।—সব মিলিয়ে ভাষা-পরিবারে আমি সম্পৃক্ত করিয়ে দিতে চেষ্টা করি একটা ঘোর তথা মায়াকে। ভাষার এই মায়া তথা ঘোর আবার আমার শিল্প-সৃষ্টির ঘোরের সঙ্গে আন্বিত।" (আলাপ ঃ সোহারাব হোসেন', 'স্বপ্নেসমীহা', ভাদ্র ১৪১৩)। একথা ঠিক লেখকের ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় ভাষার মধ্য দিয়ে। কোনো সাহিত্যসৃষ্টি শিল্প হয়ে ওঠে ভাষা-শিল্পের হাত ধরে।

০৯.১১.২০১৬ তারিখ, বুধবার সন্ধ্যায় ড. তৌসিফ আহমেদের সঙ্গে এক প্রশ্ন-উত্তর পর্বে গল্পকার 'দোজেখের ফেরেশতা'র শিল্পরূপের সন্ধান করেছেন এভাবে ঃ **"আমাকে চরিত্র কল্পনা খুব বেশি করতে হয় না। 'দোজেখের ফেরেশতা' গল্পের সাহেবালি চরিত্র—সাহেবালি নামেই একজন আমার গ্রামে ছিল। আমাদের বাড়িতে জনমজুর দিত। গ্রামের মানুষের খেতে কাজ করত এবং করব খোঁড়া কাজ করতা.....সাহেবালির চেনা সত্তার মধ্যে (কবর খোঁড়া,...) অচেনা রূপ আঁকতে বা শিল্প করে তোলার জন্য নির্মাণ করলাম সে করব খুঁড়তে-খুঁড়তে দোজখ-বেহেস্তের গন্ধ পায়—এটুকু আমাকে বার করতে হয়েছে। সাহেবালির মধ্যে অচেনা ফেরেশতার সন্ধান পেয়ে যাচ্ছি। এ সময়ে যে দুর্বৃত্তায়ন হচ্ছে, সময় পচে যাচ্ছে—সে সেটাকে ইঙ্গিত করছে—সে দোজখের ফেরেশতা। ফেরেশতা হয় বেহেস্তের। এখানে দোজখ অর্থাৎ পৃথিবীটা যেন দোজখতুল্য—আমাদের সংসার যেন দোজখতুল্য এবং সে শিক্ষিত মানুষ চিনতে পারছে না। সেখানে যে 'আমি' চরিত্রটি আছে মাষ্টার—তাকে বলছে 'মূর্খই থেকে গেলে মাষ্টার তুমি'—অর্থাৎ এই যে অচেনা একটি সত্তা বেরিয়ে আসছে সেটাই শিল্প।"**

সোহারাব হোসেন বর্তমান নরক সমাজকে পাল্টে দেবার অভিপ্রায়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'দোজেখের ফেরেশতা' গল্পের চরিত্রগুলি কোনো কল্পলোক থেকে ধার করে আনা নয়; একেবারে পরিচিত মানুষজনকে নিয়েই তিনি গল্পের ইমারত তৈরি করেছেন। গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সাহেবালির কথায় লেখক দার্শনিক সত্য খুঁজে পেলেও সমাজের সাঁড়াশি শোষণে সে সন্তানের মুখে অন্ন যোগাতে পারেনি, মাংসবুকির বউকে রক্ষা করতে পারেনি, নিজেও নিরুদ্দেশে হারিয়ে গেছে। অন্যান্য দূষণের মতো সমাজ ব্যবস্থাও নানা কারণে-অকারণে দূষিত হয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সংগঠিত পাপে সমাজ আজ বিধ্বস্ত। আলোচ্য গল্প প্রকাশের চার বছর আগে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসকে কেন্দ্র করে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাজ্য, দেশ, পৃথিবী অস্থির, রক্তাক্ত। এ সমাজ তাঁর কাছে বসবাসের অনুপযোগী মনে হয়েছে। তাই তো সমাজ-বন্ধু লেখক মূল গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন **'পশ্চিমবঙ্গের, ভারতের, পৃথিবীর দাঙ্গাবিরোধী মানুষকে।'** আমাদের মানবিক লেখক সাহোরাব জীবন দিয়ে জীবন রক্ষা করার জন্য স্বল্পায়ু জীবনে জীবনের যে সাধনা করেছেন তারই স্বর্ণফসল **'দেজেখের ফেরেশতা'** গল্পটি। তাঁর অধিকাংশ অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও তিনি সাহেবালির মতো বৈষম্যের সামাজিক দোজখ থেকে মুক্তির সন্ধ্যান করেছেন। 'মহানিষ্ক্রমণ' গল্পে দেখা যায় অর্পণ লাবণ্যের সুখী দাম্পত্য জীবনের ছবি আঁকতে গিয়েও তিনি বারেবারে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বেচ্ছাচারিতা, শ্রমিকশ্রেণির জীবনের অনিশ্চয়তা, মৃত্যু; অনাবৃত যৌনাচার প্রভৃতি দুচোখ ভরে দেখে দেখে স্রষ্টা স্তম্ভিত। তাইতো বড় ব্যথায় অর্পণ লাবণ্যকে বলে ঃ **"লাবণ্য, আমাদের সন্তান মারা যাক। আমি চাইলে এই বেশ্যা-যুগে আমার সন্তান জন্মলাভ করুক।"** আসলে সোহারাব হোসেন চান না কোন নবজাতক ভবিষ্যতে এই সামাজিক নিষ্ঠুরতার শিকার হোক। তাঁর বিশ্বাস সমাজে



জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। তিনি এই নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী নন। 'অস্তিত্বের অতিথি'র কেয়ামত আলি তো এই বিষাক্ত সমাজের ভর-বৃদ্ধি লাঘব করতে নিজের মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত ভেঙে দিতে তৎপর হয়েছে! আসলে তাঁর কথাসাহিত্যে বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র ভাবনার মধ্য দিয়ে অস্বস্তিকর দূষিত সমাজের প্রতি লেখকের তীব্র ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে। আর এই ঘৃণার মূল উৎস হল তাঁর সমাজ, সমাজের মানুষের প্রতি অসীম ভালোবাসা, দায়িত্ব কর্তব্যবোধ।

সবশেষে বলা যায়, আলোচ্য ছোটগল্পে সহজ-সরল-আটপৌরে ভাষা ব্যবহারে, বিচিত্র শব্দের প্রয়োগে, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাবনার অভিনবত্বে গল্পকার দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। আবার বাক্য গঠনের বৈচিত্র্যে, জগৎ-জীবন-মননের সংকট, অস্থিরতা নানা ভাব বর্ণে-রেখায় প্রকাশে, অতীত ঐতিহ্যের বহুল ব্যবহারে আলোচ্য গল্পটি সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহেবালির নিজের শরীরের মতো তার সন্তান-স্ত্রী সহ কঙ্কালসার সংসারে চিত্র, মোশারাফ দর্জি, দর্জি-মেশিনের, চাকার ঘরঘর ঘরঘর আওয়াজ অত্যন্ত সচেতনভাবে সোহারাববাবু ফুটিয়ে তুলে বর্তমান সমাজকে সচেতন করেছেন এবং এই জটিল বাস্তব সমস্যা সমাধানের ভার বাঙালি সমাজের উপর অর্পণ করেছেন। পেটের ক্ষুধা, সেই সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতায় কীভাবে তিল তিল করে হারিয়ে যায় মানবিক মুখ, সমৃদ্ধ চেতনা, অমূল্য মানব সম্পদ—তা তিনি গল্পে যত্নসহকারে তুলে ধরেছেন। মাষ্টার ও মোশারাফ দর্জির সঙ্গে কথোপকথন সাহেবের তীব্র-তীক্ষ্ণ শব্দবাণ তার আত্মশক্তি ও আত্মমর্যাদার পরিচয়বাহী। তবে শেষপর্যন্ত তার সন্তানেরা মাকে হারিয়েছে, বাবাকেও হারিয়ে অনাথ হয়েছে। খুব কম কথায় নির্মম জীবনের ছবি তুলে ধরে জ্ঞানতাপস সোহারাব বাংলার অসুস্থ সমাজকে ধরিয়ে দিয়েছেন, চিনিয়ে দিয়েছেন। ঘরের কোণে বসে বসে সৃষ্টির উন্মাদনায় সাহিত্য সৃষ্টি করা নয়, পায়ে হেঁটে হেঁটে একটু একটু করে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে-তা দিয়েই তিনি সাজিয়েছেন সাহিত্যের ডালি। তাইতো পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী মাষ্টারকে সাহেবালি হামেশায় বলতে পারে ঃ

(ক) "—বোসো মাষ্টার। তুমি তো এম. এ. বি. এ পাশ দেছো—মানুষির হাল-হকিকত কিছু বুঝতি পারো?'

(খ) "—তুমি দুনিয়ার কিছুই জানো না মাষ্টার। শুধু লেখাপড়া শিখে মুখ্যুমানুষির মতন থেকে গেলে।"

(গ) "—না মাষ্টার তুমি মানুষ হলে না?.....শালা লেকাপড়া শিকে তুমি মহামুখ্য থেকে গেলে।"

**তথ্যসূত্র ঃ**

(ক) 'শ্রেষ্ঠ গল্প'—সোহারাব হোসেন, করুণঅ প্রকাশনী, বইমেলা-২০১০

পা তা উ র  জা মা ন

## কেন গল্পকার সোহারাব হোসেনকে পড়া জরুরি।

'জীবনের সমস্তটাতে গালিব ভুলের পর ভুল করে গেছে
ধুলো শরীরে ছিল কিন্তু আয়না পরিষ্কার করে গেছে।'

হোমস্ সব সময় তার সহকারীকে বলতেন, 'ইটস্ এলিমেন্ট্রি মাই ডিয়ার ওয়াটসন'; সোহারাব হোসেন তাঁর গল্পে, উপন্যাসে, সাক্ষাৎকারে, আড্ডায় সিটি কলেজের সেই ছোট রুমে ছাত্র পরিবেষ্টিত ঘরে সব সময় বলতেন, 'জীবনটা জার্নি, সিড়ি ভাঙার জার্নি'। আসলে এটা একটা দর্শন। কেউ সুফিবাদের 'খোঁজ' (আরবি শব্দ আল তাকিত) এর দর্শন হিসেবে একে চিহ্নিত করতে পারেন। অন্যরা অন্য কিছু। আসলে একজন গল্পকারের ক্ষেত্রে যে জিনিস খুব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে তা হল গল্পকারের গল্প, গল্পের বিষয় ও তাঁর দর্শন এবং কীভাবে বলছেন গল্পকার গল্পটি। যদিও অতীত কাল থেকে এর তাত্ত্বিক আলোচনা সাম্প্রতিকেও বর্তেছে। ওই আলোচনা আসলে ক্লাসিক আলোচনা। সেকারণে হয়তো এই আলোচনার মধ্যেও ওই কথাগুলো বারংবার ঘুরে ফিরে আসবে।

আসলে যে জিনিসটি বলতে চাইছি এই ভূমিকা করে সেটি হলো, একজন গল্পকার আসলে দার্শনিক। দার্শনিকের সঙ্গে একজন গল্পকারের যে ফারাকটুকু দেখা যায়, তা হলো রীতিগত ভাবে বা কৌশলগত ভাবে। মূলে কিন্তু এক। কারণ উভয়ের ভাবনা জুড়ে কায়েনাতের সমস্তটাই থাকে। সে মানুষ হতে পারে, মানুষের সামগ্রিক জীবন-জগৎ হতে পারে কিংবা হতে পারে প্রকৃতি বা আরো কিছু।

গল্পকার সোহারাব হোসেনের শিল্প-মানসিকতা বুঝতে গেলে কিন্তু এই উভয় দিকই বুঝতে হবে। এটা এমনি এমনি হয়নি, একজন দার্শনিক নিজ সিদ্ধান্তে তখনই পৌঁছায়, যখন তাঁর জানার উপলব্ধি লোকপ্রজ্ঞাকে স্পর্শ করে এবং তাকে, সেই লোকপ্রজ্ঞাকে সেই মানুষ ব্যক্তিগত যাপিত জীবনে অনুশীলন বা চর্চা করে। এ দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটা স্পষ্ট যে গল্পকার সোহারাব হোসেন, তাঁর ক্ষণ জীবনের সুবৃহৎ ছাত্র তৈরি করেছেন তাঁর লেখার পাঠক তৈরির সঙ্গে সঙ্গে এবং আখ্যানের মধ্যে বেঁচেছেন। এজন গল্পকার যে ভাবে শুধু লেখেন না, পাঠককে তৈরি করেন, পাঠ এক 'হয়ে উঠতে'[১] সাহায্য করেন। একজন শিল্পীরও এ রকম মানসিকতার মূলে থাকে তাঁর মধ্যে নিহিত একটি ছাত্র সুলভ মন। শিল্পী সর্বদা লিখবেন।[২] জানার বোধ পূর্ণ হওয়া মানে একজন শিল্পীর মৃত্যু। এ পথ থেকে বহু যোজন দূরে থেকে সোহারাব হোসেন সর্বদা ছাত্রসুলভ মন নিয়ে সবার কাছ থেকে শিখেছেন। সে কারণে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন,

'আসলে জীবন সবার যে ভাবে শুরু হয় আমার সেভাবে শুরু হয়নি। আমার জীবন শুরু হয়েছে গ্রামের পরিবেশে। একটি অসচেতন পরিবেশ। সেখানে জীবন মানে খাদ্যের



জন্য সংগ্রাম। জীবন মানে কিছু স্থূল রসিকতা। তার মাঝে মাঝে হয়ত সূক্ষ্ম দার্শনিকতার ছোঁয়া। এটার স্পর্শ হয়তো কেউ পায়, আবার কেউ পায় না। এইভাবে ভারতের, পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলো দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে। আমরাও তার মধ্যে বেড়ে ওঠা শুরু করি। কোনো উদ্দেশ্য নয়, টার্গেট নয়, একটাই উদ্দেশ্য লেখা পড়া শিখতে হবে। অসচেতন একটি পরিবেশে বেড়ে উঠতে উঠতে আমাদের জয় করতে হচ্ছে সভ্যতাকে, সংস্কৃতিকে। যতবড়ো হয়েছি এক একটা জয় করে নিজেকে তৈরি করতে হয়েছে। সেই তৈরি করার প্রচেষ্টা সেই সিড়ি ভাঙাটাই আমার জীবন। এটা এখন তৈরি করে চলেছি। জানি না সেই সিঁড়ির তল কোথায়, সেই সিড়ির তল, যাকে বলে ছাদ, সেটি পাব কি না। ফলে আমার কাছে জীবন মানে সিঁড়ি ভাঙার নানান পথ।'[৩]

এই সিঁড়িভাঙাটাই আসলে একটা জার্নি। পৃথিবীর সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকের দর্শনের মধ্যে এই জার্নি অবশ্য উপস্থিত। কেউ একে আত্মদর্শনের খোঁজ, কেউ একে ভগবৎ খোঁজ, কেউ একে সমাজবীক্ষায় মানুষের মুক্তির খোঁজ, কেউ একে আল তাকিত নাম দিয়ে পরমের খোঁজ—এই এই নাম দিয়ে খোঁজটাকে জারি রেখেছে। এবং আজকের আধুনিক সাহিত্যিকদের পক্ষে এই খোঁজ জরুরি হয়ে পড়েছে। এই আধুনিক কথা যখন লিখছি, প্রাবন্ধিক আধুনিকের বাহ্যিক ও ভেতরের দিক এবং আধুনিকতার মধ্যে যে ভাবে রাষ্ট্র, ব্যক্তি এবং ঠিকের মাত্রা লুকিয়ে থাকে সে মাত্রাগুলোও ভাবনায় বর্তমান।[৪]

যদিও গল্পকারের এই আলোচনায় আমরা এই সব দিকগুলো বোঝার চেষ্টা করব যে, একজন গল্পকার কীভাবে এ সব তাঁর সাহিত্যে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছে। সোহারাব হোসেন এই দিকগুলো তাঁর সাহিত্যে এনেছেন। যেখানে পাঠক তৈরির কথা, গল্পবলার রীতিকে পরীক্ষা করা, বিষয়ের মধ্যে নানাবিধ টেকনিকের প্রয়োগ ঘটানো—সবটাই করেছেন। এরকমটা হবার একটি বড়ো কারণ এই যে, সাহিত্যিক সময় ও পরিসরের বাইরে নয়। সমাজ যেভাবে ক্রিয়া করে সাহিত্যিক হয় সেইভাবে না হয় অপর দিক থেকে প্রতিক্রিয়া করে। নব্বই এর দশকের গল্পকারদের আলোচনায় দেখা যায় এই দুটো দিকই আলোচিত হয়েছে।[৫]

গল্পকার সোহারাব হোসেনের গল্পের যদি আনাচে কানাচে উঁকি দেওয়া যায়, সেখানে এ সবের সারবর্তা লুকিয়ে আছে। সে যদি 'দোজখের ফেরেস্তা' কিংবা 'আয়না যুদ্ধ' কিংবা 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা' কিংবা 'আমার সময় আমার গল্প' ইত্যাদি গল্পগ্রন্থের সংকলনের দিকে উঁকি মারি। 'রাজেশ নামে বালকের গল্প'—এক অথবা 'অমর সন্তানের গল্প' এবং 'রাজেশ নামে বালকের গল্প'—দুই, অথবা 'সিন্ধু সভ্যতার গল্প' এই দুটো গল্পের আধারে গল্পকার সোহরাব হোসেনের গল্পবোধ এবং মানসিকতার আধুনিকতার স্বরূপ ইত্যাদি সামগ্রিক পরিচয় লক্ষণীয়। এই গল্প দুটি যে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত, সেই গ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন, 'বহুস্তরিক গঠন, জট-জটিলতা, কখনও-বা গা-ছমছমে অনুভূতি—তা সত্ত্বেও সোহারাবের গল্প—উপন্যাস পরম মমতায় আমাদের সঞ্জীবিত করে। কিন্তু ব্যতিক্রম তথাকথিত


D/Saharab Hossan Sahitya Angn February 20119/63

মধ্যবিত্তশ্রেণীকে নিয়ে লেখা গল্পগুলি। এসব ক্ষেত্রে সোহারাবের মায়া-কাজল পরানো কলম যেন সূক্ষ্ম-ধারালো ছুরিতে পরিণত হয়েছে।[৬] বাংলা কেন সমগ্র পৃথিবীর সাহিত্য যদি দেখি, তাহলে সেখানেও দেখা যায় সাধারণ শ্রমিক শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি (যদিও এর উচ্চ বা নিম্ন এই দুই ভাগ করা হয়) এবং অভিজাতরা বিষয় হিসেবে এসেছে। পবর্তীকালে যে সব নানাবিধ উপকরণ যুক্ত হয়েছে, তা এই তিন শ্রেণি-চরিত্র মাথায় রেখেই হয়েছে।

গল্পকার গল্পের শুরুটা ভাঙছেন প্রচলিত পন্থাটা ভেঙে। এখানে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা সংলাপ হচ্ছে। এর ধরণটা অনেকটা জিনেট কথিত ইমপ্লাইড রাইটারের সঙ্গে রিয়েল রিডারের সংলাপ, যা আসলে গল্পের পরিসরের মধ্যে আরো একটা দিক উন্মোচন করে। 'রাজেশ নামে বালকের গল্প—এক অথবা অমর সন্তানের গল্প'টাই শুরু হচ্ছে :

'পাঠক, গল্প শুরুর আগে, যারা জীবনকে সময়ের তুলাযন্ত্রে মাপতে চান, তাদের একটি সাবধানবাণী দিতে চাই যে—আপনারা এ গল্পের গল্পকারকে বিশ্বাস করবেন না। কারণ, গল্পকার বড়ো সুবিধাবাদী। বড়ো মতলববাজ। সব কিছুকে ঘুলিয়ে দিতে চায়, গুলিয়ে দিতে চায়। এই যেমন গল্পের শুরুর মুহূর্তে। আমি রাজেশ নামক বালকদের বসার ঘরে পড়ে-থাকা আজকের খবরের কাগজের একটি বিশেষ খবরের হেডলাইনে ক্যামেরার লেন্স ধরে রেখে গল্পটি শুরু করতে চাইছি।'[৭]

—এখানে ক্যামেরা লেন্সের ব্যবহারের প্রসঙ্গটি গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক গল্পে গল্পকার কোনো কিছু উপস্থাপন করার জন্য নানা মাত্রিক দৃশ্যায়নের ব্যবহার করেন এবং কোন কৌণিক পরিসরে দেখাবেন—এই বিষয় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। গল্পকার সোহারাব হোসেন এ গল্পের শুরুর ক্ষেত্রে এই দেখানোর যে কৌণিক পরিসরের ব্যবহার করেছেন, তা এক কথায় অনন্য।

এখানে লক্ষণীয় 'আমি' গল্পকার নিজের সম্পর্কে নিজেকে শংসাপত্র দিচ্ছে। কার কাছে দিচ্ছে, না পাঠকের কাছে। কোন পাঠক, না যে পাঠক পড়বে না এখন পড়ছে, যাকে জিনেট রিয়েল রিডার বলছেন, বা সেই অন্তপাঠক বা ইমপ্লাইড রিডার, যে অনবরত বইটা পড়ছে। কুন্দেরা ঠাট্টার সংস্কৃতি ও তাঁর জ্যামিতিক উপায় নিয়ে নানান কথা লিখলেও মূলে ছিল নিজেকে আঘাত করে সমাজ, সিস্টেম, রাষ্ট্রীয় যান্ত্রিক, ভোগবাদি কাঠামোটাকে বিরোধিতা করা।[৮] গল্পকার ইমপ্লায়েড রিডার হয়ে সেই কাজটি করেছেন।

গল্পকার গল্পে রিয়ালিটির ব্যবহার কেমন করে করবেন যা '৯০ এর গল্পকারের মধ্যে এটা একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ ছিল। 'যাহা দেখিয়াছি তাহা লিখিয়াছি' গোছের বর্ণনার কাল বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছে। '৮০র দশকের গাণিতিক আন্দোলন বা ছাঁচ ভেঙে ফেল, গল্প আন্দোলন এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। যদিও শুরু করেছিল ছোটগল্প: নতুন রীতির মাধ্যমে। কিন্তু গল্পকার সোহারাব হোসেন সেই রিয়ালিটির বর্ণনার ক্ষেত্রে 'কাটিং ফটোগ্রাফিক রিয়ালিটির' ব্যবহার করেছেন। সোহারাব হোসেনের বন্ধুস্থানীয় গল্পকার স্বপন পাণ্ডার 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' উপন্যাসটির পুরো গঠনটাই এই 'কাটিং ফটোগ্রাফিক রিয়ালিটির'



মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। গল্পকার সোহারাব হোসেন এই গল্পে হেডিং সহ খবরের কাগজের কাটিং ব্যবহার করে মূল গল্পের মধ্যে প্যারালাল আরো একটি আখ্যান তৈরি করেছেন। সেখানে 'পুরুলিয়ায় ধর্ষিত গর্ভবতী নারী: বিধানসভায় কেঁদে ফেওলেন বিধায়ক'[৯] কিংবা 'নতুন মিলেনিয়ামের মারণাস্ত্র স্তন-ক্যানসার'[১০]—এই দুই পেপার কাটিং গল্পকার, যিনি রাজেশের শিক্ষক, আবার গল্পের ইমপ্লায়েড ন্যারেটরও, ব্যবহার করে সমকালের রাষ্ট্রিক সুবিধাবাদী মানসিকতা, গণমানুষের ভোগবাদী মানসিকতাকে স্পষ্ট করেছেন। বিদেশে আজার নাফিসি তাঁর 'লোলিতা রিডিং ইন তেহেরান' উপন্যাসে, বাংলাদেশে জাকির তালুকদার কুরশিনামাতে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে সোহারাব হোসেন পশ্চিমবঙ্গে এই কাজটি করেছেন। কিন্তু গল্পকার এই কারণে ব্যতিক্রম যে, অন্যরে প্যারালাল ন্যারেটোলজি পর্যন্ত এসেছেড, কিন্তু সোহারাব হোসেন এর সঙ্গে ঠাট্টার সংস্কৃতি জুড়ে দিয়ে (যেখানে অবশ্যই ইমপ্লায়েড ন্যারেটর থাকবে) নিজের সঙ্গে সমগ্র সময় ও পরিসরের ক্ষেত্রটিকে উন্মোচিত করেছেন। এটা যে কতখানি সত্য তা বর্তমান নিবন্ধকারের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, পাঠক রাজেশের গল্প সিরিজের প্রথম গল্প—'রাজেশ নামে বালকের গল্প—এক অথবা অমর সন্তানের গল্প'টির 'পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন'[১১] অশটি বলে' ধর্ষণজনিত যৌন সুখ-অসুখের ডেটা'[১২]—এই অংশ পড়লেই দুধ আর পানি আলাদা করতে পারবেন।

আসলে গল্পকার সোহারাব হোসেনকে কেন আমরা পড়ব? এই প্রশ্নের যদিও কোনো দেগে দেওয়া মার্কা উত্তর হয় না। হয় না কারণ, শিল্প ও শিল্পীর ক্ষেত্রে একটি বাণীই অমোঘ-বাণী, এমনটা সম্ভব নয়। গল্পকার সোহারাবের সব থেকে বড়ো কৃতিত্ব বিষয় বৈচিত্র এবং আঙ্গিকে টেকনিকের বহুমাত্রিক প্রয়োগ, যা তাঁকে স্বতন্ত্র করেছে।

ঐ যে প্রথমেই কথা হচ্ছিল গল্পকার কীভাবে বলবেন এবং কেন বলবেন। এখানে গল্পকার কীভাবে বলবেন—এই পর্যায়ে গল্পকারের গল্পের শুরু বা শেষ কীভাবে করবেন, সে বিষয়ে খুব সচেতন। তিনি 'রাজেশ নামে বালকের গল্প —দুই, অথবা সিন্ধু সভ্যতার গল্প' এ লিখছেন :

'আসলে গল্পটা সত্য তাই এখান থেকে শুরু হতে পারে। এই ঘরবাড়ি বদলের দৃশ্য থেকে। অন্তত আমার, এই গল্পের গল্পকারের, তাই-ই মনে হচ্ছে। আসলে আমি মেলাতে চাইছি আমার মুঠোর মধ্যে রাজেশের যৌবনপুষ্ট মা, আমার ইজেরের মধ্যে লবনাক্ত প্রতিভা, আমার বাম-পার্শ্বস্থ গালে ঠোঁটের ভারতবর্ষের ছাপ, আমার চোখের উপর বালক রাজেশ, আমার মস্তিস্কে বউ-বদলের ডায়লগ-সবকিছু মেলাতে চাইছি।

...তারপর রাজেশ নামক বালক আমার আমার চিন্তাসূত্র কেটে দেয়। গল্পটা শুরুর মুহূর্তে এসে অঙ্গহীন হয়ে পড়ে।'[১৩]

গল্পকার কখন এই গল্পের শুরুর টেকনিক নিয়ে কথা বলছে, না যখন গল্প একেবারে শেষে এসে পৌঁছেছে। যদিও এখানে রাজেশের শিক্ষক, যিনি এ গল্পের ইমপ্লাইড

ন্যারেটরও, তিনি পাঠকের সঙ্গে একটা পরিসর তৈরি করে মূল গল্পে অন্য কথা বলছেন। বলছেন আধুনিক ভারতের কথা। এর আধার হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণের অনুসন্ধানের মাধ্যমে। সে কারণে রাজেশ সিন্ধু সভ্যতার পতনের কারণ পড়তে পড়তে মাষ্টার মশাইকে শোনায় :

'বিবিধের মাঝে মিলন-মহান—মাষ্টার মশাই-
ভারতবর্ষে এত যুদ্ধ হতো কেন?
মাষ্টার মশাই—এতো যুদ্ধ
হয় কেন? কেন?'[১৪]

এখানেই গল্পকার সোহারাব হোসেন বিষয়কে টেকনিকের সঙ্গে মিলিয়ে যে আখ্যানের বুনন তৈরি করে, তা চিত্তাকর্ষক। অভিনবও। সেই সঙ্গে লোকজ এলিমেন্টের তত্ত্বায়ন, গল্প বলায় দেশীয় রূপকথার শৈলীকে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সোহারাব হোসেন আড্ডায় একথা বলতেন এবং বিশ্বাস করতেন, 'ওরা (বিদেশি ঘেঁসা ছোটগল্প সম্পর্কে তত্ত্ব) যা বলে গেছে গল্প সম্পর্কে তা যে আমাদের সব সময় মেনে নিতে হবে তা কিন্তু নয়, আমাদের নিজস্ব গল্প বলার একটি শৈলী আছে রূপকথা এবং উপকথাতে।' কিংবা 'আমি এই গল্পের লেখক স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দিচ্ছি—আমার বাম গালে নয়-নয় করে তিন জন মহিলা চুম্বন দিয়েছেন।'[১৫] এখানে এই যে তিনের অনুবর্তন তা আসলে এক্সেল অরলিক্সের এপিক লজের লজ অব থ্রির অনুবর্তন, যা গল্পবয়নে এসেছে।

তর্কের খাতিরা যদি কথা ছেড়েই দিই, 'উপরের কথা তো হল, কিন্তু আনন্দ কই? গল্পে রস কই?' তা হলে একবার অনুরোধ ওনার যে কোনো গল্পগ্রন্থের যে কোনো একটি গল্প পড়ুন, তাহলেই বুঝবেন—কেন সোহারাব হোসেনের গল্প পড়া জরুরি।

**তথ্যসূত্র :**


১। কারণ 'না- হয়ে থাকার অবস্থা তো আদতে চৈতন্যহীন হয়ে থাকা!' চর্চা, হওয়ার সুখ, আব্দুল কাফি, চর্চা, সম্পাদক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় ডিসেম্বর ২০১৭, পৃ ১৫৯।

২। চিত্রকরের রোগকথা, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কারিগর, ২০১৭।

৩। ২০১৬ এ নিজ বাস গৃহে নিবন্ধকারের নেওয়া অডিও ভিডিও সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেছিলেন গল্পকার সোহারাব হোসেন।

৪। 'আধুনিকতার তিনটে দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। একটা হচ্ছে : আধুনিক রাষ্ট্র ছাড়া আধুনিকতা ভাবা খুবই শক্ত।.. আধুনিকতার আর একটা দিক হচ্ছে: এই রাইট—এর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যে-রাইটের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনজীবন সেই জনজীবনের চেহারা অর্থাৎ Civil Society....আর thirdly ব্যক্তিমানস। সে মুহূর্তে অমরা রাইট





বলি—যে কথাটা ব্যক্তিমানসে interiority তৈরি করে...' মনোরথের ঠিকানা গ্রন্থে আধুনিকতা : চেতনার অনুষঙ্গ শীর্ষক সাক্ষাৎকারে দীপেশ চক্রবর্তী এ কথা বলছেন। মনোরথের ঠিকানা, দীপেশ চক্রবর্তী, অনুষ্টুপ, ২০১৮, পৃ. ২৯০-২৯২।

৫। যদিও দশক ওয়াইজ এই বিভাজন মেনে নেবেন না অনেকেই। এলিয়ট যে ভাবে দশ বছর বাদে বাদে বিপ্লবের কথা বলেছিল সাহিত্যে, বুদ্ধদেব বসু তাকে আনলেন সাহিত্যের ধারাকে বোঝবার জন্য দশক ওয়াইজ একটি রীতি। এবং এখনও সেই ক্রম চলছে একটি দশক থেকে আর একটি দশক কোথায় আলাদা সেই ক্রমকে বোঝবার জন্য। যদিও কতটা যুক্তি সঙ্গত এই প্রক্রিয়া, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

৬। সোহারাবের 'আয়না যুদ্ধ', ড. তৌসিফ হোসেন, সোহারাবের কথাসাহিত্য আততায়ী সময়ের রূপশিল্প, করুণা, ২০১৬, পৃ. ১১৮।

৭। আয়না যুদ্ধ, রাজেশ নামে বালকের গল্প— এক অথবা অমর সন্তানের গল্প সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ১৫৩।

৮। প্রাগে মিলান কুন্দেরার 'ঠাট্টা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হবার পরপর উনি 'ঠাট্টার জ্যামিতি' শিরোনামে একটি লেখা লেখেন। সেখানে ঠাট্টার সংস্কৃতির মধ্যে যে এই দিকগুলো লুকিয়ে থাকে, সে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। মিলান কুন্দেরা, আপনাকে যে চিঠি এখনো পর্যন্ত লিখে উঠতে পারিনি, পাতাউর জামান, নতুন শতক, সম্পাদক সায়ন্তনী নাগ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৪৪।

৯। ঐ, ১৫৪।

১০। ঐ, ১৫৯।

১১। ঐ, ১৬০।

১২। ঐ, ১৬০।

১৩। আয়না যুদ্ধ, রাজেশ নামের বালকের গল্প—দুই, অথবা সিন্ধু সভ্যতার গল্প, সোহারাব হোসেন, করুণা প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ. ৩১২।

১৪। ঐ, ৩১০।

১৫। ঐ, ৩০৯।

ম দ ন চ ন্দ্র ক র ণ

## দোজখের ফেরেস্তা ঃ গল্পবাজুড়ে গুরু

"—মরণের পর কেতা বেহেস্তো পাবে, কেডা দোজোক পাবে তা আমি," এখনও বুঝতে পারি না।... কিন্তু ১৯৯২ সালে বসিরহাট কলেজের বিপরীতে ফাল্গুনি সিনেমা হলের পাশের চায়ের ঠেকতে ফেরেস্তার মতো এক গল্পবাজুড়ে তরুণ অধ্যাপকের সাথে পরিচয় হয়। তিনি আমার দুই একজন স্বজন ভ্রাতার বন্ধু স্থানীয়। এক ঝলক কথায় তাঁকে ভারী মিষ্টি আর বিচিত্র লাগলো। কখনো তাঁকে মনে হলো নাস্তিক। কখনো আস্তিক। কখনো মনে হলো ঘোর কমিউনিস্ট আবার কখনো মনে হলো জাতীয়তাবাদী উদারতান্ত্রিক। জাত্‌পাত আর মানুষের কৃত্রিম ধর্মভেদ কিছুতেই ইনি পাত্তা দেন না। অল্প পরিচয়েই ভদ্রলোক আমার হাতে একটি বই দিলেন। বইটি খুব ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস। নাম- 'কেয়ামতের দরবেশ হবার কাহিনী' (পরবর্তীতে নাম পরিবর্তন হয়েছে।) খুব ভালো লাগলো। কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের মোহ ত্যাগ করে চলে গেলাম নতুন সাহিত্যাচার্যকে ভালোবেসে। মফস্বলের কলেজ। তা হোক, 'এস-এইচ' আছেন। কলেজ রুটিনে এস-এইচ স্যারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। অসাধারণ গুরু। তাঁর যতো নাম যশ। ততোধিক তাঁর নিন্দুক। আমি যতই গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র বলি, ততোই যেন দুই চারিজন অন্য শ্রদ্ধেয়'র কাছে হাস্যকর হয়ে উঠি। আমাকে একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক বললেন—'এই করণ তুমি শুনলাম অমুক কলেজ ত্যাগ করে এসেচ, গল্পবাজুড়ে সোহারাবের কথায়.....। বসিরহাট কলেজে'র রেজাল্ট ভালো। তবে, খুব ভালো না। সোহারাব তো পার্ট টাইম পড়ান....—অদ্ভুত মানব চরিত্র। এই ভদ্রলোক আর সোহারাব স্যার পরস্পরের বন্ধু।...মস্তিষ্কের বোধ আর বুদ্ধিতে আমি হ্যাংলা। তা বলে গুরু নিন্দা আর নিন্দুক স্তাবকতা করা যায় না। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' পড়েছি—'আমি রব নিষ্ফলের হতাশার দলে..."

'কেয়ামতের দরবেশ হবার' কাহিনী পড়ে আর ক্লাস করতে করতে বুঝেছি যে সোহারাব হোসেন নতুন যুগের বিস্ময়কর কথাকার। তাঁর হাত দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিরপেক্ষ সুশীল জনতার সাহিত্য পাবে। বেবি পিসি তথা সোহারাব স্যারের ভগিনী এবং স্যারের বাবা-মা মাটিয়া বাজারের অদূরে একটি আটচালা টালির বাড়িতে তখন থাকতেন। মাটিয়া বাজারের গায়ে তখনও তাঁদের দোতলা পাকাবাড়ি হয়নি। স্যার অবিবাহিত। বসিরহাট খানবাহাদুর রোডের কাছে তখনও শ্বশুরবাড়ি হয়নি। নিম্নবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসার জন্য সত্যই আমার শিক্ষাগুরু স্বপ্নের সাহিত্যের গল্পবাজুড়ে। আজ আমি সেই গল্পবাজুড়ে গুরুর—"দোজেখের ফেরেস্তা" গল্পটির প্লট-ক্যারেক্টার-কনটেন্ট-ক্যানভাস ল্যাঙ্গুয়েজ-ডায়ালেক্ট— ডিক্‌শন- আর্ট— 'স্টাইল- ফিক্‌শন' আলোচনায় যত্নবান।




Vol. V Issue-IX / ISSN : 2394-4889

যতটুকু আমার জ্ঞানের বহর কুলায় মনে হয়েছে গল্পকার বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে 'ছোটপ্রাণ ছোটকথা/ছোট ছোট দুঃখকথা (বর্ষা যাপন কবিতা) রচনায় অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। কেননা তাঁর গল্পগুলির প্লট প্রধানত, গ্রাম জীবনকেন্দ্রিক," তাঁর ঝুলিতে সঞ্চয় কম নেই। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি বিশাল। মনটি সজীব, কানটি সজাগ, চোখটি তীক্ষ্ণ। জীবনকে দেখতে জানেন, দেখাতেও জানেন। আপাদমস্তক তিনি জীবন জিজ্ঞাসু। গল্প পরিবেশনের কৌশল যেমন তাঁর আয়ত্বে, তেমনি সিদ্ধহস্ত গল্পরস সৃষ্টিতে" (ড. মানস মজুমদার) (শ্রেষ্ঠগল্প-ভূমিকা)

তাঁর কয়েকটিগল্প সংকলন যেমন—দোজখের ফেরেশতা, বায়ুতরঙ্গের বাজনা, আয়না যুদ্ধ, বোবাযুদ্ধ, আমার সময় আমার গল্প, সুখ সন্ধানে যাও, ভেজা তুলোর নৌকা। এই গল্পগুলির মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় গল্প হলো—'দোজেখের ফেরেস্তা'।

স্যার মাটিয়া-বক্সির হাট অঞ্চলের একজন 'মরাগরীব'—'ক্ষেত মজুর-কুলিমজুর' কে সত্য সত্যই মাঝে মাঝে পকেট থেকে কিছু টাকা সাহায্য করতেন। বাইরের থেকে তিনি বিজ্ঞান মনস্ক যুক্তিবাদী অধ্যাপক হলেও ভেতরে ভেতরে ছিলেন 'মহান বীর বৈজ্ঞানিক ইসলামে বিশ্বাসী। লোকজ-কুসংস্কার যুক্ত ইসলামকে তিনি সমালোচনা করতে ছাড়তেন না। স্বরূপনগর, বেঁকি, বসিরহাট মিত্রিরবাগান, মাটিয়া, বাদুড়িয়া, খোলাপোঁতাতে তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল শৈশব থেকেই। তিনি মাষ্টারমশাই হিসাবে স্ব-গ্রামাঞ্চলে অত্যন্ত সমাদরের পাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি দেশের কাছে শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ এবং লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠালাভ করেন। পূর্বে-টাকী হাসনাবাদ এবং পশ্চিমে দে-গঙ্গা পর্যন্ত চব্বিশপরগণার প্রধানত মুসলিম জনগণের ভাষা, কথ্যভাষায় নির্মিতি হয়েছে 'দোজেখের ফেরেস্তা' গল্পের 'প্লট-ক্যারেক্টার-কালচার-লিটেরেচর।

**চলুন প্লটের কথায় ঃ**

উত্তর ২৪ পরগণার মুসলিমরা সাধারণত, একটু বেশি ধর্মপ্রাণ। খাসবিধি, পীর রহমৎউল্লাহ এবং ফুরফুরার পীরদের মুরিদরা এখানে বেশ প্রভাবশালী। হানাফি এবং ফকির মুসলমানরা আছেন। সুন্নি আছেন। দু'চার ঘর শিয়া আছেন। এই মুসলিমরা মূলত, নমশূদ্র-বাগদি-জেলে হিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে দুইচার ঘর পৌন্ড্র। যতটুকু জানি সোহারাব হোসেন স্যার যে বংশে জন্মেছেন, সেই বংশের পূর্বপুরুষরা এক সময় পৌন্ড্র তথা সাবেক পোদ তথা পদ্মরাজবংশীয়। সাধারণত, খুব গরীব এখানকার মুসলিমরা মানবতাবাদী লেখক বেছে নিলেন নায়ক সাহেবআলিকে। সে একসময়ের ক্ষেতমজুর। ধর্মভীরু। নিতান্ত অসহায় মানুষ। 'পাগলা সাহেবালি'।

চেনা ছন্দে লেখকের গল্পের শুরু, লেখক গল্পের নায়ক সাহেব আলিকে আমাদের সাথে পরিচয় করাচ্ছেন এভাবে—"বাজারে ঢোকার মুখেই রাস্তার দখিন দিকে মুরগিপটির গলি। রাস্তাটাকে আড়াআড়ি অতিক্রম করে যেই না আমার নিত্যকার সান্ধ্য-আড্ডায় মুরগি পটির গলির মোশারফের দর্জি দোকানের দিকে পা রেখেছি, অমনি একটি অমোঘ ও কাতর

আহ্বান আমার পথ রোধ করে দেয়—'মাষ্টার এটটা কথা ছেলো'...দরদীকথক-লেখক রোগা- প্যাংলা-রক্তহীন ফ্যাকাশে সাহেব আলির সাথে সহৃদয় আলাপ করেন। তাঁর 'শরীর-গতিক' কেমন আছে জানতে চান।...সাহেবালি কাতরকণ্ঠে জানায়—দেড়টা টাকা হবে মাষ্টার। আটাডা কোনো রকমে কিনেছি। এখন গুড়টুকু যা হোক কিনতি হয়।... 'দেড়টা টাকা দ্যাও তবে...।'

—এমনি করেই কত কিস্তি যে কথক দেড়টাকা দিয়েছেন সাহেবালিকে এখানে তা উল্লেখ নেই। মোশারাফ দর্জির দোকানে আড্ডায় নিত্য আসে... নিত্যদেখা।

**গল্পবীজ ঃ**

সাহেব আলির—* সংসার ডা মুখ থেবড়ে পড়েছে। (১)

* সাহেবালিকে কেউ জোন্ মজুর নিতে চায়না। (২)

* সাহেব আলি'র এ সময় গা-গতরে খুব বল ছিল। 'দেড়-দু'জনার' কাজ করতো। (৩)

* সাহেবালি'র অভাবের জ্বালায় তার বউ মোল্লেদের ঘরে ঝি-বৃত্তি করে। (৪)

* সাহেবালি মাঝে মাঝে কবর-খোলার কাজ করে। (৫)

* দুঃখে জ্বলতে জ্বলতে সাহেব আলি সকল মানুষ চরিত্র বোঝে, বিশ্বাসঘাতক স্বচ্ছল বড়লোক, বিশ্বাসঘাতক স্ত্রী, অনেক মানুষকেই সাহেবালি চিনে ফেলেছে। (৬)

* সাহেব আলি সংসারে বীতরাগ হঠাৎ সে দার্শনিকের মতো কথাবার্তা বলছে। জ্ঞানী মানুষের মতো আচরণ করছে। লেখক অবাক বিস্ময়ে সেইসব মূল্যবান কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন... (৭)

* সাহেব আলি সব শেষে বলছে—"মরণের পর কেডা বেহেস্তো পাবে, কেডা দোজোক পাবে তা আমি শালা এখন বুজদি পারি.....প্রসঙ্গক্রমে স্যার আইজাক্ নিউটনের থার্ড ল' মনে আসে—— "Every action has an equal-opposite reaction"

রি-অ্যাকশন্—

১। মাস্টার হেসে ফেলেন আর সাহেব আলির প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন।

২। সাহেব আলি কবর খোলার কাজ করে টাকা চাইতে পারে না। কারণ....সে জানায়—চাবো কী করে? সব শালার লাশের গা-দে পচা-দোজোকের গন্ধোই পাই। বোঝো কিনা মাষ্টার বেহেস্তোর ফুলির বাগানের গোন্দো আর কোনা লাশের দেহ'র থেকে পাইনে।

৩। 'দেড় কিলো আটাও জোগান করতি পারিনে ফি দিন...'

৪। পরের হয়ে যাচ্ছে বউটা।

৫। সাহেব আলি 'মাষ্টার'কে দেড়টা টাকার কাতর আবেদন করে.. তার মধ্যে তিনটি জিনিস দর্জির কলের চাকার মতো ঘুরপাক খায় সেগুলি হলো— বেহেস্তোর সুবাসা দেড়টা টাকা। মাংসবুকির বউডা।

মাষ্টার উচ্চ শিক্ষিত, মানবদরদী এবং জনসমাদৃত ব্যক্তি। তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা থাকে ইসলামী ভাষার 'ইলমে লাদুন্নী' বলছি তার অভাব ছিল না। এখন তিনি পরমব্রহ্মজ্ঞান তথা



ইসলামী ভাষায় যাকে 'আবদাল' বলছি তাতে উত্তীর্ণ হন এবং গল্পের নায়ক সাহেব আলি তথা সাহেবালিকে পৌঁছে দেন। লেখক-কথক-মাষ্টারের কথায়—

"বস্তুত, সাহেবালিকে এখন যতই দেখছি ততই আমি বিস্মিত হচ্ছি। এমনকী মনের মধ্যে এই চিন্তা বিশ্বাসের মতো প্রবেশ করেছে যে, সাহেবালি এই মর-জগতের কেউ নয়। স্বর্গীয় ঐশ্বর্য ও পরিবেশের কোনো বিশেষ কাজে ঈশ্বর তাকে নররূপে মর্তে পাঠিয়েছেন—এমন ভাবনায় এখন আমি সাহেবালির প্রতি খানিকটা শ্রদ্ধাশীলও।"

গল্পের অন্য চরিত্র মোশারফ দর্জি। কথক-মাষ্টারকে বলেন—"তোমার মাথা খারাপ হয়েছে মাষ্টার? সাহেবালির দেহে কখনো ফেরেশতা বাসা বাঁধতে পারে? ও হল বাবা হ্যাংলা মানুষ।"

কথক মাষ্টার অবশ্য ভাবেন—

"তা যদি না হবে, তবে ওই যে বেহেস্ত—দোজখের গন্ধ পাবার ব্যাপারটা কী করে ঘটছে?"

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল কবি কালিদাস রায়ের বিখ্যাত কবিতা 'চাঁদ সদাগর'-এর সেই বিখ্যাত কথা—

"মানুষই দেবতা গড়ে/তাহার কৃপার পরে/করে দেব মহিমা নির্ভর।"

ফেরেস্তা তথা দেবতা হয়ে গেলো সাহেবালি কথকের মন-মুকুরে। গল্পের চরম-উৎকর্ষ এখানেই। এবার শুরু রস-পরিণতির তীব্র করুণ বিয়োগান্তক দার্শনিক উৎলব্ধির দিকে চলা। পতন-উন্মুখ ক্রিয়া কথক হঠাৎ দেখছেন যে সাহেবালি আর তেমন মোশারফ দর্জি'র সান্ধ্য আড্ডায় আসছে না। মরাগরিবের জন্য কথক-লেখকের মন ভারাক্রান্ত। বেদনাময়। লেখক-কথক প্রতি নিবিড় ভাষায় দু'টি বিষয় দেখেন। তার একটি হলো মৃত পরিবারের অনেকে সাহেবালির বারান্দায় হত্যে দিয়ে পড়ে থাকে।" সাহেবালি সুখে নেই। এদিকে দর্জি খবর দেয়—

"শুনেছ মাষ্টার। সাহেবালির বউটা মোল্লেদের ছোট ছেলের সাথে পালিয়েছে। শালার নারী জাতটাকে বিশ্বাস করাও পাপ।"

এই ঘটনা শোনার পর মাষ্টার এক সন্ধ্যার অন্ধকারে সাহেবালির কাছে খবর জানতে, কুশল নিতে ছুটে গেছেন। সাহেবালি কোনো আতিথেয়তা করেনি। বসতে দিয়েছে একটুকরো ছেঁড়া মাদুর। কথক নিজেকে অপমানিত বোধ করছেন.....কিন্তু তার প্রবল আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারেন নি। তাই গুটি মেরে বসে পড়েন। আর বলেন—'শরীর গতিক ভালো তো সাহেবালি ভাই?..... কথোপকথন সূত্রে জানতে পারেন, সাহেব আলি কবর খোঁড়ার ডাক আর পায় না। সাহেব অঅলি দোজখের গন্ধ পায়। তাই কবর খুঁড়তে আর ইচ্ছুক নয়। কথক বলেন—' তা তুমি তো দোজখের খবর না দিলেই পার সবার কাছে।"

*চরিত্র চেনা যায় এখানেই। সাহেবালির পরিচয় পাই গল্পের কয়েক লাইনেই—" তুমি

বলো কী মাষ্টার'—যেন চিৎকার করে ওঠে সাহেবালি। তার ভেঙে নুয়ে পড়া দেহটা ধনুকের ছিলার মতো টান টান হয়ে ওঠে। বলে—'না গো মাষ্টার তুমি আজো মানুষ হলে না। মুখ্যই থেকে গেলে। আমার তো মিথ্যে কথা বলতি নিকো।'

কথক স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন—

'হ্যাংলা হাবা সাহেবালির কাছে মাথাটা নত হয়ে গেল। মুখে বেশ কিছু সময় কথা জোগালো না।'

কিছু সময় অতিবাহিত হবার পর, সাহেবআলি জিজ্ঞেস করেন—গোন্দো পাচ্ছো মাষ্টার? কোনো পচা গোন্দোর ইশারা?' কথক মাথা নেড়ে 'না' জানান। তখন সাহেবালি আবার বলে—

'আমার মরার সময় ঘুনগে এয়েছে মাষ্টার। বউডা হুড়কে গ্যালো। জোন মজুরি জোটে না।'

লেখক-কথক উৎসাহিত হয়ে ওঠেন....স্বর্গ-মর্ত্ত্য/বেহেস্ত-দোজখ গন্ধে ভরা বাতাস থেকে দূরে এসে জিজ্ঞেস করেন—

আজ কিছু খাওয়া হয়েছে সাহেবালি ভাই?

কাছে টাকা পয়সা কিছু আছে?

সাহেবালি মাথা নেড়ে 'না' বলে।

মাষ্টার আর সাহেবালির শেষ কথোপকথন টুকু গল্পের জীবনদর্শন এবং রসপরিণতি। আমি পাঠককে ওরিজিনাল অ্যাকশান বোঝার জন্য তুলে ধরছি—

খাবে কিছু....আমি উৎসুক হয়ে উঠি।

—আচ্ছা মাস্টার তুমি সত্যিই কোনো গোন্দো পাচ্ছ না? পচা গোন্দো?

—না, পাচ্ছি না সাহেবালি ভাই—আমি যেন প্রতিবাদ করে উঠলাম।

—জানো মাষ্টার শালা আমারও কপালে দোজোক লেখা রয়েছে। দেখতি পাচ্ছো না সারাটা দেহ দুর্গোন্দে ভরে উঠেছে।

আমি চমকে উঠি। ভীত হই। কথা ঘোরানোর জন্য বলি ঃ

—টাকা নেবে সাহেবালি ভাই? দেড় টাকা?

—না মাষ্টার তুমি মানুষ হলে না? টাকা দে কি বেহেস্ত কেনা যায়? বউ বেঁদে রাখা যায়?

মুখ্যু শালা লেখাপড়া শিকে তুমি মহামুখ্যু থেকে গেলে। সরো। পত্ দ্যাও।

বাড়ি যাও মাষ্টার এই দোজোকে তুমি থেকো না।' বলেই হন হন করে রাতের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে।"

সাহেবালির পরিত্যক্ত বারান্দাতে কথক একা বসে থাকেন। জোরে জোরে শ্বাস নিতে থাকেন কিন্তু কোনো গন্ধ তাঁর মাথায় প্রবেশ করে না.....



**সমালোচনা ঃ**

১. গল্পের প্লট-তে Single impression আছে। H. L. Hudson কথিত নিয়মে, গল্পটি আকার অনুযায়ী নিশ্চয় সুন্দর প্লট।

২. অ্যাডগার অ্যালানপো'র কথা অনুযায়ী মানবজীবনের খণ্ডচিত্রের উষার লেখকের সন্ধানী চোরা লণ্ঠনের আলোই ছোটগল্প।

এদিকে দিয়ে গল্পটিতে—লেখক কথন, মোশারফ সাধারণ প্রশ্নের শরিক মানুষ, হাবা হ্যাংলা সাহেব আলি মানুষ না ফেরেস্তা?

অদ্ভুতজীবন জিজ্ঞাসায়, অতিক্ষুদ্র পরিসরে গল্পটি বাংলা গল্পের আঙিনায় বেশ চমৎকার গল্প।

৩. ছোট প্রাণ-ছোটকথা'র যে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় দিয়েছেন সে অনুযায়ী এই গল্পের নায়ক সাহেবালি মরা গরীব। অতি ছোট মানুষ দেড়টাকা-দেড়কেজি আটার প্রত্যাশী।

স্মৃতি আর বিস্মৃতির, দ্বন্দ্ব আর অন্তর্দ্বন্দ্বের, যুক্তিতক্কের কাছে লেখক কথকের মাথা খনত হয়ে গেছে। অদ্ভুত লৌকিক এবং আলৌকিকের দ্বন্দ্ব। লোক-বিশ্বাস আর বেহেস্ত-দোজখ তথা স্বর্গ-মর্ত্য ভাবনার সব যুক্তিতর্কের নিরিখে হেরে যান কথক। দৃঢ় বিশ্বাস হয়—নিশ্চয়ই সাহেবালি ফেরেস্তা....।

৪. চমৎকার লোকভাষায় গল্পটি প্রাঞ্জল।

৫. ডায়ালগ খুব প্রাণবন্ত।

৬. কথক-চরিত্রে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিভাবনা। কথক 'ঈশ্বর' বলছেন। আল্লাহ বা খোদা বলছেন না।

৭. এক অধিবেশনেই গল্পটি পড়ে নেয়া যায়। শেষ হলেও গল্পটি অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে শেষ হয় না....?

৮. কিছু স্থূল-নগ্নতা আছে। তবুও গল্পটি খুব সুন্দর।

**মূল্যায়ন :** তারাশঙ্কর, অদ্বৈতমল্লবর্মণ, অমিয়ভূষণ প্রমুখের উত্তরকালের লেখকদের মধ্যে সোহারাব হোসেন ভূয়োদর্শী-দিক দিশারী লেখক। ভাষা-শিল্প-প্লট-কথা উপস্থাপনার তিনি অনেক বড়।

**উপসংহার :** দোজেখের ফেরেশতা'র কথক নায়ক-লেখকের জবানীতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। খুলে দিয়েছে মানবতার দরজা। খুলে দেয় মানবিকতার সুর। নতুন শিল্পের দিক্ দিশা। কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক? শিল্প স্বর্গ। শিল্পকুশল হয়েছে।

———————

মু ন মু ন ঘো ষ

## আমার সময় আমার গল্প : প্রসঙ্গ ভোগাবাদী মানসিকতা

'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'—এর শাণিত জোরালো দাবি এখন গণস্বরে রূপান্তরিত। আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই নিজের মতো করে দিন যাপনের ইচ্ছা পোষণ করে। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত প্রত্যেকেই মনের মধ্যে তৈরি হওয়া কৃত্রিম চাহিদার দাবি মেটাতে বদ্ধপরিকর। যিনি মেটাতে পারেন, তিনি লাভ করেন একধরনের আত্মতৃপ্তি, আর যিনি পারেন না তিনি হন হতাশাগ্রস্থ। এই আত্মতৃপ্তি কিন্তু সাময়িক। কারণ স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আবারও জন্ম নেয় ভিন্ন কোনো চাহিদা। প্রকৃতপক্ষে এ এক ধরনের ঘূর্ণি বা চোরাস্রোত। সমাজবদ্ধ মানুষের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের ভোগ্যবস্তু অবশ্য ভোগবাদী দর্শনের আওতায় আসে না। ক্ষুদ্র পরিসরে জীবনটাকে ইচ্ছে মতো উপভোগের ভারসাম্যহীন আকাঙ্ক্ষাই ভোগবাদের মূলকথা। ভোগ আসলে চোরাবালি। তার সতত উন্মোচিত মুখবিবরে তলিয়ে যায় জীবন। লাঞ্ছিত হয়। হারিয়ে যায় সুখ-শান্তি-স্বস্তি। এ শুধু ভোগবাদী সভ্যতার নাগপাশে সুখের আশায় বন্দী হয়ে সুখ হারিয়ে মাথা কুটে মরতে থাকা।

ভোগের স্বরূপটি চিহ্নিত করা খুব সহজ নয়। কারণ, এর গতি বিচিত্র। ততোধিক বিচিত্র তার মুখোশ। প্রতিক্ষণে বদলে যায় তার চেহারা। ক্রূর নিয়মিত মতো সমাজের মানবভাষ্যকে ধ্বস্ত করে চলে। এই সময় এবং এই সময়ের মানুষের জীবনের উপরে ভোগের অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ। সেই নিয়ন্ত্রণের চাকায় আটকে পড়ে সব ধরনের মানুষ। আর ভোগবাদী মানুষের জীবনের আপাত সুখী সুখী দৃষ্টিনন্দন চিত্রপটের অন্তরালে রয়েছে নিকষ কালো হতাশা, রিরংসা, ব্যর্থতার উল্লাস জর্জরিত, সঁপে দেওয়া মানসিকতা সর্বস্ব মানুষের ছবি। ব্রাত্য, খেটে খাওয়া নিম্নবিত্ত, উচ্চাশী মধ্যবিত্ত, প্রভুত্বের আসনাধিকারী উচ্চবিত্ত—সকলেই ভোগের সুখে বা অসুখে আক্রান্ত। সমাজের কোষে আবদ্ধ এই সব মানুষ, তার সময় ও সময়ের জন্মচিহ্ন সহ প্রবেশ করে সাহিত্যে। গল্পকারের নিজের কথায়, 'মানুষকে আমি দুরকম প্রেক্ষিতে দেখি।' এক, মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিক বৃত্ত। দুই, মানুষের জাগতিক বৃত্ত। ব্যক্তি-মানুষকে ঐ বৃহৎ জাগতিক বৃত্তের রক্ত-মাংস-বীজের সঙ্গে অন্বিত করানোর পরই গল্প থেকে আমি সরে আসি। তখন বৃহৎ ব্যাপারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে চরিত্রগুলো নিজের নিজের 'পার্ট'গুলোকে আউরে যায়।' ফলে গল্পকাহিনীর নির্দিষ্ট পরিসরে ব্যক্তি-মানুষের নিজস্ব ব্যক্তিক গণ্ডী ও তার সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষ সংলিপ্ত বৃহত্তর প্রেক্ষিতের রসায়ন সমানভাবে ক্রিয়াশীল লেখকের গল্পগুলিতে। ফলত সময়ের সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে পরিচিত পরিসর, যা পাল্টে দিচ্ছে চারপাশের সমাজ ও মানুষকে। চোখের পলকে অচেনা হয়ে যাচ্ছে তারা ও তাদের গতিবিধি। ক্রমাগত অচিন মানুষ হয়ে ওঠার, বিশ্বজুড়ে পুতুল খেলার বিচিত্র দ্রুত চিত্রিত হয়েছে গল্পগুলিতে। সেই বিচিত্র খণ্ডভূমের মানুষের খণ্ড বিখণ্ড দিন যাপনের ফাঁক-ফোঁকরে প্রবিষ্ট হয়েছে ভোগ, ভোগের আকাঙ্ক্ষা। রচনা করেছে চিত্র বিচিত্র





ফাটল। কাহিনীর অঙ্গ প্রতঙ্গে বাসা বেঁধে থাকা ভোগবাদের স্বরূপটি চেনার প্রয়াসে নজরে এসেছে কয়েকটি ধারা—

অ।। বাংলার পরিচিত রূপকথার আখ্যানের চাঁদটিকে লেখক গল্পের আঙ্গিক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই ধরনের গল্প আঙ্গিকের স্তরে স্তরে ভোগবাদের স্পষ্ট উপস্থিতি। ভোগ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী মানুষ ভোগের ফাঁদে ধীরে ধীরে আটকে পড়ে। ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত হলেও বেরিয়ে আসার পথটি অজানা অভিমন্যুর মতো চক্রব্যূহে ক্রমাগত ক্ষত বিক্ষত হতে থাকা। পালানোর পথ নেই। তাই অবাধ্য সমর্পণ ছাড়া কোন উপায় থাকে না। 'পুতুলনাচ জল দেবী কিংবা পুণ্যতোয়া বেতসীর ইতিকথা', 'কবির লড়াই' প্রভৃতি গল্পগুলিকে ভোগের আফিম নেশা ধরিয়ে দেওয়ার স্তরগুলি লেখক উপস্থাপন করেছেন নানা বিভঙ্গে।

আ।। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধমান। এই ক্ষমতা আর অর্থ দুই ভোগাকাঙ্ক্ষার পালে জোর বাতাস দেয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদায় ক্রমশ বিপন্ন হয় মানুষ নিজেই। সেই বিপন্নতা সঞ্চারিতা হয় ব্যক্তি থেকে সমাজে। একদিকে অর্থ ও ক্ষমতার মেরুকরণ, অন্যদিকে তাদের অপব্যবহার। এ দুয়ের যৌথরূপে 'রাজদূত রাজদূত', 'বোমের সন্ততি', 'মুক্তিপণের চব্বিশ ঘণ্টা' প্রভৃতি গল্পে চিত্রিত হয়েছে ক্ষমতা ভোগের সীমাহীন লোভ।

ই।। ইণ্টারনেটের এই চলিত যুগে ভোগবাদের অন্তঃসার শূন্যতায় জন্ম নেয় Pathos. বিজ্ঞাপনী বাণিজ্যের নৈতিকতাহীন চটুল দিকগুলি ক্রমশ ফেঁপে ওঠে। ভোগবাদ আর ভোগবাদী লোকজ-দেশজ সংস্কার, সংস্কৃতি মিথ্যা হয়ে যায়। ভোগবাদের মধ্য দিয়ে চলতি দুনিয়ার চর্চিত বিষয়গুলি প্রতিফলিত হয় 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা', 'আয়না যুদ্ধ' প্রভৃতি গল্পে।

বিশ্বায়নের এই যুগে ইণ্টারনেটের জলিকাপাশে আবদ্ধ মানুষের জীবনকথা যখনই সাহিত্যে অনুপ্রবেশ করে তখন তার পার্শ্ববর্তী ও তার সঙ্গে সংলিপ্ত সব কিছুই অনুপ্রবিষ্ট হয়। অনুরূপভাবে লেখকের গল্পগুলিতে ভোগবাদও প্রবিষ্ট হয়েছে। অবশ্য বিচিত্র তার রূপ, সর্পিল তার গতি। এ কথা মনে রেখে আমরা একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে পারি। যার তিনটি বিন্দু ভোগের তিনটি পৃথক রূপ বা অবস্থান নির্দেশ করে।

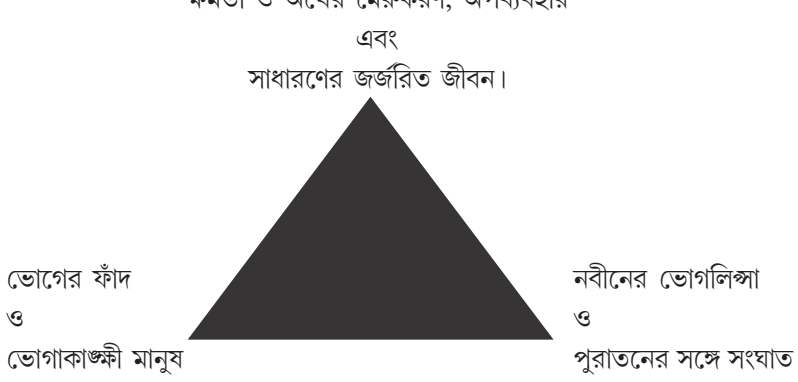

'আমার সময় আমার গল্প' গল্পগ্রন্থের অন্যতম গল্প 'পুতুলনাচ জলদেবী কিংবা পুণ্যতোয়া বেতসীর ইতিকথা'র মূল কেন্দ্রবস্তু ভোগাকাঙ্ক্ষা। লেখক এ গল্পের প্রচলিত রূপকথার আদলকে হাতিয়ার করেছেন। অফুরন্ত স্বর্ণমুদ্রা আর ভোগের কামনামদির বিজ্ঞাপনী চমকের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় জাল বিস্তার। রূপকথার সর্বজ্ঞ চিরযৌবনের চিরকালীন প্রেমের প্রতীক ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী হয়ে উঠেছে চিরসুখের বিজ্ঞাপনী চমক। আর তেপান্তরের মাঠে তৈরি হয় ভোগের বেসাতির রণকৌশল। 'রূপকথার দেশের রাজার চালক ও ধারক মহামতি কুবেরকান্তি'। কুবেরকান্তি বলেছেন 'চোখ চিরে বুঝে নিন আপনারা। আপনাদের হাতে আমি তুলে দিচ্ছি স্বর্ণমুদ্রার অফুরন্ত ভাণ্ডার, কামনামদির, অসংখ্য চলচ্ছবি, আর বিনোদনের অনিঃশেষ মাধ্যম। সবই পুতুলনাচের কায়ানাচ ও ছায়া খেলার মধ্যে দিয়ে পরিবেশন করতে হবে।' গল্পের শুরুতেই আছে চমক—

তেপান্তরের মাঠে পুতুলনাচের আসর চলছিল। হ্যাঁ, তেপান্তরের মাঠ মানে রূপকথার ঐ তেপান্তরের মাঠ, যে মাঠ সাত সাগর তেরো-নদীর পারে অবস্থিত। এ মাঠ স্বপ্নময়, মোহময়, মায়াময়। এখানে সদা যৌবনের জলতরঙ্গ বাজে। যৌবন রস কখন এ মাঠেরই এক প্রান্তে রয়েছে কল্পতরু বৃক্ষ। এই বৃক্ষের মগডালে বাস করে চির-যৌবনের চির-প্রেমের প্রতীক ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীর সুপ্রচুর খ্যাতি। আখন, রাজাদেশ বলে ঐ কল্পতরু বৃক্ষের নীচে পুতুল নাচের আসর বসিয়ে, নাচের বিভিন্ন দৃশ্য, তাৎপর্য এবং সূক্ষ্ম প্রয়োগ কৌশল ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমিকে বোঝানো হচ্ছে।

অর্থাৎ তা হয়ে উঠেছে গোপন শলাপরামর্শ বা ষড়যন্ত্রের ভাগীদার। এ গল্পে Symbol বা প্রতীকের নিপুণ ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকের মতো এখানেও রাজা প্রত্যক্ষভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু কুবেরকান্তির মাধ্যমে রাজাদেশ পৌঁছয় সাধারণের কাছে। রাজার ইচ্ছে পূরণই শেষ কথা। তাতে সাধারণ প্রজার যতই ক্ষতি হোক না কেন, কুবেরকান্তি রাজার চালক ও ধারক। এতো আসলে প্রতীকের আড়ালে থাকা সেই পুঁজিবাদী শক্তি, যার অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয় দেশের সুখ-শান্তি। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি হল দেশের বুদ্ধিজীবী মহল। যাদের পাশে পেলেই কেল্লা ফতে। যে কোনরকম টোপ এঁদের মাধ্যমে সহজেই সাধারণকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। তাই এদের যে কেনা উপায়ে দলে রাখা দরকার।

—'কিন্তু হে ভদ্রবন, আমরা কি এই কাজের উপযুক্ত?—ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমি কিছুটা বিড়ম্বিত স্বরে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, আপনারই উপযুক্ত। আর্যাবর্তে আমাদের পদসঞ্চারের জন্য আপনারই যথার্থ। কারণ আর্যাবর্তবাসীগণ স্বভাব-স্বপ্নিল। আপনারা নাচের দল করলে ওরা মোহিত হবে। প্রভাবিত হবে। এটা তো সত্য?

—হ্যাঁ তা সত্য। কিন্তু ভদ্রবন, অ্যামন কার্য করলে তো আমাদের নিয়ে যে সুখীজীবনের মিথ আর্যাবর্তে প্রচলিত আছে তা ভেঙে যাবে।

—যায় যাবে।



—আমরা তা চাইছি না।

—আপনাদের চাওয়া থেকে রাজার চাওয়া অনেক বড়ো।

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমি অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীর ন্যায় বা অন্যায়ের মাপকাঠি রাজার ধারক চালক কুবেরকান্তির কাছে সঠিক মান্যতা পায় না। বরং তাদের চিরযৌবন (পড়ুন যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও সুখের উপকরণ) কেড়ে নেওয়ার হুমকির সামনে তারা মাথা নোয়ায়। মেরুদণ্ডহীন হয়। সেইসঙ্গে সুযোগ বুঝে নিজেদের সম্পদ আরও বাড়িয়ে নেওয়ার আত্মসুখে নিমগ্ন হতে থাকে। 'নিজেদের পিরিতিকে একটু গাঢ় করে' নেয়। অপরিসীম দারিদ্রের মধ্যে শ্বাস নেওয়া, কঙ্কালসার চেহারার, অনাহারে অর্ধাহারে দিনগুলো যাপিত হয় যে মানুষগুলোর, তাদেরই ব্যবহার করা হয় ধনসঞ্চয়ের, ভোগলিপ্সার, আত্মতুষ্টির প্রয়োজনে। দরিদ্রের সরল দিনযাপনে অপ্রতুল চাহিদার আগুন জ্বালিয়ে স্বর্ণসম্পদ, নারীসম্পদ ও ভোগসম্পদে মোহগ্রস্থ করে, তাদের জীবনে তৈরি করে অন্তহীন বিপন্নতা। ভোগভাগের রাজত্বে সাধারণের মূলমন্ত্র হয়—'জীবন মানে ভোগবাদ'। আপাত স্বাচ্ছন্দ্যের জোয়ারে অন্তর্হিত হয় স্বাভাবিক শান্তি, স্বস্তি, সুখ ও জীবিকার মূল উৎসগুলি। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রের কাহিনীর মতো সোহরাবের গল্পের অন্তঃশরীরে ভোগবাদী যুগযন্ত্রণার বেদনামলিন অথচ তীক্ষ্ণ তীব্র সুরটি পাঠক অগ্রাহ্য করতে পারেনা।

ভোগবাদী মানসিকতার আসক্তিঘন নেশার করুণ চিত্রটি ফুটে উঠেছে 'ফ্ল্যাটবাড়ির বিবেক' গল্পে। ফ্ল্যাটবাড়ির নামের মধ্যেই আছে দুর্ধর্ষ twist-'রতিভিলা'। 'নামকরণ যিনি করুন না কেন তার রসবোধের তারিফ করতে হয়।' এই রতিভিলারই কেয়ার টেকার বছর আঠারো উনিশের বিবেকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত হয় ভোগসর্বস্ব মানসিকতার স্বার্থমগ্ন, বোধহীন চেহারাটি। আর্থিকভাবে দুর্বল, সহায় সম্বলহীন মা ছেলের সুখের পরিমাণ একটু একটু করে বাড়িয়ে নিয়ে অর্থের পিছু ধাওয়া করতে থাকে বিবেক। এও কি এক ভোগাকাঙ্ক্ষার মানসিকতা নয়? দ্রুতগতিতে আরও অর্থ সঞ্চয় করার প্রবণতা সময় মতো থামাতে পারেনা। একেবারে থেমে যায়। জমি পাগল যে চাষার গল্প বিবেক বলেছে, সে নিজে চাষার মতো বোকামি করতে না চেয়েও আর্থিক লাভের সন্ধানে চরম বোকামিটাই করে ফেলেছে— 'বাপ নিরুদ্দেশ হবার পর পড়াশুনা ছেড়ে ধরলুম সব্জির ব্যবসা। তা ছেড়ে কোলকাতার কোম্পানিতে নাইটগার্ড—আটশ টাকার চাকরি। ফের তা ছেড়ে আপনাদের ফ্ল্যাটে ভর্তি হলুম বারোশা টাকায়। এসব দেখেই—মা বলে—অতো লোভ ভালো নয় বাপ। থাম, এক জায়গায় দাঁড়া। দৌড়স নে।' বিবেক যেন হয়ে ওঠে আজকের প্রজন্ম। আরও আরও অর্থ উপার্জনের লোভ পেয়ে বসেছে। ক্রমাগত চলছে অস্থির উল্লম্ফন, দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য নিরন্তর অনিঃশেষ দৌড়। এরই ফাঁকে ঢুকে পড়ে নেশাতুর রঙিন জীবনের হাতছানি। প্রাণ বিপন্ন করেও সেই দুনিয়ার চাক্ষুষ লেহন তো ভোগবাদেরই নামান্তর। প্রতি মঙ্গলবার আর শনিবার রাতে ফ্ল্যাটে কেউ ঘুমোয় না। তারা সারা রাত জেগে দেখে 'নীল ছবি'। একদম সরাসরি সঙ্গম দৃশ্য। আধুনিক

যন্ত্রের সাহায্যে সেক্স কলার চৌষট্টি রকমের কৌশল। আর 'ওসব দেখার পর ওরা তো সব স্বর্গে চলে যায়।' সাময়িক সুখবিলাসের অবিবেকী ঢেউয়ের তোড়ে ভেসে যায় ফ্ল্যাটবাড়ির বিবেক নামে কেয়ার টেকার ছেলেটি। ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দাদের ভোগসর্বস্ব মানসিকতায় কোথাও এতটুকু অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে না বিবেকের মৃত্যু। বরং বিবেকের মায়ের পুত্রশোকের কান্নায় তারা শুনতে পায় লোকগানের সুর। পুত্রহারা মায়ের আর্তি তাদের কাছে—'এই হল আমাদের কান্ট্রির অরিজিন্যাল ফোক্। দেখছেন কেমন করুণ রসের মাদকতা ছিটকাচ্ছে কান্না থেকে'। চ্যানেল টি. বি. সিক্সের নীল হাতছানির টানে জানলা থেকে জানলায় সান্‌সেট পার হতে গিয়ে অসাবধানে পড়ে মারা যায় বিবেক। ভোগের উন্মত্ততা ডেকে আনে মৃত্যু। এই সত্য উন্মোচিত হলে ফ্ল্যাটবাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে নড়েচড়ে ওঠে ভয়ের সরীসৃপ। কিন্তু সে ভয় মনের। তাই মান বাঁচাতে মুহূর্তেই ফুঁসে ওঠে egol বিবেক অবরুদ্ধ হয়। এই তো ভোগের চরিত্র। তার স্বভাব মানুষকে বিবেকহীন লোভী স্বার্থপর আত্মমশগুল করে তোলে। বর্তমানে সেই চেহারাটি স্পষ্ট হয়েছে গল্পে।

'আমার সময় আমার গল্প' গ্রন্থের আর একটি গল্প 'কবির লড়াই'তে ভোগবাদের প্রকাশে কবি ব্যবহার করেছেন রূপকথার মোটিফ। শিল্পের সুকোমল দেহে ভোগের ছায়াপাত তথা রাষ্ট্রশক্তির নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা গল্পটিতে ভিন্ন মাত্রা সংযোজন করেছে। রূপকথার দেশ রসনগরী। রাজা স্বপ্নপ্রসন্ন। অতি কোমল, মহানুভব, সদাশয় ব্যক্তি। সাতিশয় সৌন্দর্যপ্রিয়ও বটে। বিশেষত কাব্য সাহিত্যের প্রতি তার বিশেষ ঝোঁক। তাই সভাকবি রাজার অত্যন্ত প্রিয়। দৃশ্যমান জগৎ মনের রসে ভিজিয়ে রাজাকে পরিবেশন করেন। রাজক্ষুধার স্বরূপ রাজকবি জানেন, তাই চিন্তিত হন মাঝে মধ্যেই। অবশেষে একদিন রাজকবি বাণিজ্যবর্মের আশঙ্কা সত্যি হয়। পেপসি কোকের অনন্তগুণে যুবক যুবতীর মদির প্রেমালাপন রাজার মনে রসের সোঁতা বইয়ে দেয়। তিনি সপ্তাহান্তে একটা করে নিত্যনতুন প্রেমকাহিনী শোনার ফরমান দেন। বাণিজ্যবর্মের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা সত্ত্বেও 'মদ-মধু-মোহের মৌতাত রস জমে না।' 'সপ্তাহ ধরে ভাবেন, কষে শোলক রচনা করেন। রাজা কথিত মদ-মধু-মোহের জারক রসে কাহিনিকে সাঁৎলে দ্যান তেল কই রান্নার মতোন। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়না।' রাজা কবির লড়াই ঘোষণা করেন। যুদ্ধে জিতলে তবেই মিলবে রাজকবির আসন। রাজার মৌতাত জমাতে, যৌবনবতী মদালসা যুবতীর রূপের অস্ত্র কবি পেলেন রূপকায়ার কাছে। সে অস্ত্রেই ফিরে পেলেন হারানো সম্মান। কিন্তু শিল্পী আর শিল্প উভয়ই পরাধীন হয়ে গেল রাজশক্তির কাছে। আপন হৃদয়ে তখন দুশ্চর পারাপার।

বোধহয় চাইলেও অস্বীকার করা যায় না যে ভোগের সঙ্গে অর্থ ও ক্ষমতার একটা সম্পর্ক আছে। এবং এই সম্পর্কটা proportional অর্থাৎ ক্ষমতা ও অর্থের বৃদ্ধি বা হ্রাসের হারের সঙ্গে ভোগাকাঙ্ক্ষা সমানুপাতিক। এ গল্পে বর্তমানে যৌনতা সর্বস্ব সাহিত্যিককে ব্যঙ্গ করেছেন গল্পকার। বিজ্ঞাপনের চটকদারি চমকে দেশীয় সংস্কৃতির গুড় ও জলের স্থলাভিসিক্ত হয় পেপসি-কোক জাতীয় নরম পানীয়। অতি সাধারণ মানুষও এই লোভনীয়



পানীয়ের নাগপাশে জড়িয়ে পড়ে সহজেই। কিন্তু এ কি শুধু পানীয়ের গুণে? নাকি Libidinal impulses দিয়ে গড়া বিজ্ঞাপনী চমকে আকৃষ্ট হয়ে। বাহ্য সেই চমক তৈরি করেন বাণিজ্যবর্মের মতো রাজকবি। যেখানে ক্ষমতা তার অর্থের দাবির কাছে পরাভূত হয় শিল্প, মানবতা। নিজের রাজপদ রক্ষার তাগিদ বড় বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে। রাজকবির সহজাত কবি সত্তাটি তিনি বন্ধক দেন রাজপদে। এমনটি কন্যা ঋতুকায়ার মর্যাদাটুকুও রাজসভায় দেদার বিলিয়ে সম্মান কিনতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না তিনি। যৌনরসের সন্ধানে তার পিতৃসত্তাটির অকাল মৃত্যু ঘটেছে। ভোগাবাদী মানসিকতায় লালিত সমাজকাঠামোয় মানুষ মূল্যহীন। মূল্যহীন তাদের পারস্পরিক কোমল সম্পর্কগুলি। ক্ষমতার পদলেহনে কেবলই চলেছে নিজের স্বার্থের ভাঁড়ার পূর্ণ করার পালা। প্রাসাঙ্গিক হয়ে ওঠে শিবরামের কবিতা—

"এই শুধু বলিবারে চাই—সকলের মূল্য আছে
মানুষের মুল্য কিছু নাই।"
('মানুষের মূল্য'—'মানুষ'-শিবরাম চক্রবর্তী)

'রাজদূত রাজদূত', 'বোমের সন্ততি' কিংবা 'মুক্তিপণের চব্বিশ ঘণ্টা', প্রভৃতি গল্পে ক্ষমতালিপ্সু ধনবাদের দানবীয় রূপটি প্রতীয়মান। এই কাফেলা সময়ের ছায়াপাতে গল্প শরীরে ভোগবাদের দগদগে ক্ষতটি পাঠকের নজর এড়ায় না। সার্বিক অবক্ষয়, বিবর্ণতার অঙ্গ হিসাবে ভোগবাদের ভূমিকাটি সোহরাব গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। ফলে তাঁর গল্পগুলিতে সাহিত্যের সৌখীন মজদুরি নেই, বরং তিনি 'ঘুমতাড়ানি গল্পকার' হিসেবেই বর্তমানে সমাজ ও জীবনের ক্লেদাক্ত দিনলিপি নির্মাণ করেছেন কিছুটা মঁপাসার মতোই। আধুনিক জীবন ও ঐতিহ্যের নিয়মিত সহবাসের মধ্যেকার conflict তাঁর গল্পের বিষয়। ফলে ইন্টারনেট, কেবল-লাইন, বিজ্ঞাপন, বিশ্বায়নের সঙ্গে নানা রঙের রাজনীতির ঝাণ্ডা, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে গ্রামীণ শহরে নানাস্তরীয় রাজনীতি ঢুকে পড়েছে কাহিনীতে।

ভোট রাজনীতির ঘেরাটোপে ক্ষমতা ভোগের নেশায় বিশ্বাসহীনতার গল্প 'রাজদূত রাজদূত'। বৈকুণ্ঠ অর্থাৎ রাজদূত বংশ পরম্পরায় দৌত্যের কাজ করে। 'খোলার পানি মালায় আর মালার পানি খোলায় ঢেলেই দিব্যি কাজ চালায় বছর ত্রিশের বৈকুণ্ঠ। রাজদূত হিসেবে যে সময়াপোযোগী। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়স হলে দূতেরা বিশ্বাসঘাতক হয়—এহেন সংবিধান রাজব্যক্তি জানেন ও মানেন। তাই বৈকুণ্ঠের মতো সফল রাজদূতের মেয়াদ একসময় ফুরিয়ে আসে। বৈকুণ্ঠের এই বংশ-পেশার প্রতি আনুগত্যও ত্রিশের পর বিশ্বাসযোগ্য হয় না একক ক্ষমতাভোগী রাজব্যক্তির কাছে। তাই বৈকুণ্ঠের প্রত্যাশা পূরণ হয় না সময়ের সঙ্গে রঙ বদলে ফেলা রাজব্যক্তির অঙ্গুলিহেলনে। এই রাজব্যক্তির বসের রাত দশটার রুদ্রমোহন রূপ সকাল আটটায় থাকে না। তখন 'বস্ দেবতা'—'বস্ জাদুকর, বস্ দুনিয়ার বাপ। অ্যাক অঙ্গে বহুরূপ বস্ অবতার।' এই অবতারের স্বরূপ অনুমানে বৈকুণ্ঠ সমর্থ হয় না। কিংবা পুরানো শিক্ষার বশবর্তী হয়ে দৌত্য সফলে প্রয়াসী হয়। সে তার বিবেকের

কাছে, সততার কাছে, ন্যায় ধর্মের কাছে বিশ্বস্ত থাকে কিন্তু ক্ষমতার কাছে জীবনকে হারিয়ে ফেলে—

'তার হাতেধরা সন্দেশ পত্রটা রাজপুরুষের হাতে পুনরায় দেয়। দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক। রাজপুরুষ বলে

—এ নির্দেশের অর্থ বোঝ?

—না বস্! বৈকুণ্ঠ সাদা চোখে জানায়।

এই যে লিখেছে, রাজপুরুষের কণ্ঠ আচ্ছন্ন হয়—'ফ্লপিটা খুলছে না'। এর মানে জান তুমি?

বোঝ?

—না বস্

...

শোনো ফ্লপি হলে তুমি। তুমি খুলছ না—মানে বেগড়মবাই করছ। তাই তোমাকে আর দরকার নেই। বুঝলে?

—বিভীষণ-বিভীষণ! বুঝেছি!

—তাতে তৈরী হও

না তৈরি হবার সময় পায়নি বৈকুণ্ঠ। পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে রাজপুরুষের ইশারায় কেউ অ্যাকজন পিস্তল চালিয়ে দ্যায়। চোখ দুটো ঠেলে বেরোনোর আগে বৈকুণ্ঠ অতি চাপা স্বরে অ্যাকবার শুধু বলতে পেরেছিল, 'বিভীষণ-বিভীষণ! বসকে বলে দেবেন—দৌত্য সফল করেছি আমি।'

ক্ষমতার শীর্ষে থেকে ক্ষমতা ভোগের ক্রূর মানসিকতা, আধিপত্যের সামান্যতম বিচ্যুতির আশঙ্কাও বিশ্বাসভাজনের জীবনহানি ঘটাতে পারে। এই গল্পে ভোগবাদী মানসিকতার দুটি দিক আমরা নিরীক্ষণ করি। এক, রাজপুরুষ তার ক্ষমতালিপ্সার সেই মেরুবিন্দুতে বাস করেন, যেখানে অসৎ না হয়েও অন্যায় না করেও, চূড়ান্ত বিশ্বাসভাজন থাকা সত্ত্বেও বৈকুণ্ঠকে হত্যার নির্দেশ দিতে দ্বিধা করেন না, কেবল একক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য। দুই, বৈকুণ্ঠ দৌত্যের নিয়ম জানা সত্ত্বেও ত্রিশ বছর অতিক্রম করার পরেও পুনঃবহাল হতে চায়। সে কি কেবল তুবড়ির জন্য নাকি দৌত্য তার ভালো লাগে বলে, নাকি ক্ষমতার নিকটবর্তী আরামদায়ক উত্তাপে নিজেকে সেঁকে নেওয়ার প্রবণতা। বৈকুণ্ঠ রাজপুরুষের কাছাকাছি অর্থাৎ ক্ষমতার সন্নিকটে অবস্থান করে ক্ষমতা ভোগের মধ্যে দিয়ে আত্মতুষ্টি বিধানে পরিতৃপ্ত হতে চেয়েছিল। গল্পের প্রথম দিকে বৈকুণ্ঠের আত্মপরিচয় দেওয়ার মধ্যে দিয়ে এই মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। আগাগোড়া রাজনৈতিক গন্ধবাহী এ গল্পে ভোগবাদী মানসিকতাই এই রূঢ় বাস্তবের প্রধান কারণ।

'মুক্তিপণের চব্বিশঘন্টা' কিংবা 'বোমের সন্ততি' গল্পেও রাজনৈতিক আবহের অন্তরালের সুরটি ভোগবাদের। ধর্ম, রাজনীতি, দাম্পত্য মিলেমিশে গেছে গল্পের কাহিনীতে। জীবনের



শান্তি, স্বস্তি অপেক্ষা দেশীয় রাজনীতির কূট-কৌশল ও তার প্রতি আস্থাহীনতা, সাম্প্রদায়িকতা ও তা থেকে বাঁচার অন্বেষণ মানুষের মধ্যে ঘটায় রূপান্তর। ক্ষমতা দখলের এই গল্পদ্বয় রাজনীতির ডানায় ভর করে ভোগাবাদ হয়ে উঠেছে ক্রূর নিয়তি।

ভোগাবাদ আর ভোগাবাদী মানসিকতা, অনৈতিক টাকার বিজ্ঞাপনী চটক, বিশ্বায়নের অপরিসীম আগ্রাসন, শোষণের অদৃশ্য সম্মোহন, তৃতীয় বিশ্বের সংকটময় সময়ে জটিল আবর্তের সদাদ্বন্দ্বময় সহবাসে একই সাথে ঘনিয়ে তুলেছে বিষ আর অমৃত। 'আয়না যুদ্ধ' গল্পে বিশ্বায়নের ভোগবাদী বিষে জর্জরিত পাশ্চাত্যায়ানার মুখোশটি খসে পড়েছে যাদু আয়নার সাহায্যে। ভোগসর্বস্ব চিন্তা চেতনার আমূলে ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন গল্পকার। জাদুবাস্তবতার আশ্রয়ে গভীরতর জীবন সত্যের দর্পণের সামনে দাঁড় করিয়েছেন পাঠককে। কোনো অজ্ঞাত কারণে আত্মনাশের মুহূর্তে, শহরের অভিজাত পাড়ায় বিদেশী ঘরনার উগ্র জীবনের তীব্র বিকারের প্রতি ধিক্কারে সুধাময়ী ধোপদোরস্ত শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া পরিত্যাগ করেছিলেন। তার ঝুলন্ত নগ্ন দেহ আধুনিক জীবনের চারুকলায় অভ্যস্ত সুদর্শন, উত্তরা, শাওন, শ্রেষ্ঠার সঙ্গে পাঠককেও বিস্ময়বাক করে। উগ্র আধুনিকতার সঙ্গে ঐতিহ্যের পরাজয় ঘটেছে তখনই সুধাময়ীর দুঃখে রং বদলেছে ময়ূরপঙ্ক্ষী ড্রেসিং টেবিলের জাদু আয়না। প্রথমবার, 'কাঁহাতক টাটকা মালা জোগড় করা যাবে এই অজুহাতে' সুধাময়ীর স্বামী অর্থাৎ সুদর্শনের পিতার ছবিতে যখন 'সিন্থেটিকের পার্মানেন্ট মালা ঝোলান হল, তখন সুধাময়ী আয়নার সামনে বসে বহুক্ষণ অঝোরে কেঁদেছিলেন।' আর রং বদলেছিল আয়নার। দ্বিতীয়বার, 'সেটা পরিবারের অ্যাকটা কালান্তরের দিন ছিল। সেই দিন থেকে এ বাড়িতে লেবু মধু জলের সরবত বন্ধ হয়ে গেছিলো। বাড়িতে অতিথি এলে সুধাময়ী লেবু মধু জলের সরবত বানিয়ে দিত। কিন্তু এতে স্ট্যাটাস আসে না বলে উত্তরা বিদেশী নামি কোম্পানির কোল্ডড্রিংসের পাকাপাকি ব্যবস্থার হুকুম দিয়েছিলো'। সেদিন সুধাময়ী খুব কেঁদেছিলেন। আর বলেছিলেন, 'যেদিন আমি মারা যাব সেদিন দেখিস, এ আয়না জাদু দেখাবে!' সুধাময়ীর মৃতদেহকে পোশাক দিয়ে ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে পরিবারের সকলে। বিদেশী দামী নাইটিতেও নগ্নতা ঢাকা দেওয়া যায় না। বরং আয়নায় তারা পরস্পরকে পোশাকহীন দেখতে পায়। আরও দেখতে পায় তাদের চারজনের মাঝখানে শুয়ে সুধাময়ী হাসছেন—অট্টহাসি।

এই গল্পে সুধাময়ী ঐতিহ্যের প্রতিনিধি আর তার পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনিরা উগ্র আধুনিকতার প্রতিমূর্তি। গল্পের মধ্যে ধরা পড়েছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার নিত্য দ্বন্দ্বটি। ভোগবাদী সভ্যতার গ্লানিময় রূপটি গল্পের সমাপ্তিতে তীব্র মর্মাঘাতের মতো বেজেছে। আয়নায় দেখা যায় আধুনিকতার প্রতিনিধিদের নগ্ন রূপ—যা বর্তমানের ভোগবাদী মানুষ, ভোগবাদী সমাজ-সভ্যতার প্রতিরূপ। যুগের নগ্নতাই প্রকটিত হয়েছে গল্পের অন্তিমে। অনুরূপ ভোগসর্বস্ব দুনিয়ার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাই 'বায়ুতরঙ্গের বাজনা' গল্পে। প্রেমহরি ও তার বন্ধু উজানের ঊর্ধ্বপদ হেঁটমুণ্ড হয়ে হাঁটার ইমেজটিই গল্পের 'মেধাকেন্দ্র'। দণ্ডমুণ্ডের

কর্তার নিরাপত্তারক্ষীর বিপর্যয়ের সূত্রে দেশের নিরাপত্তা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন গল্পকার। ভোগবাদ ও তার তরঙ্গ বাজনা এই বিপর্যয়ের কারণ। ফলে বদলে গেছে গল্পের বয়ন ভাষা। গল্প শুরু হয় অদ্ভুদ শব্দ জাদুতে।

—'মা হিসু'।

রোজকার মতো মাঝ-রাত্তিরে এই অমোঘ উচ্চারণ শুনতে পায় প্রেমহরি। শোনামাত্র সে তৈরি হয়ে। কাঁধের বন্দুকটা নামিয়ে রাখে ছোট্ট চারফুট-বাই-চারফুট পাহারা ঘরের দেয়ালে। দুহাত উপরের দিকে তুলে 'পোজ' নেয়। চোখের দৃষ্টি সেঁধিয়ে দেয় তার সাহেবের জানলায়। সে জানে এরপর ছ'বছুরে ধাঙড় ছেলের পেচ্ছাপের ধারা ছড়ছড় করে নীচে পড়বে'।

প্রেমহরির হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদের হাঁটা দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে সাহেবের স্ত্রী-পুত্র। সাহেব বিষোদ্গার করতে থাকেন। কিন্তু প্রেমহরি ভোগবাদী দুনিয়ার থ্রিলারের মায়াজালে সম্মোহিত করতে সমর্থ হয়। সাহেবপুত্রের বহুজাতিক টিভি চ্যানেলের এক ছবি বর্ণনা, সাহেবের স্ত্রীর সমর্থন,—সব মিলিয়ে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে বাস্তব-বুদ্ধি আচ্ছাদিত হয় ভোগবাদী সম্মোহনে। ভোগসর্বস্ব দুনিয়ার বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে এ গল্পে। ইন্টারনেটের বাহাদুরি, ভোগবাদের অন্তঃসার শূন্যতা ধ্বনিত হয় প্রেমহরির কণ্ঠের শ্লোকে—'প্রেমহরিতে খেল দেখাল।/বড় সাহেবের নিন্দ ভাঙিল।/বাপ তোর পায়ে নমস্কার।/হে প্রেমা নামের গোলোক ধাঁধায় সাহেব ধাঁধে যেন বারবার।' ভোগসর্বস্ব দুনিয়া অস্থির করে তোলে প্রেমহরির দাম্পত্যজীবন। তার বিছানায় ঢুকে পড়ে বিদেশী টিভি কোম্পানির বিশেষ চ্যানেলের তরঙ্গ। টিউব টিপে মলমের মতো মশলার আমদানি, বাতাসের কাঁধে চড়ে টিভির পর্দায় মডেলদের মানুষের মন ভোলানো সাজের পরামর্শ—প্রেমহরি আনতে পারেনা স্ত্রীর জন্য। কিন্তু সে বুঝতে পারে এই তরঙ্গের খিদে। কেমন করে সে গ্রাস করেছে মেমসাহেবকে, তার ছেলেকে। 'তেমন করে সজনীকে খেতে আসছে।' এ তরঙ্গ ভোগের তরঙ্গ। সে সব খায়। 'মানুষ খায়, মাটি খায়, বাতাস খায়।' সেই সঙ্গে 'অচেনা চ্যানেলের বাজনা বিপ বিপ করে অবিরাম সংকেত দ্যায়—'দাস দাসী হাজির! কী চাই ম্যাডাম কী চাই?'—ভোগসর্বস্বতার করাল গ্রাস সে অস্বীকার করতে পারে না। গল্পের শেষেও এই বিপ বিপ বাজনা থামে না। এ আসলে ভোগবাদের এক অনন্ত শোষণ প্রক্রিয়া। পরাক্রমী ভোগবাদের কাছে প্রেমহরি দুর্বল হয়ে পড়ে। শুধু প্রেমহরি নয়, সমগ্র মানবজাতি ভোগবাদী দানবের দুর্নিবার মোহদুর্গে বন্দী।

সোহারাব হোসেনের গল্প ক্রান্তিকালের বাক্‌শিল্প। নিয়তি চিহ্নিত সমাজ সময়ের কেন্দ্র থেকে তিনি তুলে এনেছেন গল্পের কাহিনী। খোলা বাজার, মুক্ত অর্থনীতি, বিশ্বব্যাপী বাজার ধরার প্রতিযোগিতা, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনীতির অস্থির চোরাগলিতে অসাম্য অর্থনৈতিক আবহে ভোগবাদ পরিণত হয়েছে বর্তমানের ভগবানে। এই ভূখণ্ডের চলমান জীবনকে প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত করে চলেছে ভোগবাদের ক্রুর নিয়তি। যাপনকে ধ্বস্ত করছে প্রতিমুহূর্তে।



পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্বতা অভিশাপের মতো কঠিনভাবে গ্রাস করেছে এ ভূখণ্ডের জনজীবন। কেড়ে নিচ্ছে আমাদের ঐতিহ্য, বিশ্বাস। ভালোবাসার মতো কোমল অনুভবগুলো বিশ্লেষিত হচ্ছে ভোগসর্বস্বতার দাঁড়িপাল্লায়। চরমতম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রবাহে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে প্রাত্যহিক দিনযাপনের সহজতা। ভোগবাদের উচ্ছাসে ভেসে, ভোগবাদের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত জীবনে ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছি আমরা। সোহরাব হোসেনের গল্পে ভোগবাদে আক্রান্ত সেইসব মানুষের বেদনার্ত ছবি। বড়ো কষ্টে আছে মানুষ। কাঁদছে মানুষ। মানুষ আর যন্ত্রের মিথস্ক্রিয়ার বিকারে ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে চলেছে আমাদের আক্রান্ত মানবসত্তা। রাজনীতিতে আর যন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত জীবনের যন্ত্রণায় তার গল্পগুলি জায়মান। শিবরাম চক্রবর্তীর একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে এ সময়—

"মানুষে মানুষ খায়, খেয়ে বেঁচে থাকে প্রতিদিন—
রক্ত খায়, মাংস খায়, মেদ মজ্জা খেয়ে করে ক্ষীণ
খায় মন-আত্মা, খায় জীবনের অর্ধেক নিঃশ্বাস—"

**গ্রন্থ সহায়তা :**

১। আমার সময় আমার গল্প (গল্প সংকলন), সোহারাব হোসেন, পুনশ্চ কলকাতা, ২০০৮।

২। বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতি প্রকৃতি, সোহরাব হোসেন, প্রথম খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২

৩। সোহরাব হোসেন : জীবন ও সাহিত্য, ড. আব্দুর রহিম গাজি ও ড. তৌসিফ আহমেদ (সম্পাদিত), সময়কালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, ২০১৮

৪। সগিমুণ্ড ফ্রয়েড সংখ্যা, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১৪

অ রি ন্দ ম গো স্বা মী

# সোহারাব হোসেনের 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা' : নিজস্বতার সাক্ষর

সময়ের বিচারে সাহোরাব সোসেন-এর 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা' (২০০২) লেখকের দ্বিতীয় গল্পসংকলন হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিলো। এই গল্পসংকলনে যে কুড়িটি গল্প স্থান পেয়েছে সেগুলি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। এর আগে লেখকের প্রথম যে গল্পসংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিলো —সেটির নাম 'দোজখের ফেরেশতা' (১৯৯৬)—যেটি বাংলা আকাদেমি থেকে সোমেন চন্দ স্মারক পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এইখানে এই তথ্যটিও মোটেও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, দ্বিতীয় সংকলনের নাম-গল্প ('বায়ু তরফের বাজনা')টির জন্যেও সোহারাব ২০০০ সালে সর্বভারতীয় কথা পুরস্কারে সম্মানিত হন। সাহিত্যজীবনের সূচনায় সোহারাব হোসেন মূলত কবিতাই লিখতেন। তাঁর প্রকাশিত প্রথম দুটি গ্রন্থও কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু ছোটোগল্পের লেখক হিসেবে তাঁর সাহিত্যজগতে পদার্পনকে নির্দ্বিধায় আবির্ভাব-ই বলা চলে।

এরপর-পরই অবশ্য সোহারাব অনেক ছোটোগল্প লিখেছেন। তাঁর মৌলিক ছোটোগল্প সংকলনের সংখ্যা সাত—২০১০ ও ২০১১ তে প্রকাশিত যথাক্রমে শ্রেষ্ঠগল্প ও নির্বাচিত গল্প-কে ধরলে প্রকাশিত গল্পসংকলনের সংখ্যাটা মোট—নয়। শতাধিক গল্প লিখেছেন সোহারাব। এছাড়াও গ্রন্থবদ্ধ হয়নি অথচ কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে অথবা এখনো অপ্রকাশিত এমন কিছু গল্পও আবিষ্কৃত হওয়া খুব বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু গল্পকার সোহারাবের গল্পরচনার মধ্যে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে। তাঁর নাম ছাড়াই তাঁর গল্পগুলিকে অনায়াসে চিনে নেওয়া যায়। তাঁর অধিকাংশ গল্পের চরিত্ররাই বারাসাত, বাদুড়িয়া-বসিরহাট হয়ে টাকি রোডের দুইপাশের আবাদ অথবা ভেড়ি অঞ্চলের মানুষ। গ্রামীন জীবনবোধের অনুসন্ধিৎসায় ও অনুপুঙ্খ খুঁটিনাটি-সমেত বস্তুবিশ্ব নির্মাণে তাঁর গল্পের কথা-শরীর সদাই-স্পন্দিত। এই বিশিষ্টতা আরো পরিস্ফুট হয়—যখন গল্পের চরিত্ররা কথা বলে—চরিত্রদের ভাষাশৈলি। শব্দের নির্বাচন আর বাক্যের মধ্যে শব্দের অবস্থান একেবারেই এই এলাকার সাধারণ মানুষের জীবন-সম্ভূত। গল্পের চরিত্রদের নামকরণ ও তাই সর্বদাই গ্রামের পথ-চলতি মানুষের মুখের ডাক-পোষাকি নাম কখনো নয়। যেমন—লেকাআলি, ছাবেয়ালি, রহমতালি বা আজান—কখনোই লিয়াকত আলি, সাবির আলি, রহমত আলি বা শাহ্‌জাহান নয়। আর হ্যাঁ—এরা বেশিরভাগই গ্রামীণ অনুন্নত, শিক্ষাদীক্ষার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি।

এরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে, তবুও এরাই শোষিত হয়, উৎপীড়িত হয়। তবুও এরাই ভালোবাসে—সন্তানের জন্ম দেয়, আর হ্যাঁ বিশ্বাস করে কোনো এক অতিপ্রাকৃতে। বংশ পরম্পরায় চলে আসা উপকথা, রূপকথা বা মিথকে এরাই বহন করে নিয়ে চলে উত্তরপুরুষের





দিকে। নিত্যদিনের প্রাত্যহিকতার মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান এনে দিতে প্রায়ই গল্পগুলোর মধ্যে এসে যান কোনো ফকির, সাঁই বা দরবেশ শ্রেণীর মানুষ। ফকিরী-মায়ামতি-দেহতত্ত্বের বিভিন্ন গল্পের তাঁরা ব্যাখ্যা দেন বা 'বাতিনি' দেন। মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অন্য এক চেতনার বিশ্ব। আবার কোথাও তাঁর গল্পের চরিত্ররা সাদামাঠা ছোটোখাটো স্বার্থবুদ্ধি-সঞ্জাত জগতের মধ্যে চলতে চলতেই হঠাৎ এক স্বপ্ন দেখে যা বোধের এক প্রান্তে এসে উপনীত হয়। এমনি কাহিনীর অন্য এক পার্যায়ে উল্লম্ফন ঘটে। তখন আর কাহিনী বাস্তবের এই ধুলি-মলিন মাটির পথকে আঁকড়ে ধরে চলে না—কাহিনী তখন উড়তে থাকে অন্যতর এক বাস্তবতাকে সঙ্গী করে। গল্পগ্রন্থের ভূমিকা—'সামান্য-কথা'-তে গল্পকার নিজেই জানিয়েছেন—"গল্প, ছোটগল্প লেখায় আমার ভূমিকা অনেকটা যাদুকরের মতো। যাদুকর যেমন বিশেষ কৌশলে আমাদের চেনাজানা কোনো মানুষকে শূন্যে ভাসিয়ে কিংবা খণ্ডখণ্ড করে কেটে দেখায় তেমনি গল্পে গল্পে প্রচলন ঘটনা-কাহিনী-চরিত্রকে অন্যরকম সত্যে পৌঁছে দেওয়াটাকেই গল্প শিল্পের কাজ বলে আমি বিশ্বাস করি।"—এই অন্যরকম সত্যে পৌঁছানোকেই সোহারাব মনে করেন ছোটগল্পের সার্থকতা।

প্রথম গল্প 'বায়ুতরঙ্গের বাজনা'তেই দেখি প্রেমহরি হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ হয়ে ঘুরে বেড়ায় — যেমন ঘুরে বেড়ায় তার মন্ত্রণাদাতা বন্ধু উজান। প্রেমহরি জেনে ফেলেছে—"হেঁটেমুণ্ড উর্ধ্বপদ তার এই বন্ধুটি একদা তামায় মানুষের মুক্তির জন্য আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছিল। সেই আগুনের শিখাকে তাপ কুসুমে পরিণত করতে পারেনি বরৎ আগুনের আঁচে উল্টে তাদের সারাদেহ পুড়ে গেছিল।" (পৃষ্ঠা-৯) পাঠক বুঝে নিতে পারেন কাহিনী এখন সেই উল্লম্ফনের পথ ধরেছে—সেখানে সাধারণ বাস্তবতার চেয়েও মহত্তর কোনো অভিঘাত তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এই কাহিনীতেই উজান প্রাণহরিকে মন্ত্রণায়দেয়—কাল থেকে তাকে শিকারী হয়ে যেতে—"তুমি শিকার করবে তোমার সাহেবকে, মেমসাহেবকে, তার বাচ্চাহাতি ছেলেকে, তার ঠাকুর-চাকরকে। এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ওদেরকে ধরবে। এক এক করে। এক এক জনাকে ধরবে আর গলাটিপে ধরবে নইলে মরবে না কিন্তু।" —প্রেমহরি ও বিমূঢ় পাঠককে এরপরই আস্বস্ত করে উজান—"আর সত্যি সত্যিই তো তুমি ওদের মারছে না—মারা-মারা খেলবে, ভাবনায়! ব্যাস, তালে দেখবে নিমেষের মধ্যেই রাত কাবার হয়ে যাবে।' (পৃ-৮) এইবার পাঠক বুঝতে পারেন ব্যঞ্জনার গভীরের নিহিত-অর্থটি—যে নিহিত অর্থের উপস্থাপনের নতুনত্ব-ই সোহারাব হোসেনের গল্পরচনার মূল বৈশিষ্ট্য।

এইরকম আর একটি ছবি লাভ করা যায়। 'নূরবক্সের গাঁজাগাছ ও একটা প্রজাপতির গল্প'—শীর্ষক রচনায়। এখানে নূরবক্স দরিদ্র রঙ-মিস্ত্রি। অনেকগুলি ছেলে মেয়ের মধ্যে বড়ো বছর দশেকের হেলাতালিকে নূরবক্স সঙ্গে করে নিয়ে যায়—কাজকর্মের বাড়িতে দুটো খেতে পাবে—এই আশায়। হেলাত কাজের সময় তার বাপকে সাধ্যমত সহযোগিতাও করে। অবশেষে অনেকটা ভাত খায় হেলাত। ফেরার সময় তার চোখে ঘুম আসে। ঘুম আসার মুহূর্তে হেলাতের মনে হয় রূপকথার 'হুমরা রাক্ষস ভাবে বিরাট বড় এট্টা থালা

গরম ভাত খাবালি কীরম হয়? শালা জব্দ হবে তাই না? আর রাক্ষসডা জব্দ হলিই মউয়া সুন্দুরী পরজাপতি হয়ে উই আছমানে উড়ে বসপে! তাই না?"—হেলাত ঘুসঘোরে এইসব ভাবতে ভাবতে পথ হাঁটে। "পিছন থেকে বাপ দেখে, পড়ন্ত বেলার রঙিন আলো ছেলের দেহে পড়েছে। যেন বিচিত্র রঙা প্রজাপতির ডানা হয়ে গেছে ছেলের সারা দেহ। নূরবক্স বিস্ময়মাখা চোখে দেখে একটা রং-বাহারি প্রজাপতি যেন পতপত করে উড়ে যাচ্ছে। তার নাগালের বাইরে। সেই ম-ম করা আম-আদার গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে।" (পৃ-৫৩)

'মানুষরতন' গল্পে শারীরিক প্রতিবন্ধী বাবুলাল গান গায়—মানুষের কাছে গিয়ে, হাটে-মেলায় সেই গল্পের ব্যাখ্যা শোনায়—আর তার চাকাগাড়ি ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যে কচোরনকে মিয়োগ করে। কচোর রোজ দেখে বাবুলালের আমদানি। একদিন কচোর বাবুলালের তবিল নিয়ে পালাতে চায়—কিন্তু বাবুলালের হাতে ধরা পড়ে। শেষপর্যন্ত বাবুলালের চোখ খোলে। খাজান সাঁই বলেন—ধনকড়ি হলো পোকা-ওকে মারতেই হবে। বলেন, "নিজির দেহডারে চেন! ওর দ্বারে দ্বারে বেড়ে ওঠা জ্যান্ত। পোকাগুলোরে মার। মরে যা। মরে বাঁচ। দেহডা রতন। মানুষরা রতন।—পোকায় পোকায় তোরে ঘিরে ফেলেছে। বাঁচপি কী করে? মোরশেদ সোনাই সা বলে জ্যান্তে মরা সোজা কথা না।" (পৃ-২৮)। এসব দেহতত্ত্বের কথা। বাউল-ফকিরের আড্ডায় কান পাতলেই হয়তো একথা শোনা যেতে পারে। কিন্তু এরপরেই গল্পকার তাঁর জাদু দেখান। ত্বরিতে বাবুলাল তার গাড়ি ঘোরায় বাড়ির দিকে। ছুটতে ছুটতে দেখে তার সামনে রোজ কেয়ামতের ময়দান। ময়দানে সব সার সার খাঁচা। বাবুলাল দেখে সব ক'টা খাঁচার মধ্যে বসে আছে কচোর।"—এই খানেই কাহিনী মাটি ছাড়ে —এখানেই সোহারাব তাঁর ক্ষমতা দেখান। (পৃ-২৮) মানুষের ভাবনা-তার মনের মধ্যে ঘটে চলা সমস্ত ঘটনাকে সম্ভাব্যতার সীমা পার করিয়ে রূপকল্পের জগতে নিয়ে গিয়ে পাঠকের বোধের জগতকে তিনি বিস্তৃত করেদিতে চান।

এই 'মানুষরতন' গল্পেই 'খাজান সাঁই' নামে যে চরিত্রটি আছে-সেটি ভারি অদ্ভুত চরিত্র। ফকির থাকেন দু-চালা-কুঁড়ের হোজরায়। শয়ন করেন খেজুর পাতার চ্যাটায়। সন্ধ্যের পর তাঁর ঘরে আলো বলতে একটা কেরোসিনের টেমি। কিন্তু মনটা তাঁর ঐশ্বর্যে ভরা। পার্থিব সম্পদ তিনি স্পর্শও করেন না-বলেন,"এ সপ তো জাহিরি। এসবের কিছু দান নিকো!" (পৃ-১৮) তাঁর মতে মানব দেহে অনেক পোকা থাকে—যেমন লোভ একটা পোকা, কাম-একটা পোকা। এইসব পোকাগুলিকে গলা টিপে মারতে হয়। তাই তিনি বলেন, "কথার কথা নয় জ্যান্তে মরা"। অর্থাৎ "তুমি থাকল, তোমার রতন থাকল জ্যান্ত-মরবে ভেতরের পোকাগুলো।" তাই "ফকির খাজান আলির একই বুলি/যত পার খাও মরার গুলি।"—ফকিরের এই ব্যাখ্যাগুলিকেই বলে 'বাতিনি'। সোহারাব হোসেনের কয়েকটি গল্পেই আমরা এইরকম কিছু ফকিরের দেখা পাই—পরিচিত হই তাঁদের 'বাতিনি'-র সঙ্গেও।

'শ্রীরামপুরে পুকুরের ইতিকথা'—এমনই একটি গল্প। এখানেও ফকিরের নাম খাজান সাঁই। এই দরবেশ সুর করে কখনো বলেন—"প্রেমের খেলা কামের/কেউ যাবে না আগে পরে/ঢাকা শহরের ভজন-ঘরে/ সে প্রেমের ফুল ফোটে থরে থরে।" আবার কখনো



বলেন—"দেখে এলাম ঠাঁই ঠাঁই/শ্রীরামপুর যখন পুকুর অমন পুকুর কোথা নাই" (পৃ-১২-১২৩) তারপর তার বাতিনিও দেন—"শ্রীরামপুরে পুকুর হ'লে আমার গা এই দেহ। শ্রীমানে রূপ। রাম হ'লো আত্মরাম, মানে প্রাণ। তালি কী দাঁড়ালে? আত্মরূপ হচ্ছে এই দেহ। আর পুকুর হ'লো প্রেম। বুইলি?" (পৃ-১২৪)। এইরকম সহজিয়া সাধনার গান ছড়িয়ে আছে সোহারাব হোসেনের গল্পে যত্রতত্র। 'ভাটকাল' নামের গল্পটি শুরুই হচ্ছে এই গানটি দিয়ে—"দেখে এলেম মরা নদীর চরে-এ-এ-এ/এক সর্পের মাথায় ব্যাঙের নৃত্য ময়ূর কেমনে নাচে রে-এ-এ-এ/দেখে এলেম আজব নদীর চরে-এ-এ-এ...' (পৃ-১৬৮)।

আবার 'ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ ও জোড়া মৃত্যুর উপাখ্যান' গল্পের শুরু থেকেই আছে প্রবল নিয়তির মতো মৃত্যু পাঁচালির সুর করে আবৃত্তি। কাহিনীর সূচনার একটু পর থেকে—কাহিনীর সমাপ্তি পর্যন্ত।

বৃদ্ধের কণ্ঠে সুর করে পাঁচালির মাধ্যমে কাহিনী-ব্যাখ্যা করার রীতি দেখা যায় 'রাজকাহিনী' গল্পেও।—"ধারাক্রমে ঘুরে যাবে সহস্র বছর/আঁধার মানিকপুরে বসিবে ঘন অন্ধকার। /সর্পদেহে রাজশক্তির বাড়িবেক ক্ষুধা।/ রাজা-সর্পে অন্ধি-সন্ধি ঘটিবেক সদা।"—এই 'শাস্ত্রের লেখন' দিয়ে কাহিনী অগ্রসর হয়। দেশে দেখা যায় নানা অনাচার—লুণ্ঠন-ধর্ষণ-হত্যা। শেষপর্যন্ত রূপক এই কাহিনী এগিয়ে চলে এইরকম আরো কয়েকটি পাঁচালির মধ্যে দিয়েই। এই কাহিনীতে শেষপর্যন্ত অবশ্য অশুভ শক্তিই তাদের দখল কায়েম রাখে। এই দখল কায়েম রাখার প্রক্রিয়া সোহারাব বজায় রাখেন ভেড়িদখল ও শিশুনির্যাতন নিয়ে আমাদের পরিচিত মাটির পটভূমির ওপর রচনা করা একটি গল্পেও। এই গল্পের নাম—'হাঁসপাখিদের গল্প'। বিল বেজুয়ার পাঁচ নম্বর ঘেরির অবিসম্পাদিত দখলদার মেম্বার ফজের আলির রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে দশ বছরের বালক সাজান তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা হাঁস-পাখিটাকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারে মালিক মেম্বার ফজের আলির মুখে। পাখিটা ফজের আলির মুখে ঝাপটা খেয়ে মাটিতে পড়ে রক্তাক্ত চেহারায়। "পাখিটার দিকে আঙুল তুলে সবার মুখের ওপর কেটে কেটে উচ্চারণ করে সাজান—'কমরেড হবা অতো সোজা নাকো বুঝলে! তুমি আমারে ঐ রাম করে দেছো।" (পৃ-১৫৫)। ভয়ে-তরাসে হতবাক মানুষগুলার জবান যেন বোল হয়ে ফোটে ঐ দশবছরের কিশোরের মুখে।

বিল, ঘেরি অধ্যুষিত পরিবেশ নিয়ে কয়েকটি গল্প এই সংকলনে ঠাঁই পেলেও —এই পটভূমিতে লেখা শ্রেষ্ঠ গল্প নিঃসন্দেহে 'ময়দানব'। এই সংকলনে আকারে দিক থেকে সর্ববৃহৎ গল্পও এটিই। জলের দানো আর ডাঙ্গার মানুষের হার না মানা মানসিকতার চিত্র নিয়েই এই গল্পের সূচনা। কাটাচাকা বিলের পটভূমিতে বাপ হেকমত আর পরবর্তীতে ছেলে মাওলাবক্সের মেছুড়ে জীবনের সংঘর্ষের কাহিনী। কাটাচাকার মেছোঘেরির অকশান নিয়ে বিপত্তির মধ্যে যে অগ্নুৎপাতের সূচনা—সেই আগুন ক্রমেই নানা ইন্ধন পেয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কাহিনীর একদিক টানাটানা করে ধরে রেখেছে বিলের দুই রাঘব বোয়াল দানোর অতিকাহিনী—ঠিক তার অন্যদিকে আছে ডাঙার দুই নরপিশাচ গজব পেধান আর ছাতেম নেতার কাহিনী। এদের প্রতিরোধের জন্য উঠে দাঁড়ায় রাসেক মাষ্টার আর হেকমত

মেজুড়ে। রাত বিরেতে জল কেটে কেটে হাঁটতে হাঁটতে কিশোর মাওলা প্রশ্ন করে—"আচ্ছা বাপ তোর ভয় লাগে না?' তার উত্তরে কেমত জানায়—'রাজ-বিরেতে পোকা মাকড়ের মতোন ঘুরি, তার জন্যি মনডাতে ভয় লাগে না। য্যাতো ভয় তো শালা মানুষির।' (পৃ-৯৮)। মুহূর্তে পাঠকের কাছে পরিস্কার হয়ে যায়-অতিকাহিনীর পটভূমিকায় আসলে কোন কাহিনীর সূত্রপাত করাতে চাইছেন লেখক!

অচিরেই বাপ-ছেলের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে মুখোমুখি হয় চার-পাঁচজন দুষ্কৃতির। তখনকার মতো কিছু না ঘটলেও সপ্তা কাটতে না কাটতেই সাংবেড়ে গ্রামের মানচিত্র থেকে দুটি মানুষ সারাজীবনের জন্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রাসেক মাষ্টারের লাশও পাওয়া যায় না। যদিও হেকমতের লাস পাওয়া যায় কাটাচাকার মাঝখানে, এক বাচ্চা ও মা খেজুর গাছের তলায়—সঙ্গে ছিল একটি দানোব ও লাস। আর সেই দানোর ইয়াব্বড় মুখের মধ্যে মৃত হেকমত মেহুড়ের মাথা।

পরে বড়ো হয়ে সাগরেদ লেকাতালিকে সঙ্গে নিয়ে যখন রাত-মেজুড়ের বৃত্তি নেয় মাওলাবক্স—তখন লেকাতালিকে মাওলা শোনায়—"বুইলি লেকাতালি, বাপ বোলতো মেছুরে জানে যেদি ভয় থেকলো তেবে সে সুমুদ্ধি য্যানো রাত্তিরি আলো-পোলো নে না বেরোয়।'—আমরা হলুমগে রাত্তিরির পোকা। চোখ জ্বেলগে মাছ ধরি, জেন-পরীগা শুঙ্গে ঠক্কর মারি, মাছের চোখি চোখ রাখি তারকেরে প্যাটের গোড়ায় তোমার পানাপানি।" (পৃ-১০২) উত্তরে লেকাতালি জানায়—"ও শালা বড়চার সুগি আতুসিগা দোস্ত-দহবৎ ছেলো। ভয়পিত্তি ছেলো নাকিন তার? সে জোনায় কি মানুষ ছেলো—কী বলিস তুই হ্যারা মাওলাবক্স?' (পৃষ্ঠা—ঐ) সাতনা বলে—"ধুস্ তোর, ও সপ আতুসি-ফাতুসি সপ মিথ্যে কতা। আসল ভয়ডা কীসির জানিস? আসল ভয় তো শালা মানুষির! অর সপ ভষ্ম বুইলি ভষ্ম!" (পৃষ্ঠা-ঐ) মাওলাবক্স আর লেকাআলির মধ্যে এইরকম প্রাণের আলাপের মধ্যে দিয়েই কাহিনী এগিয়ে চলে। প্রেতাত্মা—অশরীরি ছাপিয়ে এইভাবেই মানুষের শয়তানির ভয়াবহতা এখানে বারবার প্রকাশিত হয়। আর এই প্রকাশের মধ্যে দিয়েই গল্পকার সোহারাব হোসেনে কাহিনীবয়নের দক্ষতা আর সংলাপ রচনার অসামান্য কুশলতার চিত্র পাঠকের সামনে উঠে আসে।

শেষপর্যন্ত গল্পে আদিম অতিকাহিনীকে হারিয়ে মাওলার সাহস ও দৃঢ়তারই জয় হয়। একদিন দানোর আঁশ সংগ্রহ করেই দাগের অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়েছিলো মাওলা। যে অকাট্য প্রমাণ মাওলাকে বসিয়েছিলো বীরের আসনে। যে মানুষ ঐ আঁশ দেখেছে সেই শেষে "সবার মতো আঁশটা দেখে জেন আতুসি-দানো-দত্যির ঘোর মাথায় করে বাড়ি ফিরেছে। ফিরেই স্বামীকে, শ্বশুরকে, জা-কে, দেওরকে, জনমদ্দ ছেলেকে, ভরাসোমত্ত মেয়েকে মুহূর্তে দানো-নিধনের খবরটা দিয়েছে।" (পৃ-৯৩) যদিও দানো তখনো নিধন হয়নি, পাওয়া গেছে শুধু তার একখানা আঁশ মাত্র। কিন্তু কাহিনী বর্ণনায় একের মুখ থেকে অপরের কানে প্রবাহিত করে দেবার পরপর বিশেষ্যপদের ব্যবহার পাঠককে চমকে দেয়। শুধু একটা



তথ্যই একটু অন্যরকম ঠেকে —যেখানে দানোটাকে রাখব বোয়াল বলে চিহ্নিত করেও তার সবার মতো আঁশ দেখানো হয়—বোয়াল মাছের কি আঁশ থাকে?

কিন্তু কাহিনীর প্রবল তোড়ে এই ধরনের ছোটোখাটো কূটপ্রশ্ন ঠাঁই পায় না। শেষপর্যন্ত মাওলার কোঁচের আঘাতে যখন দানোটাকে ধরে মেরে ফেলা হয়, দেখা যায় সেটা 'একমুনে এক কাতলা মাছ।' সেটা তারাবাড়ি আনে। দুজনের দুই বউ কাওলাতোন আর জেহেরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কিন্তু এতো উল্লাসেও মাওলা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। বলে 'বাপ থাকলি কি বোলতো জানিস? বোলতো, পানির ডানো তো মারলি বাপো, এবার ডেঙার দানোডা মার।—বলতো, বুইলি খোকা তানারা মরেও তেবু মরে না।"(পৃ-১০৭)। তবুও গল্পকার কাহিনীকে আরো একটু টেনে নিয়ে যান। শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে মাওলা আর লেকাত। আর আধুনিক সময়ের ধারাভাষ্যকার সোহারাব টেনে নিয়ে যান। শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে মাওলা আর লেকাত। আর আধুনিক সময়ের ধারাভাষ্যকার সোহারাব টেনে নিয়ে চলেন অন্য এক অতিকাহিনীকে—"আসন্ন দিন-প্রসবা ভোরে মাওলাবস্কের উঠোনে এক অলৌকিক সময়ের কথাকলি শুরু হয়ে যায়। ক্রমে দিনমনি জেগে ওঠার লক্ষণ প্রকাশ পেল। আর চতুর্দিকে লোক সকলেরা একটি অচলায়তনের মৃত্যু দেখার জন্য সমবেত হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে। (পৃ-ঐ)।

মেহনতী ও প্রান্তিক মানুষদের এই লড়াইয়ের ছবি আমরা আরো একটা গল্পে পাই। গল্পের নাম 'বোসের সন্ততি'। এখানে লেখক যেন ইতিহাসকারের ভূমিকাই পালন করেছেন তাঁর ধারাভাষ্যদানের মাধ্যমে—"সারাদেশে তখন চাষিদের রমরমা, কৃষক-শ্রমিকের রাজত্বি চলছে দেশে। গদিতে বসেই চাষিরা বন্ধু সরকার ফরমান জারি করে দিয়েছে—ভাগ চাষি আছো যারা জমির দখল বর্গা লড়াই কর তারা। ফলে দলে দলে ভাগ-চাষির দল ছুটল অফিস-কাছারিতে জমির বর্গা করতে। বর্গা দখল নিয়ে গ্রাম কী গ্রাম উত্তাল হয়ে উঠল। মালিকের সঙ্গে চাষির সম্মুখ লড়াই। আইন-আদালতে তো বটেই; জবরদস্ত মালিক যারা, তারা লোকবলে, অর্থবলে ও লাঠিবলে বর্গা উচ্ছেদ করতে বদ্ধপরিকর হল।" (পৃ-৩৬)

এই 'বোসের সন্ততি' গল্পেই সম্পূর্ণ অন্যরকম এক তত্ত্ব নিয়ে আসেন সোহারাব—পাপের তত্ত্ব। প্রতিবেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সমরাস্ত্রের প্রতিযোগিতা, অপরকে ভয় দেখাবার জন্যে পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষণ—আর তার প্রভাব হিসেবে ছোটখাটো এলাকার সম্প্রীতির বাতাবরণ নষ্ট হবার প্রক্রিয়াগুলোকেই লেখক এখানে কাহিনীর প্রধান নারীচরিত্র বসুমতীর দেহে কাঁপনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। চরিত্র বসুমতী এখানে ধরিত্রী বসুমতীর সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। চরিত্র বসুমতী তাই বলে—"পাপ এ বড় পাপ। শরীল মা বসুমতী এ পাপ সয় না। তাই কাঁপে দেহ।.... পাপ ঐ বোমাখানা। অনাচার। বসুমতীর দেহে ভাঙন ধরায় যে বোমা, ফেটকে চৌচির কোরে দেয় যে বোমা, সেডাই তো পাপ।" (পৃ-৪১)

এই পাপের তত্ত্ব সোহারাব হোসেনের বিভিন্ন ছোটোগল্প ঘুরে ফিরেই আসে। 'ময়দানব' গল্পে যেমন হেকমতের মৃত্যুর পর একযুগ কেটে যাবার পর মাওলাবক্সের আবার দানো নিধানের জন্যে তোড়জোড় শুরু করাকে অনেকে আশঙ্কার চোখেই দেখে। নিয়তির দোহাই

পেড়ে কেউ কেউ তখন বলে—"বুইলে বাপের পাপে ছেলেডাও যাবে।" (পৃ-১০১)। আবার 'রাজকাহিনীর মতো রূপক গল্পে যখন সূর্য ওঠার জন্যে প্রচুর বিলম্ব হয়—তখন দেশবুড়োরা বলে অমঙ্গলের কথা, বলে পাপের কথা—"পাপ! ভয়ানক পাপ!—রাজার পাপ! তার রক্তের পাপ।—রাজার সঙ্গে শয়তানের দানা-পাত্তি-ছক্কা-পাঞ্জার বোঝাপড়ার পাপ!"(পৃ-১১১)

'না-মানুষী তিনদিন' গল্পে সরম আলি যখন বাদশা আমগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে চোখ বুজে ঘন্টার পর ঘন্টা নিথর হয়ে থাকে, তখন গাঁয়ের মানুষজন পুবপাড়ার নামাজী মুছুল্লি কেরাছতুল্লোর কাছে এর কারণ জানতে সমবেত হয়। কেরাছতুল্লো আর কোনো ব্যাখ্যা না পেয়ে বলে দেয়—"ও পাপের বিহিত করার জন্যি আমোলে বোয়েছে।" (পৃ-১৯৯)

কিন্তু সবাই তখন জানতে চায় পাপ কিসের? তখন কেরাছতুল্লো তার বিশদ বিবরণ দেয় বা বলা ভালো কেরাছতুল্লোর মুখ দিয়ে লেখকই সমাজের নানান অনাচারকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন—"পাপ তো মেলাই। ধর, গত সপ্তায় ছরিকুল এই বাগানের গাছথে পড়ে অপঘাতে ম'ল। তার আগে ধর, ভোট-লে দলাদলি করে কংরেস-ছি.পি.এনের জোড়া লাস পোড়লো। তার ফেরে মেম্বার ভা'র একচোখে বিচারির জন্যি জেলা-ব্যভিচার করেও ও পাড়ার দাঁড়সটা রেহাই পালে।—এ সপ পাপ না? খোদা সয় এ সপ?" (পৃ-১৯৯)

এছাড়াও সমাজের গলা অসঙ্গতি, ক্ষমতাশালীর শোষণ ভীতিপ্রদর্শন, সরকার পক্ষের দুর্নীতি, রাজশক্তির ঔদাসীন্য—বিচিত্র ধরনের পাপাচারের ছবি এঁকেছেন সোহারাব তাঁর বিভিন্ন গল্পে। 'কবির লড়াই' গল্পে দেখি রাজা শুনতে চান নগ্ন নারীদেহের বর্ণনা—তার ওপরেই নির্ভর করে কাকে তিনি দেবেন খেতাব—কাকেই বা রাখবেন সভাকবির পদে। 'রাজকাহিনী' গল্পে দেখা যায় —"গত একসপ্তাহে আঁধার মানিকপুর থেকে সাতজন মহিলাকে কে বা কারা ঘন কালো অন্ধকারে তুলে নিয়ে গেছে। পরে অপহৃত মহিলারা ফিরে আসছে বটে, তবে প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে নয়—লাস হয়ে।" (পৃ-১১২)। এই অপহৃত হয়ে খুন হওয়া মহিলাদের মধ্যে আছে সদ্য কিশোরী থেকে সুন্দরী যুবতী এমনকি চল্লিশোর্ধ গৃহবধূও।

'রাজেশ নামে বালকের গল্প—এক অথবা এক অমর সন্তানের গল্প'—রচনাতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টাই হলো—পুরুলিয়ায় পাঁচজন আদিবাসী গৃহবধূর গণধর্ষণ—যার মধ্যে একজন ছিলেন গর্ভবতী। এই ঘটনায় বিধানসভায় তোলপাড় হয়—এক বিধায়ক অধিবেশন কক্ষেই হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেন। পরে জানা যায়, ঐ বিধায়ক এক বিখ্যাত ধর্মগুরুর শিষ্য—আবার পুরুলিয়ার ধর্ষিতারাও ঐ ধর্মগুরুই শিষ্য। বিধায়ক কেঁদেছেন, কেননা তিনি মনে করেছেন যে ঐ ধর্ষণ আসলে ঐ ধর্মগুরুকেই অপমান করা এইভাবে। ঐ গল্পে এক তরুণ গবেষকের দেখাও আমরা পাই—দেশীয় সমাজনীতি নিয়ে গবেষণা করা ঐ গবেষকের গবেষণার কেন্দ্রিয় বিষয়বস্তু—"ধর্ষণ সময়ে ধর্ষিতা নারী যে যৌনসুখ পায় তার মাত্রা নির্ণয় করা।" (পৃ-৬৭) যুবতী, কিশোরী, শিশু, বৃদ্ধা, বিবাহিত, অবিবাহিতা ছোটোলোক, ভদ্রলোক, ধনী, গরীব—এইরকম নানা শ্রেণীর মহিলারা তুলনামূলকভাবে কত কত পরিমাপে সুখ



পায়—তার ভিত্তিতে এক সন্দর্ভ রচনা কাজে নিমগ্ন সে। তার গবেষণা অনুযায়ী—"দরিদ্র-নীচবংশীয়া কোনো নারী-ধর্ষণকালে শতকরা একান্নভাগ সুখ পায় আর উনপঞ্চাশ ভাগ কষ্ট পায়।" (পৃ-৭৩) মহামানা বিচারকও এই রায় রায় দেন যে, 'ধর্ষণ জনিত এই মামলা আদালত ডিসমিস করছে। এই মর্মে আমি অভিযুক্তদের মুক্তি দিচ্ছি যে, ধর্ষনের এবং এই গবেষকের বহুখ্যাত এই চার্ট দেখে মহামান্য বিচারকও এই রায় দেন যে, "ধর্ষণজনিত এই মামলা আদালত ডিসমিস করছে। এই মর্মে আমি অভিযুক্তদের মুক্তি দিচ্ছি যে, ধর্ষনের সময়ে ধর্ষিতরা যত শতাংশ কষ্ট পেয়েছেন, সুখ পেয়েছে তার থেকে সামান্য বেশি। ফলে এই ধর্ষণের মামলা ধোপে টেঁকে না।' (পৃ-৭২)

'আয়না-বায়না কিংবা রাজান্বেষন কথা' গল্পে এই দেহ সম্ভোগের কথা আরো স্পষ্টভাবে ও খোলাখুলিভাবে এসেছে। চল্লিশ বছরের নারী আর তার চোদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে এখানে একই সাথে দেহব্যবসায় যুক্ত হতে বাধ্য হয়। অথচ দেশের সরকার সুস্বাস্থ্য আর পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বক্তৃতার জন্যে মঞ্চ নির্মাণ করান—যে মঞ্চ উচ্চতায় হয় পঁচিশ ফুট—কেননা, কলকাতার মাটির কাছাকাছি বাতাস খুবই বিষাক্ত আর ঝাঁঝালো। আর যেহেতু, "ফুটপাথ—নির্ভর দোকানদার, হকার ও ফেরিওলা আর ঝুপড়িবাসীরাই কলকাতাকে বিষাক্ত করে তুলছে। তাই কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে—শহর পরিষ্কার রাখুন।" (পৃ-৮১) ফুটপাথের ঝুপড়ি উচ্ছেদের পক্ষে বড় সরকার আরো বলেন—"সামান্য একচিলতে ঘরে মা-বাবা, ছেলে-বউ, সোমথ ছেলে, সোমথ মেয়ে, নাবালক ছেলেমেয়ে একাকার হয়ে শোয়।————এভাবে সবার সামনে রাত্রির ব্যাপার-স্যাপার করলে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যৌন বিকৃতির পথে চলে যাবে।' (পৃ-৮২) অথচ গোপন স্বার্থ-সন্দর্ভতে দেখা যাচ্ছে—এই ঝুপড়িবাসী মহিলাদের দেহ কিভাবে দেশের আমীর-ওমরাহদের দেহজ আরাম-আয়েশের কাজে ব্যবহৃত হয়।

'দ্বীপির নামডা রাজলগর'—এক—দুই—তিন—পর্বে লেখা আসলে একটি বড়ো গল্পেরই প্রলম্বিত অংশ। "দ্বীপির নামডা রাজলগর। তার রাজা আমি হই অঘোর।"—এই বাক্যটি ধ্রুবপদের মতো বারবার এই কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। নামেই অঘোর রাজা। আসলে তার আবাস 'খিদেপুরীর মধ্যিখানে'। দ্বীপে পিকনিক করতে আসা মানুষজনকে কাদা ঠেলে কখনো কাঁধে করে নৌকা থেকে নামানো, তাদের হাজার ফরমাস শোনা, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া এমনকি এঁটো বাসনপত্র মেজে দেওয়া—সবটাই অঘোরের কাজ। এইরকম কায়িক পরিশ্রম করে সে যতটুকু রোজগার করে রামেশ্বরপুর থেকে নৌকা করে এসে তার ছেলে হাকিমালি প্রায় সবটাই নিয়ে যেতে চায়। কখনো নেতা-গিন্নী এই দ্বীপে এলে থলথলে চেহারার সেই গিন্নীকে নিজের কাঁধে করে বইতেও হয় অঘোরকে। অঘোর হাঁপায়—তবেই মধ্যে নিজের দরখাস্ত করা লোনটার কথা একবার তোলার চেষ্টা করে —কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। অঘোর আরবদেশে চলে যতে চায়, যে দেশে খেজুর গাছ থেকে রস বের করার জন্যেও সরকারে মাইনে দিয়ে পাকা চাকরিতে বহাল করে। ইছামতীতে ঘুরতে

ঘুরতে বাংলাদেশের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে আরেক অঘোরের মুখোমুখি হন—যে নামেও অঘোর আবার যাকে দেখতেও একেবারে অঘোরেরই মতো। বোঝা যায় এইরকম প্রান্তিক মানুষ সবদেশে সবকালেই আছে—অথবা এইরকম মানুষগুলির কোনো দেশ-কালই নেই।

তবে রাজনগর কাহিনীত্রয়ীকে তৃতীয় খণ্ডে অঘোরের খাওয়ার একটা চিত্র তুলে ধরছেন সোহারাব। বর্ণনার ও চিত্রকল্পে যা লেখক হিসেবে তাঁর অসাধারণ শক্তিমত্তার পরিচয়বাহী—"অঘোরের তখন ভাতের দিকে নজর। ফোলা ফোলা রামেশ্বরপুরের রাজরানির দেহের মতো এলানো ভাতের শরীর। সে শরীরে পাতলা মুসুর ডালের বাসন্তীরঙা শাড়ি। সে শরীরের সন্ধিস্থানগুলোতে চিংড়ি, বেগুন আর গুড়ি কচুর ঝুমকো অলঙ্কার। অঘোর যৌবন বয়সের মতো পিপাসু হয়। মুখ দিয়ে চুমু খেতে খেতে সে ভাতের শরীরগুলোর সাথে মিথুনে মাতে। একমনে।" (পৃ-২২০)।—এই ছবি পাঠকের মন থেকে সহজে মুছে যাবার নয়।

আর একটি প্রতীক অনেকগুলি গল্পেই ব্যবহার করেছেন সোহারাব—সেটি হলো আকাশের কালপুরুষ বা আদোম ছুরোতের প্রতীক। রাসেক মাষ্টারের কথার প্রতিধ্বনি করে হেকমত তার ছেলেকে শোনায় সে বক্তৃতার অংশ—'আকাশের আদোম ছুরোতের মতোন শক্ত হোতি হবে। তার মতোন কোমরে তরোয়াল রাখতি হবে ! পার কাছে রাখতি হবে বাঘা কুকুরডারেও।" (পৃ-৯৮) আকাশের দিকে তাকিয়ে সে তার ছেলেকে আদমছুরোতা চেনানোর চেষ্টা করে। আদম ছুরোত হেকমতের কাছে হয়ে ওঠে নির্ভীকতার প্রতীক। ঐ গল্পেই আততায়ীদের কাছেও তাদের টার্গেট রাসেক মাষ্টারকেও কাকতালীয়ভাবে তারা অদমছুরোতের নামেও সংকেতিক করে। বলে, 'আদম ছুরোতের বাড়ি শিকারী কুকুর গেছে ছার। এক সপ্তার মধ্যিই পটল ক্ষেত ছাপা হোয়ে যাবে।' (পৃ-৯৯)। আবার যখন হঠাৎ-ই তারা হেকমতকে দেখে ফেলে, তখন একজন যখন তার পরিচয় জানতে চায়—তখন চুপিচুপি আততায়ী দলেরই একজন হেকমতের পরিচয় দেয়—"আদম ছুরোতের পা'র কাছে বসে থাকা বাঘা কুকুরখানা ছার।" (পৃ-১০০)

'দ্বীপির নামডা রাজলগর—দুই'—কাহিনীতেও অঘোর আলি যখন আতান্তরে পড়ে—পার্টির মেম্বার কিভাবে রাজলগর দ্বীপির জলকরের মালিক হয়—সেটা বুঝতে পারেন না—তখন সেও মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে—"ছোটবেলার ভূগোলে পড়া কালপুরুষটাকে খোঁজে। তন্ন তন্ন করে খোঁজে সারাটা আকাশ। পায় না। তবুও খুঁজতে থাকে অঘোর। কালপুরুষ খোঁজে। কালপুরুষের পায়ের কাছে যে শিকারী কুকুর থাকে তাকে খোঁজে। পায় না। পায় না।" (পৃ-২১০) ঐ কাহিনির শেষেই বিপন্ন অঘোরাকে নিয়ে যখন রাঁধুনি-চাপরাশিরা মজা করে---তখনও তাদের বিদ্রুপ অঘোরকে স্পর্শ করে না। অঘোর আকাশে খোঁজে—"কালপুরুষডা গেল কমনে? শালা এত্ত বড় আকাশডায় তারে খোঁজবো কমনে? কিন্তু কালপুরুষডারে তো খুজে পাতিই হবে। না'লি তার শিকারী কুকুরখানা। তা না হলিও



চলবে। নিদেল পক্ষি তারা দে তোয়ের করা একখান বাঘ-ভালুক। তা না হলি একখান ছাগল-বিরেল।"—বেঁচে থাকার একান্ত অবলম্বন।

সোহারাব তাঁর 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা' গল্পে দেখান যে, শুধু রাজা-সরকার-মন্ত্রী-আমলা-পার্টির নেতা বা মেম্বাররাই নয়। টিভি কোম্পানীর বিশেষ চ্যানেলের বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞাপন কিভাবে ছড়িয়ে দিতে চায় ভোগবাদের বিষ—নষ্ট করতে চায় মানুষের মনের শান্তিকে। প্রেমহরি বুঝতে পারে এই প্রলোভন যেমন করে তার মেমসাহেবকে খেয়েছে, মেমসাহেবের বাচ্চাহাতি ছেলেকে খেয়েছে তেমনি করে তার বৌ সজনীকেও খেতে আসছে। ধড়মড় করে উঠে পড়ে প্রেমহরি। তারপর "ঘরের কোণে রাখা ঝ্যাঁটাটা খোঁজে। পায় না। পরিবর্তে পায় বিছানা ঝাড়া ফুলঝাড়ু। প্রেমহরি তাই দিয়ে ঝ্যাঁটাতে থাকে—'যা, যা, বিদেয় হ'!"(পৃ-১০)

ঠিক এর বিপরীতমুখী একটি ঘটনায় চোরাকারবারি ছাবেরালি রাস্তায় সাইকেল নিয়ে পড়ে গেলে তার পরিচিত জীবনআলি একটা দেশলাই কাঠি জ্বালায়—তখন হঠাৎ 'খরিস-ক্ষিপ্রতায়' ছাবেরালি তার হাত থেকে জ্বলন্ত কাঠিটাকে মাটিতে ফেলে দেয়। পাথরের রাস্তায় তবুও সেটা জলতে থাকে। শেষে, "তার যে পায়ে জুতো ছিল সেটা দিয়ে পিষ্টে মেরে দেয় আলোটাকে।" (পৃ-১৫৮)। জুতো দিয়ে আলোকে পিষ্টে মারার এই ছবিটা সত্যিই অভিনব।

কিন্তু আলোর পিষ্ট হবার ছবিতেই নয়—শেষপর্যন্ত মনুষ্যত্বের পুনরুজ্জীবনেই অবস্থা রাখেন সোহারাব। তাঁর 'ময়দানব' গল্পে নতুন যুগের ছেলে ছোকরারা তাই বলে, 'সে তোংগা যুগ শেষ। এখোন আংগা যুগ। ওসপ দানো মানো বুঝিনে। যা সামনে পাবো সপ সেবড়ে দোবো। মাওলা ভাই একখান কাজের কাজ করছে।" (পৃ-৯৪) 'না-পুরুষ' গল্পের শেষের দেখি না-পুরুষ সতীশ শেষ পর্যন্ত নিজেকে সামলে নেয়। কুনাই-এর বউটির হাত ধরে সে বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। বলে—"শালা তোমারে বিসর্জন দিতি চায়। চাকগে। তুমি সাধুর কথায় কান দিয়ো না। ঘর ছেড়ো না কখ্খোনো বুইলে? ঘরলক্ষ্মী সীতারে ঘরেই মানায়, বুইলে?" (পৃ-১৮৯)। এই শুভবোধেই যেন ময়দানব গল্পের মাওলা "তখন বাপের মুখে যেন আলাল-নবীর জেল্লা—জাকাতের ছাটরা-ছররা পেত।" (পৃ-৯৫)

এইভাবেই ভালো-মন্দেতে, বিষে-অমৃতে, ভোগবাদ আর বৈরাগ্যের পাশাপাশি বুননের অসংখ্য নারী-পুরুষের ছবি তুলে ধরেন তাঁর 'বায়ু তরঙ্গের বাজনা' সংকলনে লেখক। পরিস্থিতির জ্ঞানে কখনো তারা নিষ্পেষিত হয়, কখনো পরিস্থিতিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে নিজের অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। জীবনের বহুমুখী গতিকে অবলম্বন করে ঐতিহ্য ও প্রলোভন-প্রবৃত্তি ও প্রগতিকে দুই প্রান্তে রেখে তাদের মধ্যের টানাপোড়েন আঁকার সাহস দেখান তিনি। তাঁর উপমা, চিত্রকল্প মাটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়ানো—যেমন তাঁর গল্পের ভাষাও অননুকরণীয় এবং একান্তভাবে মৃত্তিকাগন্ধী। উত্তর চব্বিশ পরগণার প্রান্তিক মানুষের মুখের ভাষা যেন নবপ্রাণের সঞ্চার করেছে তাঁর লেখনীতে। মেহনতী মানুষের

সংগ্রামে তিনি আস্থাশীল আবার অনায়াস ক্ষমতা সম্ভোগের অমানবিকরূপ সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। লোক বিশ্বাস বা লোককথাকে নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহারে তিনি সিদ্ধহস্ত কিন্তু সময়মতো তাদের বিরুদ্ধতাতেও তিনি ক্লান্তিহীন। এবং সর্বোপরি তাঁর বিশিষ্ট কথনশৈলি—প্রচলিত শব্দাবলী, ধর্মসজ্ঞাত সংস্কার-বিশ্বাস—তাঁর নিজস্ব কথন ভঙ্গিমায় এক বিশেষ মাত্রা পায়। এইভাবেই গড়ে ওঠে তাঁর গল্পের এক নিজস্ব আবহ—তাঁর কাহিনীর প্রতিবেশী চরিত্র আর কাহিনী যেন এই আবহেরই নিজস্ব নির্মাণ।

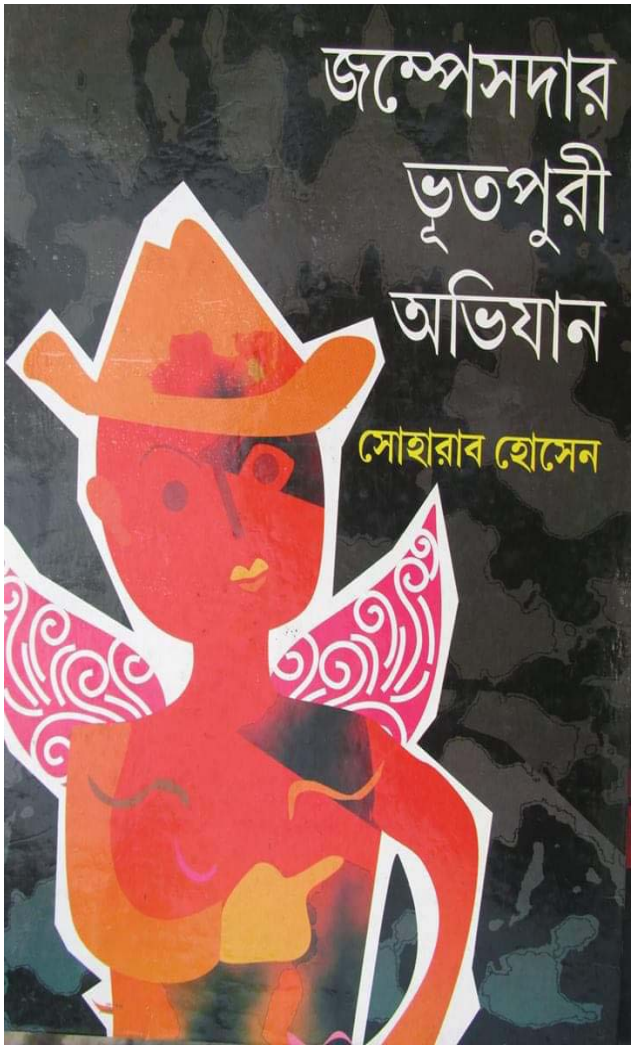




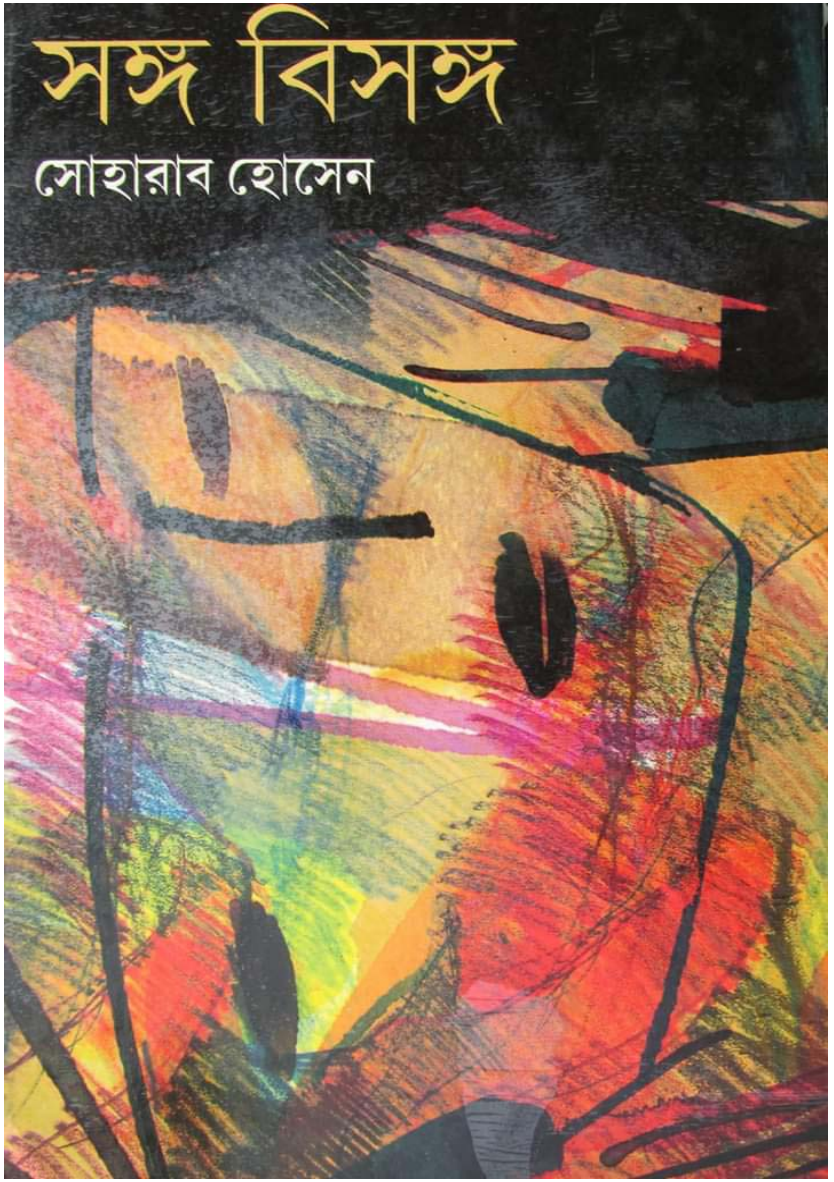

তৌ সি ফ আ হ মে দ

## সোহারাব হোসেন : জীবনপঞ্জি

১৯৬৬ ২৫ নভেম্বর, উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার নদিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-রুস্তম আলি সরদার। মাতা-আমেনা বিবি। শৈশব থেকে যৌবন অতিবাহিত হয় গ্রামে। গ্রাম: সাংবেড়িয়া, থানা: বসিরহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।

১৯৭১ প্রথমে অন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও পরে চক খামারপাড়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা শুরু।

১৯৭৫ চতুর্থ শ্রেণির সেন্টার পরীক্ষায় বসিরহাট মহকুমার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার এবং রাজ্যপালের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ।

১৯৮২ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ।

১৯৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। 'গাঙ' নামের সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা।

১৯৮৭ প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'রক্ত দেহে অন্যস্বর' প্রকাশিত।

১৯৮৮ বসিরহাট কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সাম্মানিক স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা সাহিতের স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি। দৈনিক বর্তমান পত্রিকায় কাজে যোগদান করেন।

১৯৮৯ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি তে প্রথম স্থান অধিকার।

১৯৯০ গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ।

১৯৯১ আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে বসিরহাট কলেজের বাংলা বিভাগে যোগদান।

১৯৯৩ আগস্ট মাসে ধান্যকুড়িয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থায়ী শিক্ষক হিসাবে যোগদান।

১৯৯৪ মুনিয়া বারির সঙ্গে বিবাহ।

১৯৯৬ পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক হিসাবে কলকাতার আনন্দমোহন কলেজে যোগদান। প্রথম গল্প সংকলন দোজখের ফেরেশতা প্রকাশ। পুত্র সোহম হোসেনের জন্ম। প্রথম উপন্যাস 'একটা রূপকথার বিবরণ' অথবা 'কেয়ামতের দরবেশ হবার' কাহিনী প্রকাশ।

১৯৯৭ হরেন্দ্র নাথ সাহা স্মৃতি দিবারাত্রির কাব্য পুরস্কার প্রাপ্তি।

১৯৯৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্য জীবন : ১৯০১—১৯৯০' বিষয়ে পি এইচডি ডিগ্রি লাভ।

২০০২ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এর সিলেবাস কমিটির প্রধান নির্বাচন।

২০০৬ পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতির পদ গ্রহণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সদস্য নির্বাচন। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সদস্য নির্বাচন।

২০০৭ আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন।

২০১১ ১ জানুয়ারি তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এর সভাপতির দায়িত্ব ত্যাগ।

২০১৪ ২৩ ফেব্রুয়ারি পিতা রুস্তম আলীর পরলোকগমন।

২০১৬ ১১ নভেম্বর তারিখে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত আঘাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে Institute of Nuro Science Kolkata তে ভর্তি হন।

২০১৭ জানুয়ারি মাসে সাময়িক ভাবে সুস্থ অবস্থায় গৃহে ফিরে আসা। আগস্ট মাসের ৫ তারিখে মায়ের মৃত্যু হয়।

২০১৮ ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আর এন টেগোর হাসপাতালে ভর্তি হন। মার্চ মাসের ২ তারিখ সন্ধ্যায় পরলোক গমন করেন।

**পুরস্কার প্রাপ্তি :**

**১৯৯৭ 'হরেন্দ্রনাথ সাহা স্মৃতি' দিবারাত্রির কাব্য পুরস্কার।**

**১৯৯৯ 'সোমেন চন্দ স্মারক' পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কার।**

**২০০০ সর্বভারতীয় 'কথা' পুরস্কার।**

**২০০০ নজরুল সাহিত্য সদ্‌ভাবনা পুরস্কার।**

**২০০৩ 'অন্তর্বীজ' সাহিত্য পুরস্কার।**

**২০০৩ 'ভাষা শহিদ বরকত' স্মরণ পুরস্কার।**

**২০০৪ 'আলোক' পুরস্কার।**

**২০০৫ 'প্যারীচরণ সরকার' পুরস্কার।**

**২০০৮ 'শিস্' পুরস্কার।**

**২০০৮ ইলা চন্দ স্মৃতি সাহিত্য পরিষদ' পুরস্কার।**

**২০০৯ 'নতুন গতি' পুরস্কার।**

**২০০৯ 'সিরাজুল হক স্মৃতি সাধনা' পুরস্কার ও স্বর্ণপদক।**

**২০০৯ 'মীর মশাররফ হোসেন' সত্যের দিশারী পুরস্কার।**

**? 'আল্লামা রুহুল আমিন (র)' স্মৃতি পুরস্কার।**

**২০১০ আব্দুল জব্বার স্মৃতি বাল্মিকী পুরস্কার।**



D/Saharab Hossan Sahitya Angn February 20119/80

# সোহারাব হোসেনের গ্রন্থপঞ্জি

## কবিতা

**'রক্তদেহে অন্যস্বর'** (১৯৮৭)। অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

**'বৃষ্টির নামতা'** (১৯৮৮)। অন্যান্য তথ্য পাওয়া যায়নি।

**'কবিতা সংগ্রহ'** প্রকাশক : সুনীতা বিশ্বাস। ছোঁয়া, ২৭/১৭/১বি, শেওড়াফুলি, হুগলি ৭১২ ২২৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর ২০১৩। মূল্য : ২৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৬। প্রচ্ছদ : শোভন পাত্র। স্বত্ব : সোহম হোসেন। ISBN : 978-82879-24-4 উৎসর্গ : 'কবিতা লেখার দিনগুলিতে যারা ছিল তুমুল কাব্যসহচর—শৈলেন-শ্যামল-মিহির-স্বপন (কাজী হাসানুর)-রাম (শুভঙ্কর)-বাবলি ও নজরুল ভাইকে।'

* (সংকলন : ১. রক্তদেহে অন্যস্বর, ২. বৃষ্টির নামতা ও অগ্রন্থিত কবিতা)

## শিশু-কিশোর সাহিত্য

**'কল্পতরু-গল্পতরু'** প্রকাশক : শ্যামল ভট্টাচার্য। শ্যামল বুক স্টল, ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, (টেমার লেন), কলকাতা-৭০০ ০০৯। পরিবেশক : পত্রলেখা, ৯/২ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা, ২০০৩। মূল্য : ৩০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৩৯। প্রচ্ছদ : ওঙ্কার গুপ্ত। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। উৎসর্গ : 'সোহম ও তিতলিকে'।

**'রূপকথার পুতুল'** প্রকাশক : নির্মল কুমার সাহা। নির্মল বুক এজেন্সি, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৮। মূল্য : ৩০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৪০। উৎসর্গ : 'তোর্ষা রিসা তিন্নি ও তিথি-কে'।

**'ভূতপিসের ডাক'** প্রকাশক : নির্মল কুমারসাহা। নির্মল বুক এজেন্সি, ১৮ বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা পুস্তকমেলা, ২০০৯। মূল্য : ৩০.০০টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৬। উৎসর্গ : 'কৌশিক মিশ্র ও চন্দ্রিমা মিশ্র' কে।

**'ফটিক বারি যাচে রে'** প্রকাশক : সন্দীপ নায়ক। পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী ২০১০। মূল্য : ৫০.০০টাকা। পৃষ্ঠা : ৪৬। ISBN : 978-81-7662-606-6. উৎসর্গ : 'প্রিয় স্বজন রুদ্রপ্রসাদ পাল -কে'।



**'জম্পেশদার ভূতপুরী অভিযান'** প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭। মূল্য : ৩০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৩১। স্বত্ব : সর্বসবত্ব সংরক্ষিত। প্রচ্ছদ : দেবাশিস সাহা। ISBN :978-81-295-1132-4. উৎসর্গ : 'আদরের পুপুকে'।

**'গুঁফোবুড়োর কান্না'** প্রকাশক : দেবজ্যোতি দত্ত। শিশুসাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১১। মূল্য : ৪০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৪৮। স্বত্ব : পাঠ্যবস্তু—মুনিয়া বারী, প্রচ্ছদ ও অলংকরণ—প্রকাশক। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত মাজী। ISBN :978-81-7955-155-4. উৎসর্গ : 'যার ছেলেবেলায় গুঁফোবুড়োকে নিয়ে গল্প ফাঁদতাম—পুত্র সোহমকে'।

## সম্পাদিত গ্রন্থ

**'পথের পাঁচলি'** সম্পাদনা ও ভূমিকা : সোহারাব হোসেন। প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ---আগস্ট ২০১১; পুনর্মুদ্রণ—জানুয়ারি ২০১৪। মূল্য : ১০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২০৮। প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত। ISBN : 778-81-8437-121-5.

**'বিষাদ সিন্ধু'** সম্পাদনা ও ভূমিকা : সোহারাব হোসেন। প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮। মূল্য : ২৫০.০০। পৃষ্ঠা : ৪৬২। প্রচ্ছদ : রচিষ্ণু সান্যাল। ISBN : 978-81-295-1416-5.

**'অশনি সংকেত'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১২। মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৬। প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল দত্ত। ISBN : 978-81-8437-1413-3.

**'জমিদার দর্পণ'** * (Paper back)। সম্পাদনা ও ভূমিকা : সোহারাব হোসেন। প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ২০১৫, অগ্রহায়ণ ১৪২২। মূল্য : ১০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৯৫। পৃষ্ঠা : ৯৫। প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত। ISBN : 778-81-8437-121-5.

*['জমিদার দর্পণ'—মীর মশার্‌রফ হোসেন কর্তৃক প্রণীত, ১৯২৯ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত।]

## গল্প

**'দোজখের ফেরেশতা'** *(ক) প্রকাশক : সুমন চট্টোপাধ্যায়। রত্নাবলী, ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬; প্রথম রত্নাবলী সংস্করণ—১ জানুয়ারি ২০০০। মূল্য : ৪৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১২৮। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। প্রচ্ছদ : রাজু দেবনাথ। উৎসর্গ : 'পশ্চিমবঙ্গের, ভারতের, পৃথিবীর দাঙ্গাবিরোধী মানুষকে।'

* ২০০২ সালে সোমেন চন্দ স্মারক বাংলা আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত।

(খ) প্রকাশক : আবুল বাসার ফিরোজ। ধ্রুবপদ, রুমী মার্কেট, ৬৮ক্ষ্ম৬৯ প্যারীদাস রোড, ঢাকা ১১০০। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—বিজয় দিবস ২০১৫। মূল্য : ৩৯২.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২২৪। প্রচ্ছদ : রিও। স্বত্ব : ২০১৫ সোহারাব হোসেন। উৎসর্গ : 'বাংলাদেশের পাঠকদের উদ্দেশে'। ISBN : 978-984-91368-3-5.

**'বায়ু তরঙ্গের বাজনা'** প্রকাশক : সেখ সালাউদ্দিন। জি. জে. বুক সোসাইটি, ১০৪ মহাত্মা গান্ধীরোড, কলকাতা- ৭০০ ০০৭। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ২০০২। মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২৩১। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। উৎসর্গ : 'প্রিয় মানুষ বাবুয়া, অনুপ, নীলু, কৌশিক, কাঞ্চনকে'। ISBN : 81-88041-01-7.

**'আয়না যুদ্ধ'** ভূমিকা : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ২০০৫। মূল্য : ২০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৩১২। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। উৎসর্গ : 'মানুষ হবার পাঠ নিরন্তর যাঁর কাছে পাই/ আমার গুরুজন ড. মানস মজুমদার শ্রদ্ধাভাজনেষু'।

**'সাহিত্যের সেরা গল্প'** প্রকাশক : শংকর মণ্ডল। দীপ প্রকাশন, ২০০৯—এ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ২০০৭। মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৫৩। প্রচ্ছদ : অনুপ রায়। উৎসর্গ : 'বামাচরণ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাভাজনেষু'।

**'বোবাযুদ্ধ'** প্রকাশক : গোপা ঘোষ। অভিযান পাবলিশার্স, বনমালীপুর, বারাসাত,



কলকাতা-৭০০ ১২৪। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—ফেব্রুয়ারি ২০০৮। মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৪০। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। প্রচ্ছদ : পুষ্পল ভট্টাচার্য। উৎসর্গ : 'সুহৃদ সুকান্তি দত্তকে'। ISBN : 978-81-906088-00-0-0.

**'আমার সময় আমার গল্প'** প্রকাশক : সন্দীপ নায়ক। পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১০। সংস্করণ : প্রথম—বইমেলা ২০০৮। মূল্য : ১০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২৪০। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। উৎসর্গ : 'আমার আপন জন সুভাষদা (ডা. সুভাষ হালদার) ও শিখা বৌদি (ডা. শিখা হালদার)-কে'। ISBN : 978-81-7332-508-3.

**'সুখ সন্ধানে যাও'** প্রকাশক : এম. আর. মল্লিক ও এইচ. আর. মল্লিক। লেখা প্রকাশনী, ৫৭ ডি. কলেজ স্ট্রট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ২০০৯। মূল্য : ৬৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৬। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। প্রচ্ছদ : রিমা আলম। উৎসর্গ : 'শরদিন্দু সাহা প্রিয় বন্ধুকে'।

**'শ্রেষ্ঠ গল্প'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ২০১০। মূল্য : ১৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২৭২। প্রচ্ছদ : স্বত্ব : সোহম হোসেন। উৎসর্গ : 'বিশিষ্ট্য সমাজ দরদী মোস্তাক হোসেন শ্রদ্ধাভাজনেষু'।

**'নির্বাচিত গল্প'** (Paper back)। প্রকাশক : পারমিতা দাশগুপ্ত। নীললোহিত প্রকাশনী, ১৫, কাজী নজরুল ইসলাম সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০১১, মাঘ ১৪১৭। মূল্য : ৬০.০০টাকা। পৃষ্ঠা : ৮০। প্রচ্ছদ : সদীপ দাস। উৎসর্গ : 'অনুজপ্রতিম তাপস কুমার লায়েক প্রীতিভাজনেষু।'

**'ভেজা তুলোর নৌকা'** (সাতটি ট্রিলজি-গল্পের সংকলন)। প্রকাশক : মারুফ হোসেন। অভিযান পাবলিশার্স, ১০/২এ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১৭। মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৩২০। 'স্বত্ব : সোহম হোসেন। প্রচ্ছদ : পার্থপ্রতিম দাস। উৎসর্গ : 'স্নেহাংশু মোস্তাক (অধ্যাপক মোস্তাক আহবেদ) ও মধুবন্তী (অধ্যাপিকা মধুবন্তী সোম) কে'।

## উপন্যাস

**'মহারণ'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ২০০৩; দ্বিতীয় সংস্করণ—১লা বৈশাখ ১৪১৭। মূল্য ঃ ২০০.০০টাকা। পৃষ্ঠা : ৪১৬। স্বত্ব : মুনিয়া বারী/প্রচ্ছদ; যুধাজিৎ সেনগুপ্ত। উৎসর্গ : 'সাধন চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাভাজনেষু।' ISBN :81-8437-060-1.
কৃতজ্ঞতা : ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (নিখিল সুর), ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (সুপ্রকাশ রায়), বাংলা দেহতত্ত্বের গান (সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত), বস্তুবাদী বাউল (শক্তিনাথ ঝাঁ), দৈনিক প্রতিদন—এ প্রকাশিত 'বিক্ষোভের উৎস সন্ধানে' শীর্ষক নিবন্ধাবলি (আজিজুল হক) আর মহম্মদ আলি ফকির, মুনছুর ফকির, বাদশা ফকির।

**'মাঠ জাদু জানে'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর ২০০৪। মূল্য : ৭৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৯১। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। প্রচ্ছদ : দেবাশীষ রায়। উৎসর্গ : 'আখ্যানের বড়-মেম্বার চরিত্র যাঁর আদলে নির্মিত সেই এমদাদুল হক শ্রদ্ধাভাজনেষু'।

**'সরম আলির ভুবন'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনি, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ২০০৪। মূল্য : ২৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৫৪০। প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি। উৎসর্গ : 'প্রিয় স্বজন—আলমগীর রহমান, এম. আলাউদ্দিন খান, মেহেদি হাসান, আনসারুল লস্কর, আব্দুল হোসেন মোল্লা, বাকিবিল্লাহ, সফিক আহমেদ ও কালাম মোল্লা-কে'।

**'সহবাস পরবাস'** (দুটি উপন্যাস—১. সহবাস পরবাস, ২. জন্মজুয়া)। প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমারলেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ২০০৭। মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১১২। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। প্রচ্ছদ : দেবাশীষ রায়। উৎসর্গ : 'তৈরী হওয়ার দিনগুলিতে যাঁকে পেয়েছি অভিভাবকের মতো—প্রিয় স্বজন প্রশান্ত দে-কে'। ISBN : 81-8437-007-5.

**'রাজার অসুখ'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমারলেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ২০০৮। মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১০৪। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। প্রচ্ছদ : ইব্নে আলি মাহমুদ। উৎসর্গ : 'ডাক্তারবাবু—শ্রীযুক্ত উৎপল সেনগুপ্ত শ্রদ্ধাভাজনেষু'।

'বদলি বসত'। প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্কর : প্রথম প্রকাশ — বইমেলা ২০০৯। মূল্য : ৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৮৮। প্রচ্ছদ : দেবাশীষ রায়। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। উৎসর্গ : 'কাছের মানুষ বাবুয়া ও কিম-কে'। ISBN : 978-81-8437-026-3.

**'সওকত আলির প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি'** প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশক—বইমেলা ২০০৯। মূল্য : ৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১০৪। প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনীল ঘোষ। উৎসর্গ : 'প্রিয় স্বজন বোরহান বুলবুল আর লিপি বুলবুল-কে'। ISBN : 978-81-7293-9489.

**'দহনবেলা'** প্রকাশক : সবিতেন্দ্রনাথ রায়। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লি, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ —জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৭। মূল্য : ১০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৬। স্বত্ব: সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রচ্ছধ : রঞ্জন দত্ত। উৎসর্গ : 'সুন্দরবনের ভূমিপুত্র স্বপন মণ্ডল, প্রিয় বন্ধুকে'। ISBN : 978-81-295-1119-5.

**'দ্বিতীয় দ্রৌপদী'** প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮। মূল্য : ৮০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৬। প্রচ্ছদ : দেবাশীষ রায়। স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। উৎসর্গ : 'প্রিয়জন সিরাজুল ইসলামকে'। ISBN : 978-81-295-1410-3.

**'সঙ্গ বিসঙ্গ'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমারলেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯
১ম খণ্ড : সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা বইমেলা ২০১২। মূল্য : ১০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৬। প্রচ্ছদ : দেবাশীষ রায়। স্বত্ব : সোহম হোসেন। উৎসর্গ : 'যে সব মানুষ যৌনতাকে উপাসনার স্তরে নিয়ে যায়'। ISBN : 978-81-84-37-142-0.
২য় খণ্ড : সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ ১৪২২। মূল্য

: ১০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৭৬। স্বত্ব : সোহম হোসেন। প্রচ্ছদ : প্রণব হাজরা। উৎসর্গ : 'কেবল স্বাধিকার নয়—যৌনতা যে সব মানুষের কাছে আত্ম-বিকাশের সমান্তরাল'। ISBN : 978-81-8437-283-0.

**'আরশি মানুষ'** প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ২০১৫, অগ্রহায়ণ ১৪২২। মূল্য : ৪০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৩৬০। প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত। স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। উৎসর্গ : 'দুই অগ্রজ অসিতদা (অসিত মিশ্র) ও শুভায়নদা (শুভায়ন বসু)-কে'। ISBN : 978-81-295-2426-3.

## প্রবন্ধ/আলোচনা

**'শরৎচন্দ্রের দেনাপাওনা'** প্রকাশক : সুমন চট্টোপাধ্যায়। রত্নাবলী, ১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ-পৌষ ১৪০৫, জানুয়ারি ১৯৯৯। মূল্য : ৭০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৬০। প্রচ্ছদ : তপন কর। স্বত্ব : মুনিয়া বারী (উপন্যাস অংশ বাদে)। উৎসর্গ : 'ছাত্রজীবনে যাঁরা কাছে আমার অপার ঋণ, আমার সেই শিক্ষক ড. অজয়কুমার ভট্টাচার্য শ্রদ্ধাস্পদেষু।'

**'বাংলা ছোটগল্পে ব্রাত্যজীবন'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ২০০৪। মূল্য : ২০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৪৭২। স্বত্ব : সোহম হোসেন। প্রচ্ছদ : গৌতম রায়। উৎসর্গ : 'মুনিয়া বারী— যার নিরন্তর উৎসাহে এ গবেষণাকর্ম সম্পূর্ণ হয়েছিল।'

**'শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ'** (ক) প্রকাশক : কল্যাণী ওঝা। কল্যাণী পাবলিকেশন, ১০ সারিয়াতুল্লা লেন, মানিকতলা, কলকাতা-৭০০ ০০৬। পরিবেশক : বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮ এম. জি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর ২০০৪। মূল্য : ৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ৬৬ + ৭২। প্রচ্ছদ : সিরাজুল ইসলাম। স্বত্ব : মুনিয়া বারী (উপন্যাস অংশবাদে)।

(খ) প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম করুণা সংস্করণ—বইমেলা ২০১৮। মূল্য : ১৮০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৯২। প্রচ্ছদ : কমল আইচ। ISBN : 978-81-8437-338-7.



**'ছোটগল্প পরিক্রমা'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—কলকাতা পুস্তকমেলা ২০০৫। মূল্য : ৭৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৯১। প্রচ্ছদ : কমল আইচ। উৎসর্গ : 'প্রিয় ক'জন ছাত্র—অপর্ণা, সায়খুল, সাইফুল, অরূপ, উত্তম, বরুণ, সৌচব, অঅরিফুল, তৌসিফ, নবনীতা, সাবিনা, সামাদ, ইস্তেখাব, আলিম, সাব্বির, সুব্রত, বিউটি, ইন্দ্রাণী, কৃষ্ণেন্দু, সঞ্চয়, সৌগত, বনি, আমিন, মিঠু, শঙ্কর, মলয়, কাকলি, সন্ধ্যা, ফারুক ও টনিকে'।

**'জনজাগরণের উপন্যাস অরণ্যের অধিকার'** (Paper back)। প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জুলাই ২০০৫, দ্বিতীয় মুদ্রণ—ডিসেম্বর ২০০৯, তৃতীয় মুদ্রণ—নভেম্বর ২০১৪। মূল্য : ৮০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৫২। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। উৎসর্গ : 'মহাবিদ্যালয় জীবনের দুই শিক্ষক শ্রীশ্যামল সারদার ও ড. শশাঙ্কশেখর মণ্ডল শ্রদ্ধাভাজনেষু'। ISBN : 978-81-8437-265-6.

**'প্রবন্ধ সমীক্ষা'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—অক্টোবর ২০০৬। মূল্য : ৬০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১৮৩। প্রচ্ছদ : প্রশান্ত মণ্ডল। স্বত্ব : মুনিয়া বারী। ISBN : 81-8437-000-8.

**'বাংলা ছোটগল্প : তত্ত্ব ও গতিপ্রকৃতি'** প্রকাশক : বামাচরণ মুখোপাধ্যায়। করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৯

১ম খণ্ড : সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—সেপ্টেম্বর ২০০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ২০১২। মূল্য : ৩৫০.০০টাকা। পৃষ্ঠা : ৩৩৪। প্রচ্ছদ : সমীরণ ভট্টাচার্য। স্বত্ব : সোহম হোসেন। উৎসর্গ : 'প্রিয় ক'জন ছাত্র-সাকির, মিজানুর, অতসী, তনুশ্রী, অনিন্দ্য, বিশ্বজিৎ, সুদীপা, তামিম, সোনালী, কেয়া, অনিন্দিতা, জয়ীতা, দিলরুবা, মোমতা চন্দনা, আসাদুজ্জামান, মিলন ও সাথীকে'। ISBN : 978-81-8437-046-1.

৩য় খণ্ড : সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—বইমেলা ২০১৪। মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা :৪০৮। প্রচ্ছদ : সমীরণ ভট্টাচার্য। স্বত্ব :

সোহম হোসেন। উৎসর্গ : 'মৈত্রেয়ী, জ্যোৎস্না, আরিফুল, মৃদুল, রাজীব ও করিমকে—যাদের সাহায্য ছাড়া গ্রন্থ প্রকাশিত হত না। ISBN : 978-81-8437-226-7.

**'বাংলা ছোটগল্পে বাস্তবতাবোধের বিবর্তন'**

প্রকাশক : মহঃ গিয়াসুদ্দিন খান। বুক স্পেস, ২২এ, কলেজ রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—আগষ্ট ২০১৪। মূল্য : ২৭৫.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২৩৯। প্রচ্ছদ : সোহম হোসেন। স্বত্ব : সোহম হোসেন। উৎসগ : 'অনুজপ্রতিম তিন অধ্যাপক—মীর রেজাউল করিম, আব্দুর রহিম গাজী ও লাইফুল্লাকে'। ISBN : 978-93-82251-119-4.

**'অলীক মানুষ উপন্যাসের অন্দর বাহির'**

প্রকাশ : সুধাংশুশেখর দে। দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ২০১৬, অগ্রহায়ণ ১৪২৩। মূল্য বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর ২০১৬, অগ্রহায়ণ ১৪২৩। মূল্য : ১৩০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ১২০। প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত। স্বত্ব : সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। উৎসর্গ : 'অগ্রজপ্রতিম সুহৃদ অদীপ-দা, কবি অদীপ ঘোষ-কে'। ISBN : 978-81-295-2793-6.

**'সহজ বাউল'**

প্রকাশক : সন্দীপ নায়ক। পুনশ্চ, ১১৪ এন, ডা. এস. সি. ব্যানার্জি রোড, কলকাতা- ৭০০ ০১০। সংস্করণ : প্রথম প্রকাশ—জানুয়ারী ২০১৭। মূল্য : ২৭৫.০০টাকা। পৃষ্ঠা : ১৮৮। উৎসর্গ : 'সর্বার্থে যিনি বাউল-মননের অধিবাসী লিয়াকতদা, লিয়াকত, অলি কে'। ISBN : 978-81-7332-907-4.

'কথাসাহিত্যে রূপ মহারূপ'। প্রকাশক : ইয়াসমিন আক্তার। আলোকপাত প্রকাশন, ১১/১ রাজারবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪। মূল্য : ৪০০.০০ টাকা। পৃষ্ঠা : ২১৬। উৎসর্গ : 'প্রিয় স্বজন অধ্যাপক বোরহান বুলবুল-কে'। ISBN : 978-984-92968-7-4.

**উৎস : গল্পসরণি, ত্রয়োবিংশতিবর্ষ : বার্ষিক সংকলন ১৪২৫/২০১৯**